অজিত পূততুণ্ড

টেম্‌স্‌ থেকে তিস্তা

টেম্‌স্ থেকে তিস্তা

অজিত পূততুণ্ড

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
শ্রীরামেশ্বর মিশ্র
বাসন্তী প্রিন্টিং
৩৩ গোরাচাঁদ বোস রোড
কলকাতা ৭০০০০৬

মা-কে

দিলাম

"Our Country is the World, our Countrymen are all mankind, we love the land of our nationality as we love all other lands."

—William Lloyd Garrison.

টেম্‌স্ থেকে তিস্তা

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড—একসঙ্গে

এই লেখকের—

বাজীকরের পুতুল

এক

আর্থার ডরসন-ডরোথী উইলসন, শুভময়-শিউলী সবাই যেন এক সঙ্গে জড়ো হয়েছিল আমার চেতনার পটে। সেই সঙ্গে প্রকট হয়ে উঠেছিল দেবজ্যোতি-ললিতার স্মৃতি। একটা দীর্ঘশ্বাসের মত স্মৃতিটা মোচড় দিয়ে উঠেছিল বুক থেকে। কেমন যেন দুলে দুলে উঠতে চেয়েছিল হৃদয়। মনে পড়ছিল সেই সব দিনের কথা, যখন গঙ্গার ঘাটে বসে দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে গল্প শুনত ললিতা। দেবজ্যোতির মুখে তার ছেলেবেলার গল্প। শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যেত। বর্তমানের চৌহদ্দি ছেড়ে মনটা চলে যেত অনেক দূরে, করতোয়ার তীরে তীরে, ছায়ায় ঢাকা লাল মাটির পথে পথে। আবেগ-ভরা প্রাণবন্ত এক কিশোরের ছবি ভেসে উঠত তার চোখের সামনে—আপন খেয়ালে ভরপুর সেই বালক ঘুরে বেড়ায় বনে-বাদাড়ে, গুলতি নিয়ে শিকার করে পাখি, জেলেদের নৌকো নিয়ে পাড়ি দেয় করতোয়ার জলে। পাল-তোলা নৌকোর ওপর দৃষ্টি রেখে মনে মনে সেই কিশোরের ছবি দেখত ললিতা।

সকালে উঠেই যেতে হয় পাঠশালায়। ঠিক পাঠশালা নয়, মিউনিসিপ্যালিটির প্রাইমারী স্কুল। কিন্তু ঐ ভোর বেলা ঘুম থেকে ওঠা সে যেন এক বিষম ব্যাপার। চোখের কোলে যত রাজ্যের ঘুম ঐ ভোরেই এসে জমা হয়, আর চোখে যেই সেই ঘুমের পাহাড় নেমে আসে ওমনি মায়ের ডাক, 'কইরে খোকা, এখনও উঠলি না? দিদির যে সব হয়ে গেল।' মায়ের ডাকের সঙ্গে সঙ্গেই খোকা বুঝে নিয়েছে, তার ঘুমের দফা গয়া, তবু আর একবার পাশ ফিরে শোবার চেষ্টা করে সে। কিন্তু তখনই খোকার এক গোছা চুল দিদির ডান হাতের মুঠিতে। আর সঙ্গে সঙ্গে বেজে ওঠে তিক্ত কণ্ঠ, 'এই বাঁদর ছেলে, আবার পাশ ফিরে শুলি যে? তোর জন্য রোজ রোজ ইস্কুলে দেরী হবে নাকি?' ব্যস্ আর যায় কোথা! সবেগে খোকার পাশ পরিবর্তন এবং দিদির হাতে

প্রচণ্ড এক চিমটি। দিদি চুলের মুঠি ছেড়ে দিতে পথ পায় না। কিন্তু সেই সঙ্গে বিরাশি ওজনের এক কিল গিয়ে পড়ে খোকার পিঠে। কাজেই উঠতে হয় এবার। আড়মোড়া ভেঙ্গে ওঠে খোকা। মায়ের ডাক শোনা যায়, 'ও খোকা, আয় সোনা, দাঁত মেজে মুখ হাত ধুয়ে খেয়ে নে।' ততক্ষণে দিদির বন্ধু রোকেয়া খাতুন বুকের ওপর এক পাঁজা বই খাতা নিয়ে দাঁড়িয়েছে উঠোনে, ঐ ডালিম গাছটার পাশে। মায়ের ডাক শোনা যায় আবার, 'ঐ দেখ্, তোর রোকেয়াদি এসে গেছে শিগগির ওঠ্।' হাসতে হাসতে এবার ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে খোকা। হঠাৎ তার খেয়াল হয়েছে, কয়েকদিন হল ডালিম গাছটায় একটা টুনটুনি বাসা করেছে, রোকেয়াদি আবার সেটাকে উড়িয়ে দিলে না-তো! যাহা ভাবা তাহা ছুট। রোকেয়াদির একটা হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে আসে, 'আরে সরে এসো এদিকে, শিগগির, এক্ষুণি উড়ে যাবে টুনটুনিটা।' রোকেয়াদি সরে এসে হাসে, খোকার গাল টিপে আদর করে বলে, 'পাগল ছেলে!'

রোকেয়াদিকে ভারি ভাল লাগে খোকার। ফর্সা গোলগাল চেহারা, টোপাটোপা গাল, এক পিঠ কালো চুল, মিষ্টি হাসিমাখা মেয়েটিকে ভারি আপন মনে হয় ওর। কথায় কথায় রোকেয়াদি ওর গাল টিপে দেয়, নাক ধরে টানে, এলোমেলো করে দেয় মাথার চুল। মুসলমান মেয়ে, কিন্তু আপন ভাবতে এতটুকু কষ্ট হত না দেবজ্যোতির।

গাছের ফাঁকে আসা সকালের রোদ-মাখা পথ বেয়ে স্কুলে যেত ওরা। লাল মাটির পথ। পথের দু'পাশে আম-কাঁঠাল-নিম-আমলকীর ঘন ছায়া। ছোট ছোট নাম-না-জানা গাছের ঝোপ-ঝাড়। লতাপাতার বুনো গন্ধ আর তার সঙ্গে বাতাবী ফুলের সুবাস মিশে এক অদ্ভুত আমেজ। দোয়েলের শিষ, পাতার ফাঁকে ফাঁকে ঘুঘুর ডাক—সেই খুদে পড়োকে হাতছানি দিয়ে ডাকত, উদাস করে দিত তাকে। পথ চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়ত সে, ভাবতো, 'পাখিগুলো কি আরামেই না আছে! পড়া নেই, স্কুলে যাওয়া নেই, হারাধনবাবুর বেতের ভয়ও নেই। বেশ আছে।'

লাল মাটির পথটা এঁকে বেঁকে চলতে চলতে এক সময় দু'ভাগ হয়ে গেছে। একটা পথ গিয়ে মিশেছে উঁচু একটা বিরাট ঢিবির সঙ্গে। ঠিক যেন একটা টিলা। আর একটা পথ সেই ঢিবিটাকে একটা বেড় দিয়ে চলে গেছে নদীর দিকে।

ঐ ঢিবিটার ওপরেই ওদের স্কুল। একটা পাশে প্রাইমারী স্কুল, আর বাকী

অংশটা জুড়ে মেয়েদের হাই স্কুল। শান্তিবালা গার্লস স্কুল। ঐ স্কুলের ছাত্রী রানী আর রোকেয়া।

এই স্কুলটাকে কেন্দ্র করে ভারি একটা মজার গল্প চলিত আছে। স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কোথাকার এক রানী, তাঁকে কেন্দ্র করেই সেই কাহিনী।

অনেকদিন আগে, এক শরতের সকাল। গাঁয়ের সাধারণ ঘরের এক মেয়ে ঐ টিবির ওপর এক গাছের নীচে আর পাঁচটা মেয়ের সাথে খেলছিল। চড়ুইভাতি খেলা। সাধারণ ঘরের মেয়ে হলেও অসাধারণ তার সৌন্দর্য—দুধে-আলতায় তার গায়ের রঙ। টানাটানা চোখ, ডালিম-রঙ ঠোঁট, এক পিঠ কালো কোঁকড়া চুল। এক কথায় বলতে গেলে, কুঁচ বরণ কন্যে, তার মেঘ বরণ চুল। সেই মেয়ে আর পাঁচজনের সঙ্গে খেলায় মশগুল, হঠাৎ ঘটল এক অঘটন। এক টিকটিকি গাছ থেকে ধপ করে পড়ল সেই মেয়ের মাথার ওপর, পড়েই ডাক, তারপর বাঁ দিক দিয়ে নেমে গেল নীচে। মেয়েরা তাই দেখে চিৎকার করে বলল, 'ওরে, তুই নিশ্চিত রানী হবি।' কুঁচ বরণ কন্যে ভয়ে একেবারে হিম।

এদিকে ঠিক সেই সময়ে কোথাকার এক রাজা চলেছিলেন সেই পথ দিয়ে। সঙ্গে পাইক বরকন্দাজ। হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল সেই কুঁচ বরণ কন্যের ওপর। রূপ দেখে মুগ্ধ হলেন তিনি। যুবরাজের সঙ্গে বিয়ে দিলেন সেই কন্যার। তারপর দিন যায়, মাস যায়, বছর যায় রানীর আর ছেলে পিলে হয় না। অনেক ঝাড়-ফুক মন্ত্র-তন্ত্র কিছুতেই কিছু ন । এই দুঃখ বুকে নিয়েই বৃদ্ধ রাজা গত হলেন। রানীর দুঃখ, রাজার দুঃখ. সিংহাসনে বসার বুঝি আর কেউ থাকে না। এমন সময় রাণী দেখলেন এক স্বপ্ন। দেখলেন. রানী সেই ছোট্ট কিশোরিটি হয়ে দাড়িয়ে আছেন সেই টিলার ওপর, আর তার সামনে দেবী সরস্বতী এসে বললেন, 'কি-রে মেয়ে তুই আমার পুজো করবি? আমার পুজো করলেই তোর ছেলে হবে।' ঘুম ভেঙে গেল রানীর। রাজাকে বল্লেন সব। রাজা সব শুনে ভাবলেন কিছু সময়, তারপর বল্লেন, 'এক কাজ করো, ঐ জায়গাটায় একটা স্কুলের প্রতিষ্ঠা করো, তবেই দেবীর সঠিকার পুজো করা হবে।' তাই হল, একটা স্কুলের প্রতিষ্ঠা হল ওখানে। আর বছর ঘুরতেই রানীর কোলে এল ছেলে। লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল সেই গল্পটা।

গল্পটার মধ্যে ভারি মজা পেত সেই খুদে পোড়ো। স্কুলের পাশ দিয়ে যে-পথটা চলে গেছে মাঠ পেরিয়ে নদীর দিকে, সেই পথ ধরে গল্পটার কথা ভাবতে ভাবতে এক একদিন নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করত সে। এমনি একদিন টিফিনের সময় মাঠ পেরিয়ে এসে একটা গাছের নীচে বসেছিল খোকা। সামনে

নদী। দূরে অনেক দূরে, একটা বাঁক নিয়ে হারিয়ে গেছে নদীর মুখটা। খোকা সেই দিকে চেয়ে বসে বসে স্বপ্ন দেখে। তার মনে হয়, দেবী সরস্বতী যেন এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। দেবীর আশীর্বাদে সে হয়ে গেছে রাজপুত্তুর—মাথায় মুকুট পরে, কোমরে তলোয়ার গুঁজে, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে সে ছুটছে—ছুটতে ছুটতে মাঠ পেরিয়ে নদী পেরিয়ে একেবারে গিয়ে হাজির হয়েছে রাজকন্তের দেশে। কী চোখ ধাঁধানো তার রূপ—খোকা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে তার দিকে। কিন্তু একদিন হঠাৎ চমকে ওঠে খোকা, স্বপ্নের ঘোর যায় কেটে।

সামনের দিকে তাকিয়ে দেখে, কোথা থেকে কে জানে, এক বুড়ির আবির্ভাব। মাথায় তার এক বোঝা শুকনো গাছের ডালপালা, কোঁচরে কলমী শাক নটে শাক। এক মাথা ঝাকর-মাকর চুল। বুড়ি কিছুক্ষণ নজর করে দেখে খোকাকে। খোকার বুকে তখন হাতুড়ি উঠছে-নামছে। তবু সাহসে ভর করে সে উঠে দাঁড়ায়, ভাবে, কে জানে, হয়ত এই বুড়িই ছদ্মবেশী সরস্বতী, তাকে পরীক্ষা করছে। ভুরু কুঁচকে বুড়ি হঠাৎ বলে, 'তুই কোন্ বাড়ির ছাওয়ালরে, একা একা এট্টি করিচ্ছু কি? প্রাণে ভয়-ডর নাই ক্যারে? যা যা বাড়িৎ যা।' খোকার বুকে তখন ঢেঁকির তাল। তবু সে দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ বুড়ির কি খেয়াল হয়, খ্যাক খ্যাক করে সে হেসে ওঠে—বেরিয়ে পড়ে তার ফোকলা দাঁত। অবশিষ্ট মাত্র তিনটি। দোক্তার গুঁড়োয় তা-ও কালো হয়ে গেছে। বুড়ির সেই হাসি দেখে খোকার রক্ত জল। হাসতে হাসতেই বলে বুড়ি, 'অ-রে ছাওয়াল, তুই ইস্কুল পলাইছু?' ব্যাস্। আর বলতে হয় না। খোকা এবার দে ছুট। ছুটতে ছুটতে একেবারে রোকেয়াদির ক্লাসের মধ্যে।

এই পর্যন্ত বলেই থেমে ছিল দেবজ্যোতি। তারপর শব্দ করে হেসে ছিল। হাসতে হাসতেই বলেছিল, 'বুঝলে, রোকেয়াদির ক্লাসে ঢুকেই সব গেল গুলিয়ে। অতগুলো মেয়ের সামনে নিজের ভয়ের কথা বলি কেমন করে! কেমন করে বলি, এক ডাইনী আর একটু হলেই ধরে নিয়েছিল আর কি। অতএব উল্টো দৌড়। রোকেয়াদি ডাকল, কিন্তু কে কার কথা শোনে।'

ললিতা তাকিয়েছিল দেবজ্যোতির দিকে। ওর কথা শুনতে শুনতে কখন যে তন্ময় হয়ে কেবল দেবজ্যোতিকেই দেখছিল তা খেয়াল ছিল না ললিতার। দেবজ্যোতির গল্পে ফুটে ওঠা ছোট ছোট ছবির আমেজ, গঙ্গার উদাস হাওয়া; ঘাটের সিঁড়িতে, গাছের পাতায়, নদীর ঢেউয়ে-ঢেউয়ে পড়ন্ত বেলার মিঠে

পরোক্ষ তাকে যেন এক নতুন জগতের আস্বাদ দিয়েছিল। দেবজ্যোতিকে দেখে দেখে ললিতার যেন আর আশ মিটছিল না। ওকে নতুন করে চিনছিল সে।

ললিতার ডায়েরীকে কেন্দ্র করে ললিতা-দেবজ্যোতির কথা যখন ভাবছি, ভাবতে ভাবতে মন যখন আঁকা বাঁকা করতোয়ার তীরে তীরে ঘুরে ফিরছে, ঘুরে ফিরছে বগুড়া শহরের অদূরে মহাপীঠস্থান ভবানীপুরের মায়ের মন্দিরে, ছুটে চলেছে-মহাস্থানের ঐতিহাসিক বিবরণীর দোরে দোরে, বাইরে তখন বৃষ্টি পড়ছে অঝোর ধারায়। হাওয়ায় দুলে দুলে উঠছে কাঁচের জানালাটা। সামনের বড় রাস্তাটায় লোক চলাচল নেই বললেই চলে। দু'একটা গাড়ি ছুটে চলেছে ঊর্ধ্বশ্বাসে আঁট-সাঁট হয়ে। বৃষ্টির কণাগুলো জড়াজড়ি করে হাওয়ায় নাচছে। সামনের পার্কটায় গাছের ওপর বসে বসে ভিজছে কতগুলো কাক। দল-ছুট দু-একটা পাখি এ গাছ থেকে ও-গাছে উড়ে যাচ্ছে আশ্রয়ের আশায়। বাইরের দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে বসেছিলাম আমি। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, বর্ষণ মুখর অপরাহ্ণ, নির্জন পথ-ঘাট, মাতাল হাওয়ার ডানার ঝাপটা—এই সব কিছুই যেন আমায় কেমন এলোমেলো করে দিল। এমন পরিবেশে অন্যদিন হয়ত মনে ধরত রবীন্দ্র সঙ্গীতেরও গুনগুনানি। আজ কিন্তু অন্য সুরে বাঁধা, কেমন ক্লান্তিতে ভরে উঠেছিল মনটা।

অ্যাশট্রের ওপর রাখা সিগারেটটা কখন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। দেবজ্যোতির চিঠিটা তখনও খোলা পড়ে রয়েছে টেবিলের ওপর, তারই পাশে ললিতার ডায়েরী। দেবজ্যোতির চিঠিতে ঠিকানা নেই কোনো, কেবল আছে কতকগুলো এলোমেলো কথা। আর ললিতার ডায়েরীতে আছে কেন সে ঘর ছেড়ে চলে গেল তার ইঙ্গিত। আমার কিন্তু ঘুরে ফিরে সেই একটা কথাই মনে পড়ছিল বারবার—কেন এমন হল, কেন নেমে এল ওদের জীবনে এমন বিপর্যয়? বিকেলের সেই আবছা আলোয় আমার মনে তখন অনেক কথার ভিড়, অনেক দিনের অনেক কথার ঝলকানি। দার্জিলিঙে পাহাড়ের কোলে ওদের সেই প্রথম আলাপ, তারপর ক্রমশ গভীরতার মুখে ঢলে পড়ার দিনগুলো—সব এক এক করে মনে পড়ছিল আমার।

ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। ঝড়-জল বজ্র-বিদ্যুতের বাস্তবতাকে ডিঙিয়ে মনটা চলে গিয়েছিল অনেক দূরে। হঠাৎ একটা শব্দে চটকা ভেঙেছিল আমার। বৃষ্টির শব্দকে ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছিল বাইরের

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। চিন্তার জটটা যেন আর একটা মোচড় খেল। ঝড়-জল মাথায় করে কে এল এমন অসময়ে? তবে কি দেবজ্যোতি?

মাথায় ভাবনার দোলা। তাড়াহুড়ো করে উঠে গিয়ে দরজা খুলেই চমক! একি, এ-যে ডবসন কাকা! আস্কল ডবসন! সেই চিরপরিচিত রূপ। সৌম্যমূর্তি। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। সাদা দাড়ি, মাথায় এলোমেলো চুল। আমি কেমন অবাক হয়ে চেয়েছিলাম তাঁর দিকে। হাতে তাঁর একটা ছাতা ভিজে ঢোল, পরনের কাপড় ভিজে সপ সপ করছে। মুখে হাসিটি লেগেই আছে তাঁর। প্রশ্ন করলাম আমি, 'একি ডবসন কাকা আপনি! এই ঝড়-জল মাথায় করে? ব্যাপার কি?'

—কিছু না, এমনিই এলাম। খেয়াল হল, তোমার কাছে একবার আসি, তাই চলে এলাম। তাছাড়া ক'দিন তো তোমার দেখাই নেই।

—না, বাইরে দাঁড়িয়ে আর কথা নয়, একেবারে ভিজে গেছেন। শিগ্‌গির ভেতরে এসে জামা-কাপড় ছেড়ে ফেলুন। অসুখ করলে তখন—?

ডবসন সাহেব ঘরে ঢুকে ছাতাটা রাখলেন। ছাতাটা রেখে একটা হাত বাড়িয়ে বললেন, 'দাও তোমার একখানা কাপড়, এটা ছেড়েই ফেলি। এই বুড়ো বয়সে অসুখ করলে তখন তোমাদেরই আবার বিপদে পড়তে হবে।'

তোয়ালেটা ডবসন সাহেবের হাতে দিয়ে বললাম, 'না, এ-কথা ঠিক নয়, আপনার সেবা করতে পারা যে কোনো লোকেরই ভাগ্যের কথা। কিন্তু বয়েসটার কথা তো একবার ভাবতে হবে। এই বুড়ো বয়েসে শরীর যদি একবার ভেঙে যায় তখন?'

—আর জোড়া লাগবে ন, এই তো? কিন্তু ভাঙনের পালা যখন আসে কেউ কি তাকে রোধ করতে পারে? রোধ করার চেষ্টা করতে গিয়ে মিছেই কেবল ছুটোছুটি সার হয়।

—তবু একটু সাবধানতা!

ডবসন কাকা এবার হাসতে লাগলেন। ছেলেমানুষের মত হাসি, যেন খুব একটা মজার কথা বলেছি আমি। আর কোনো কথা না বলে পাঞ্জাবিটা খুলে গা-মাথা মুছলেন। আমি চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম তাকে। চোখ ভরে দেখার মতই শরীর। প্রায় ছ'ফুট লম্বা, তেমনি বুকের ছাতি। খাঁড়ার মত উন্নত নাক, মাথা ভর্তি সাদা চুল, পাকা চাপ দাড়ি, নীল চোখে সমুদ্রের গভীরতা, লালচে গায়ের রঙে তামাটে আভা। ষাটের ওপরে বয়েস কিন্তু শরীরের কোথাও টোল খায়নি এতটুকু।

আমি তাঁকে দেখছিলাম, আর ভাবছিলাম, মানুষের বিচিত্র ভাগ্যের কথা। ভাবছিলাম, টেমসের মাটিতে একদিন যে-শিশু ভূমিষ্ট হয়েছিল সে-কিনা তার জন্মের প্রায় তিরিশ বছর পর আবার নতুন করে জন্ম নিল তিস্তার কূলে। কী বিচিত্র মানুষের ভাগ্যের ইতিহাস। ডবসন এ্যাণ্ড কোম্পানীর সর্বময় কর্তার একমাত্র পুত্র আর্থার ডবসন কোট-প্যান্ট ছেড়ে হয়ে গেলেন কিনা পুরো দস্তুর বাঙালী। একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণি ঝড় তাঁকে যেন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে আর এক প্রান্তে। এক জীবন থেকে সরে এসেছেন আর এক জীবনে, এক বোধ থেকে আর এক বোধে।

ডবসন সাহেব ধীরে ধীরে কাপড় ছেড়ে চেয়ারটায় পা তুলে বসলেন। হেসে বললেন, 'নাও, এবার এক কাপ চা খাওয়াও।'

আমি চা করতে গেলাম। সাহেব চোখ বুজে বসে রইলেন চুপচাপ। ফিরে এসে দেখি, তখনও তিনি চোখ বুজেই বসে আছেন। চায়ের কাপ রেখে আমি বসলাম ওর সামনে। ডবসন কাকা চোখ বুজেই বললেন, 'তারপর, ছেলেটার আর কোনো খবর পেলে?'

এতক্ষণে আসল কথায় এলেন সাহেব। তাঁর মনের গভীর ক্ষতটা প্রকাশ হয়ে পড়ল এবার। দেবজ্যোতির পলায়নটা যে তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না, সেটা চাপা রইল না আর। এই এক মাস হল কোনো কিছুতেই মন দিতে পারছিলেন না তিনি, এমনকি তাঁর আশ্রমের কাজেও ঔদাসীন্য প্রকাশ হয়ে পড়ছিল। কেমন যেন মনে হচ্ছিল, তিনি ক্রমশই হারিয়ে ফেলছেন নিজেকে, সরে যাচ্ছেন আমাদের সকলের কাছ থেকে। ঐ চোখ বুজে বসে থাকা মানুষটির দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল, বড় ক্লান্ত তিনি। কেন কে জানে, তাঁর দিকে তাকিয়ে পুত্র-শোকাতুর রাজা দশরথের কথাই মনে পড়ল, সেই সঙ্গে প্রচণ্ড রাগ হল দেবজ্যোতির ওপর।

চোখ খুললেন সাহেব। অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন, 'ছেলেটার আর কোনো খবর পাওনি, তাই না?'

—না। ঐ একখানা চিঠিই পেয়েছিলাম।

—হুঁ। —একটু চুপ করে আবার বললেন, 'দেখতে দেখতে একটা মাস কেটে গেল।' একটু থেমে যোগ করলেন, 'মাঝে মাঝে কি ভাবি জান?'

আমি নিরুত্তর।

সাহেব নিজেই বললেন, 'ভাবি, ছেলেটা কি একবারও ভাবে না এই

বুড়োটার কথা? এই বুড়োটারও যে মন-বলে একট পদার্থ আছে সে-কথাটা কি একবারও মনে পড়ে না ওর?'

এ-কথার কোনো উত্তর নেই, উত্তর আশা করেও কথা বলেন নি সাহেব। তবু একটু অস্বস্তি বোধ করলাম আমি। ডবসন কাকার যে-মহীরুহ মূর্তির সঙ্গে আমার পরিচয়, তার পাশে এ-পরিচিতি ভালো লাগল না, কেমন যেন বে-মানান মনে হল। মনে মনে প্রসঙ্গান্তরে যেতে চাইলাম আমি। তাই ধীরে ধীরে বললাম, 'আচ্ছা, আঙ্কল, জেলায় জেলায় 'শিউলী'র সেন্টার খোলার যে-প্রোগ্রামটা ছিল, তার কি হল?'

কথাটায় একটুকাল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন সাহেব। বুঝতে চেষ্টা করছিলেন আমার প্রসঙ্গান্তরের উদ্দেশ্য। কিন্তু কোনো কথা বললেন না। হাসলেন একটু, হয়তো আমার মনের কথাটা বুঝতে পেরেছিলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, মোটামুটি সবই তো ঠিক হয়ে আছে।'

—তবে আর দেরী কেন? সবাই মিলে অভিযান শুরু করে দি।

—কিন্তু ললিতা যে বাধা দিচ্ছে।

—সে কি, ললিতা বাধা দিচ্ছে? —অবাক না হয়ে পারিনি আমি। ললিতার কাছ থেকে বাধা আসতে পারে, এ যেন ভাবতেই পারছিলাম না।

—ঠিক বাধা নয়, ও-বলছে, আর ক'টা দিন অপেক্ষা করতে।

খানিকটা ধাতস্থ হলাম। প্রশ্ন করলাম, 'দেরী করায় লাভ?' এবার হাসলেন ডবসন কাকা। হেসে বল্লেন, 'ওর ধারণা, এখন কিছুদিন আমার বিশ্রাম চাই, তারপর অন্য কথা।'

কথাটার সত্যতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু এ-কথাও ভাবছিলাম, কাজের উত্তেজনার মধ্যে না থাকলে ডবসন কাকার মানসিক প্রশান্তি ফিরে আসবে না। অথচ ললিতা যখন এ-কথা বলেছে, তখন বলারও নেই কিছু। তবু বললাম, 'আপনি না হয় কাজের খুব বেশী ঝুঁকি নেবেন না।'

—সে-কথাও তো বলেছি। তার উত্তরে বলেছে, সে-ক্ষেত্রে বাকী সকলের প্রস্তুতির প্রয়োজন।

এর ওপর আর কথা চলে না। সত্যি কথা বলতে কি, অন্যের কথা তো ছেড়েই দিলাম, আমার নিজের ওপরই কোনো আস্থা রাখতে পারছিলাম না। প্রস্তুতির যে প্রয়োজন আছে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই।

ডবসন সাহেব একটু চুপ করে বললেন, 'বড় অদ্ভুত মেয়ে এই ললিতা।

ওকে যত দেখছি ততই অবাক হচ্ছি। ওর মনের মধ্যে এক বিরাট শক্তি লুকিয়ে আছে। তাকে কাজে লাগাতে পারলে ও অসাধ্য সাধন করতে পারবে। একদিকে আছে প্রচণ্ড কর্মশক্তি আর একদিকে আছে স্নেহের ভাণ্ডার।' একটু হেসে আবার বললেন, 'আমি তো এই বুড়ো বয়সে সত্যিকারের মা পেয়ে গেছি। এই বয়েসে এমন মা পাওয়া যে কত বড় ভাগ্যের কথা, যে-না পেয়েছে সে কিছুতেই বুঝবে না।'

ডবসন সাহেব চোখ বুজলেন। ধীরে ধীরে দাড়িতে হাত বুলোতে লাগলেন তিনি। তাঁর মুখে ফুটে উঠল এক তৃপ্তির হাসি।

তাঁর সেই আনন্দোজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে আমি ভাবলাম অন্য কথা। ভাবলাম অন্যদিনের কথা। আমার সঙ্গে ললিতার তখন অল্পদিনের পরিচয়, ভাব বিনিময়ের গভীর খাদে মন তখনও বইতে পারেনি, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সমীহের অবকাশ আছে তখনও। এমনি একটা সময়ে ললিতার অনুরোধে আমরা তিনজন গিয়েছিলাম 'শিউলী জনকল্যাণ আশ্রমে'।

কলকাতা থেকে ঘণ্টা তিনের পথ। রাস্তার ঠিক ওপরেই আশ্রম। বিঘে তিন চার জমি জুড়ে আশ্রমের অস্তিত্ব। আশ্রমের এক পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গা। বাস থেকে নেমে খানিকটা গিয়েই আশ্রমের গেট। গেটের দু'পাশে মাধবী লতার সমারোহ। লাল আর সাদায় মেশামেশি। গেটের ওপরে থোকা থোকা ফুল হাওয়ায় দুলছে। তাতে আছে প্রজাপতি মৌমাছির ভিড়।

থামের গায়ে পাথরের ওপর লেখা—শিউলী জনকল্যাণ আশ্রম। আশ্রমের সামনের সমস্ত অংশটা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বাইরে থেকে ভেতরের বিশেষ কিছুই নজরে আসে না, আম-জাম-বকুল গাছগুলোকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। আর দেখা যায়, গেটের কাছে দু'পাশে দুটো শিউলী গাছ। ফুলের এই সমারোহে যে-কোনো মানুষকে গেটের সামনে এসে থমকে দাঁড়াতেই হয়। ললিতাও থমকে দাঁড়িয়েছিল, অস্ফুট স্বরে বলেছিল, 'বাঃ।' তারপর দেবজ্যোতির দিকে ফিরে বলেছিল, 'দাঁড়ান, একটা ছবি তুলবো।' ললিতার কাঁধে সেই ক্যামেরাটা তখন একই ভাবে ঝুলছিল, যেমন করে ঝুলছিল দার্জিলিঙে জলা পাহাড় থেকে ফিরবার পথে সেই বৃষ্টির দিনে। ললিতার কথায় দেবজ্যোতি হেসেছিল একটু, যেন সে আগেই জানত ললিতা এ-প্রস্তাব তুলবে।

আশ্রমে ঢুকতে ঢুকতে আমার দিকে তাকিয়ে ললিতা প্রশ্ন করেছিল, "সংগঠনকে

প্রকাশ করতে 'আশ্রম' বলা হচ্ছে কেন?" উত্তরে বলেছিলাম, " 'আশ্রম' কথাটার মধ্যে যে-পবিত্রতার অবকাশ রয়েছে তাকেই ব্যক্ত করার জন্য বোধ হয় কথাটাকে ব্যবহার করা হয়েছে। অন্য কোন উদ্দেশ্য নয় বলেই মনে হয়।"

আমরা ততক্ষণে আশ্রমের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। সমস্ত আশ্রমটাই ছায়ায় ছায়ায় ঢাকা। আশ্রমে ঢুকেই কেমন এক প্রশান্তিতে ভরে যায় মানুষের মন। পাখির ডাক, পাতার মর্মর, ফড়িং প্রজাপতির উড়ন্ত পাখার এলোমেলো আকর্ষণ —সব মিলিয়ে মানুষ যেন পায় এক নতুন জগতের সন্ধান। গেট থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে পথের সোজাসুজি ছোট্ট একটা ঘর। দেবজ্যোতি আঙুল তুলে বলেছিল, 'অফিস ঘর'।

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বারান্দা। সমস্ত অফিস ঘরটাকে ঘিরে রেখেছে ঐ বারান্দা, বারান্দার থামগুলোকে জড়িয়ে রয়েছে মনি প্ল্যাণ্ট। অফিসের চারপাশে ফুলের বাগান, তাতে নানা রকম ফুল। ক্যাকটাস থেকে শুরু করে গোলাপ-যুঁই-সন্ধ্যামালতী পর্যন্ত।

অফিস ঘরটা আশ্রমটাকে ঠিক যেন দুটো ভাগে ভাগ করে দিয়েছে। একদিকে চাষের জমি, আর একদিকে কারখানা। পেছনে গঙ্গার ধারে সর্বক্ষণের কর্মীদের বাসস্থান। যে-দিকটা কারখানা সেদিকে আছে অনেক-গুলো লম্বা লম্বা ঘর। আমরা যখন ঢুকছিলাম তখন সেদিক থেকে ভেসে আসছিল নানা রকমের শব্দ। কাঠ-চেরাই, লোহা পেটাই আরও নানা রকমের শব্দ মিলে একটা অদ্ভুত শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি করছিল। দেবজ্যোতি বলেছিল, 'আশ্রমে যারা হাতের কাজ শিখতে আসে, তাদের ট্রেনিং দেওয়া হয় ওখানে। নানা রকমের কাজ শেখানো হয়।'

দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে চারপাশটা দেখছিল ললিতা। চারদিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে দেবজ্যোতির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাইরে তো কাউকে দেখছি না, সবাই বোধ হয় এখন কাজে ব্যস্ত?'

—হ্যাঁ। কিছু লোক এখানকার তৈরী জিনিস বিক্রী করবার তদারক করতে মার্কেটে গেছে, রোজই যায়। বাকী সবাই কারখানার কাজে ব্যস্ত। চাষের কাজ বোধ হয় আজ বন্ধ, কাউকে তো দেখছি না।

যে-দিকটায় চাষের জমি সে-দিকটায় চোখ বুলিয়ে নিল ললিতা। দূর থেকে মনে হচ্ছিল যেন একটা সবুজ গালিচা পাতা রয়েছে। দেবজ্যোতি বলল, 'গ্রামের অর্গানিজেসন আর একটু ভাল হলে এখানে একটা ট্রাকটর কেনা হবে, গ্রামের চাষীরা এখান থেকেই ট্রাক্টর চালানোর কাজ শিখতে পারবে।'

ললিতার চোখে 'একটু একটু করে বিস্ময়ের আভা ফুটে উঠছিল। আস্তে আস্তে বলল, 'ডবসন কাকা একাই সব করেছেন, তাই না?'

—হ্যাঁ, ডবসন কাকা একাই শুরু করেছিলেন। এখন অবশ্য সকলের প্রচেষ্টায় দিন দিন আশ্রমের শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। —উত্তর দিল দেবজ্যোতি।

এতক্ষণে আমার দিকে ফিরে তাকিয়েছিল ললিতা। মৃদু স্বরে বলেছিল, 'আমার কেমন যেন ভয় ভয় করছে।'

—কেন? —অবাক হয়েই প্রশ্ন করেছিলাম আমি।

—ডবসন কাকা আমায় কি ভাবে নেবেন কে জানে!

ওর মুখে ফুটে উঠেছিল একটা করুণ হাসি। মনে মনে যে ও সত্যিই অস্বস্তি বোধ করছিল তা প্রকাশ পেয়েছিল ওই হাসিতে।

কথা বলতে বলতে কারখানার চৌহদ্দির মধ্যে এসে পড়েছিলাম। বিভিন্ন শেডে বিভিন্ন কাজ চলেছে। মেয়ে-পুরুষ এক সঙ্গেই কাজ করছে। কোথাও বেতের কাজ, কোথাও চামড়ার, কোথাও তাঁত। আর সব শেষে গুটী কয়েক লেদ, শেপিং, মিলিং মেশিন নিয়ে ছোট্ট একটা লোহার কারখানা।

একটু একটু করে আমরা সব পেরিয়ে এসেছিলাম। মাঠে নেমে বলেছিল দেবজ্যোতি, 'এই কারখানাতেই আমার হাতে খড়ি হয়েছিল।'

ধীরে ধীরে আমরা এগোতে লাগলাম গঙ্গার দিকে। দেবজ্যোতি সামনের দিকে খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল। আমি ললিতার দিকে চেয়ে বলেছিলাম, 'এদিকেই ডবসন কাকাকে পাওয়া যাবে। হয় লাইব্রেরী না হয় বড় বকুল গাছটার তলায়।'

অনুমান মিথ্যে হয় নি। বকুল গাছের ঘন ছায়ায় লাল সিমেণ্ট বাঁধানো জায়গাটাতেই পেয়েছিলাম ডবসন সাহেবকে। তিনি তখন নিবিষ্ট মনে কিসের একটা ব্লু প্রিণ্ট দেখছিলেন। আর সেই সঙ্গে গুন গুন করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইছিলেন তাঁর সেই প্রিয় গানের কলিটা,—

রাই জাগো রাই জাগো শুক-শারী বলে।
কত নিদ্রা যাও কালামাণিকের কোলে॥
রজনী প্রভাত হইল বলিয়ে তোমারে।
অরুণ কিরণ হইল প্রাণ কাঁপে ডরে॥
শারী বলে শুন শুক গগনে উড়ি ডাক
নব জলধরে আনি অরুণেরে ঢাক।

শুক বলে শারী হে আমরা বন পাখী।
জাগাইলে না জাগে রাই ধরম কর সাখী॥

গঙ্গার দিকে তাঁর মুখটা ফেরানো ছিল, কেবল মুখের আধখানা দেখা যাচ্ছিল তাঁর। সেই সাদা দাড়ি, এলোমেলো পাকা চুল, পরনে মালকোছা মারা কাপড়, গায়ে একটা গেঞ্জি। ললিতা তাঁর দিকে চেয়ে অবাক-বিস্ময়ে একেবারে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল আমার পাশে। আমার কানের কাছে মুখ এনে বলেছিল, 'একি! এ-যে একেবারে পুরাকালের ঋষি!' আমি কিন্তু উত্তর দেবার আগেই ওর কানে গিয়ে প্রবেশ করেছিল সাহেবের গানের সেই কলিটা। ললিতা তখন আরো চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ওর সারা মুখে আনন্দের ঢেউ। উত্তেজনায় আমার হাতটা প্রায় চেপে ধরেছিল। সে বলেছিল, 'কি আশ্চর্য! কি অদ্ভুত যোগাযোগ! আমার মেসোমশাই-ও যে এই গানটাই সব সময় গাইতেন।'

ললিতা যেন আর নিজেকে স্থির রাখতে পারছিল না কিছুতেই। ছুটে গিয়েছিল ডবসন কাকার সামনে। ডবসন কাকাও দু'হাত বাড়িয়ে ললিতার দুটো হাত জড়িয়ে ধরেছিলেন। সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল দু'জন দু'জনার যেন কত কালের চেনা। এটা কি করে সম্ভব ভেবে পাচ্ছিলাম না। যারা দু'জন দু'জনকে দেখেনি কখনও, কেবল পরের মুখে শোনা পরিচয়, তারা এমন পরিচিতির জোয়ারের টান অনুভব করে কি করে? ভেবে পাচ্ছিলাম না কিছুতেই। অথচ সেখানে কোনো সন্দেহের অবকাশও ছিল না। আনন্দের প্রাবল্যে দু'জনার চোখই ছল ছল করে উঠেছিল। কে জানে, হয়তো জন্ম সূত্রের নিগূঢ় রহস্য রয়েছে এর পেছনে।

ডবসন সাহেবের দিকে চেয়ে চেয়ে আমি সেই পুরোনো দিনের কথাই ভাবছিলাম। ডবসন কাকা তখন চেয়ারে হেলান দিয়ে তলিয়ে গিয়েছিলেন একটা বই-এর মধ্যে। সেই অবসরে আমি ভাবছিলাম ললিতার কথা, ললিতার লেখা ডায়েরীর কথা।

বৃষ্টি নামেনি তখনও, আকাশটাই কেবল মেঘে [illegible] ছেয়েছিল। ডবসন্ সাহেবও আসেননি তখনো। ললিতার ডায়েরীটা নাড়াচাড়া করতে [illegible] ভাবছিলাম অনেক কথা, পুরোনো দিনের অ[illegible] স্মৃতি এসে দানা বাঁধছি[illegible] মনের কোনে। বলতে গেলে আমি তখন আন[illegible] উল্টে যাচ্ছিলাম ডায়েরী[illegible]
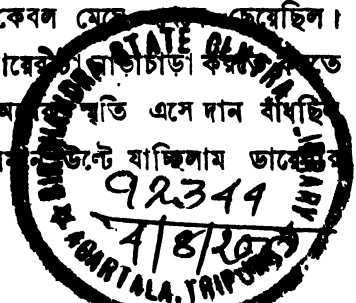
পাতা। একটা জায়গায় এসে আটকে গেল চোখ। তারিখটা ছিল ২০শে ফাল্গুন। ললিতার গোট গোট অক্ষরগুলো যেন আমায় হাত ছানি দিয়ে ডাকছিল। ধীরে ধীরে আমায় পড়তে হয়েছিল অনেকগুলো পাতা। আর সেই সঙ্গে ললিতার মনের অনেক অচেনা অলিগলি ক্রমশ পরিচিতির চৌহদ্দির মধ্যে ধরা পড়ছিল আমার কাছে। ললিতা লিখছে,—

'আজ সেই পুণ্য দিন। এই দিনটিতেই হয়েছিল মেসোমশাই-এর বিয়ে, আবার এই দিনটিই তাঁর মৃত্যুর দিন। এক আশ্চর্য যোগাযোগ। আজ সকালে উঠে সবার আগে এই কথাটাই মনে পড়ল। মনে পড়ল, এই দিনটিতেই একজন মানুষ, একজন খাঁটি মানুষ, আমাদের সকলের কাছ থেকে দূরে সরে গেছেন। আর রেখে গেছেন আমার কাছে আমাদের সকলের কাছে তাঁর স্মৃতির টুকরোগুলো। আমি সকালে উঠে যখন এই সব ভাবছি, তখনও ভাঙেনি দেবজ্যোতির ঘুম। জানালার ফাঁক দিয়ে এক টুকরো রোদ এসে পড়েছে ওর ঠিক থুতনিতে। আমার হঠাৎ কেমন যেন মনে হল, মেশোমশাই ওর চিবুকে হাত দিয়ে আশীর্বাদ করছেন। জানি, এটা মনের এক ধরনের বিকার। তবু একটা আনন্দে মনটা ভরে উঠল। মনে মনে বার বার প্রার্থনা করলাম, মেসোমশাই-এর আশীর্বাদ সফল হোক, দেবজ্যোতি যেন সব কিছুকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ওরই মত মানুষ হয়ে উঠতে পারে।

'মুখটা ও-পাশে ফিরিয়ে ঘুমোচ্ছিল জ্যোতি। ঢাকাটা সরে গিয়েছিল ওর গা থেকে। ভোরের শীত—কুঁকরে শুয়েছিল তাই। একটা অবলম্বনের মত পাশ বালিশটাকে আঁকড়ে শুয়েছিল। ওর শোয়ার ভঙ্গিটা দেখে হাসি পাচ্ছিল খুব, ওর গালে মুখে হাত দিয়ে আদর করতে ইচ্ছে করছিল ওকে। আলতো করে চাপাটা তুলে দিলাম ওর গায়ে, ওর কপালে আমার ঠোঁটের ছোঁয়া রেখে উঠে পড়লাম বিছানা থেকে। একটা অহেতুক আনন্দে প্রাণ-মন ভরে উঠল।

'সারা দিনটাতেই ছিল এই আনন্দের রেশ। মাসীমা আর মেশোমশাই-এর স্মৃতিতে ভরা বাল্যের সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ছিল বার বার। জ্যোতি এক সময় খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে গেল অফিসে, আর আমি বসলাম স্মৃতির ঝুড়ি হাতে নিয়ে।

'মেসোমশাই ছিলেন লম্বা রোগাটে মানুষ। চোখে পুরু কাঁচের চশমা। মাথায় এলোমেলো কাঁচা পাকা চুল। ঠোঁটের ফাঁকে এক প্রশ্ন হাসি, চোখে

শিশুর কৌতূহল। মানসিক প্রশান্তির এক অদ্ভুত লাবণ্য সমস্ত মুখে। কখনো রাগ করতেন না তিনি, কোনো বিষয়ে ক্ষোভ ছিল না তাঁর, আপনাতে আপনি মশগুল হয়ে থাকতেন সারাক্ষণ। দিনের মধ্যে আট-ন ঘণ্টাই কেটে যেত বইকে সঙ্গী করে। ঐ মানুষটির কাছে দু'দণ্ড বসলেই যেন মন-প্রাণ জুড়িয়ে যেত, পৃথিবীর সব কোলাহল থেকে মুক্তি পেত মন। ওর কাছে বসে গল্প শুনতে শুনতে ভুলে যেতাম সব কিছু। এক এক দিন সন্ধ্যেবেলায় গিয়ে দেখতাম, মেসোমশাই হাত গুটিয়ে বসে আছেন চুপ চাপ। আমাকে দেখেই উৎফুল্ল হয়ে বলতেন, 'আয় মা আয়। চা-টা না খেয়ে তোর জন্যই চুপ করে বসে আছি। তোর সঙ্গে এক সঙ্গে বসে খাব।'

'কিন্তু কই, আজ তো আমার আসবার কথা ছিল না।' —হেসে উত্তর দিতাম আমি।

"মেসোমশাই আমার মাথাটা ওর বুকের কাছে টেনে এনে বলতেন, 'ঐ কথাটাই বলে কে বল্? তোর আসবার কথা নয়, অথচ মনটা আমার কেবলই বলছিল, আজ তুই আসবিই আসবি। দেখলি, মন আমার মিথ্যে বলে নি।' মাসীমা আমাদের মাঝে এসে হেসে বলতেন, 'পরের মেয়েটাকে তুমি যে একেবারে আপনার করে পেতে চাইছ, এর ফল কি ভালো হবে? শেষে কিন্তু কষ্ট পাবে। ওর মা-বাবা তো আমাদের কথা শুনতেই পারে না, ওকে এখানে লুকিয়ে আসতে হয়।' মেসোমশাই হাসতেন, বলতেন, 'চৌধুরী সাহেবের কথাই বল, আর তোমার দিদির কথাই বল, ওরা কি ওদের মেয়েকে ধরে রাখতে পারছে?'

'এখনও পারে নি বলে কোনো দিনই পারবে না তা-ই কি জোর করে বলতে পারা যায়?' —বলতেন মাসীমা।

—যদি পারে তবে বলতে হবে, পাগলীমার আসবার প্রয়োজনও ফুরিয়েছে। হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বলতেন—'হ্যাঁরে এই আধ বুড়ো ছেলেটার জীবনে তেমন দিন কখনও আসবে?'

আমি ততক্ষণে মেসোমশাই-এর মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, ওর মাথার চুল ঠিক করতে করতে বলতাম, 'এই একটা বিষয়ে তুমি কিন্তু ভারি দুর্বল। এই ব্যাপারে তুমি একেবারে সহজ হতে পার না।'

"হোহো করে হেসে উঠতেন মেসোমশাই, বলতেন, 'বড় দামী কথা বলেছিস পাগলী, জীবনে সহজ হওয়ার সাধনাই সবচেয়ে বড় সাধনা। এ সাধনার পরীক্ষায় কটা লোক আর উত্তীর্ণ হতে পারে বল?' হেসে বলতাম,

'দেখছি, সত্যিই স্নেহ বড় বিষম বস্তু, নইলে তোমার মত মানুষও এ-ব্যাপারে বে-সামাল হয়ে পড়ে ?'

"হেসে উঠতেন মেসোমশাই, মাসীমাকে উদ্দেশ্য করে বলতেন, 'আরে শোনো বেটীর কথা শোনো।'

'মাসীমা ততক্ষণে টেবিলে এনে রেখেছেন চা, সেই সঙ্গে নিজের হাতে তৈরী-করা নিমকী। হয়তো বলছেন, 'দেখতো, মা, নুন-টুন সব ঠিক হয়েছে কিনা।' মাসীর হাতের এই ছোট ছোট নিমকি আমার ভারি প্রিয় ছিল। মেসোমশাইকে তাড়া দিয়ে বলতাম, 'না আর কোনো কথা নয়, আগে ছোট মাসীর গুণপনার পরীক্ষা, তারপর অন্য কথা।'

'আজ এই নিঃসঙ্গ দুপুরে অনেক কিছু মনে পড়ছে। মনে পড়ছে, ছোট মাসী আমায় ডাকতেন, রাজকন্যে বলে, আর মেসোমশাই পাগলীমা। আজ ওদের দু'জনার কেউ নেই। আমি পাগলীমা-ও নই, রাজকন্যেও না। শশাঙ্কশেখর চৌধুরী আমাকে কন্যার মর্যাদা দিতে রাজী নন। ল্যান্স ডাউন রোডের ঐ বাড়ির দরজা আমার সামনে চিরদিনের জন্য বন্ধ। দুঃখ হয়—চেনা-জানা গণ্ডী থেকে দূরে সরে যাওয়ার দুঃখ। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা গর্বও বোধ করি। মনে হয়, আমরা—জ্যোতি আর আমি, ডবসন কাকার ছায়ায় থেকে কিছু একটা করছি। এমন কিছু যা' কেবল নিজের সুখ-দুঃখের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ নয়। চৌধুরী ম্যানসন-এ যখন ছিলাম তখন গাড়ি ছাড়া এক পা-ও যেতে হত না কোথাও, বিলীতি জিনিস ছাড়া ব্যবহারের রেওয়াজ ছিল না সেখানে, প্রতিদিন ছিল পার্টি-পিকনিক-হৈ-হুল্লোড়। কিন্তু নিজেকে কখনও খুঁজে পেতাম না সেখানে, কেবলই হারিয়ে যেতাম, হৈ-হুল্লোড়ে চাপা পড়ে যেত মনের সুর। সেই নিজেকে আবার খুঁজে পেতাম মেসোমশাই-এর আস্তানায় এসে। মেসোমশাই-এর কথায় ফিরে পেতাম মনের প্রশান্তি। একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন তিনি, মানুষ আজ ক্রমশ এমন নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছে কেন জানিস ?

—কেন ?

—কারণ আমেরিকার বহির্মুখী সভ্যতা আজ মানুষের ঘাড়ে চেপে বসেছে। বাইরের চটকদার উৎসব আজ তাকে এমনভাবে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে যে, সে তার নিজের অস্তিত্বের কথা ভুলতে বসেছে।' ভুলতে বসেছে আনন্দের উৎসবের কথা। সে আজ চটকদার উৎসবের নেশায় নেশাগ্রস্থ। নেশাগ্রস্থ মানুষের মত্ত্রাসে ছুটে চলেছে তীব্র থেকে তীব্রতর

নেশার দিকে। এমনি ছুটতে ছুটতে একদিন এমন জায়গায় এসে পড়ে যখন তার কাছে মনে হয়, সমস্তই প্রাণহীন। এক ঘেয়েমীর অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ায় তখন, কিন্তু খুঁজে পায় না পথ। মানুষের জীবনে সে এক ভয়াবহ অবস্থা।

—কিন্তু আজও কি মানুষ এ-কথা বুঝতে পারছে না?

—বোঝে বৈকি!

—তবে?

—ঐ যে ববলাম, নেশাগ্রস্থ অবস্থা। বাইরের চটকদার আকর্ষণ তাকে অবশ করে ফেলে, সজাগ থাকতে দেয় না। আজ বাইরেটা নিয়ে মানুষ ক্রমশ প্রতিযোগিতায় মেতে উঠছে, আর ধীরে ধীরে এক সময় নিজের কাছেই হেরে যাচ্ছে, হারিয়ে ফেলছে নিজেকে।

'মেসোমশাইকে দেখতাম কি একটা আনন্দে সব সময় যেন বিভোর হয়ে আছেন। কোনো দুঃখ যেন তাকে স্পর্শ করতে পারত না। অথচ পার্থিব চাওয়া-পাওয়ার দিক থেকে দেখতে গেলে তাঁর দুঃখের অভাব ছিল না। নিজেদের কোনো সন্তান হয় নি। এম. এ. ফার্স্ট ক্লাস করেও সাধারণ মাষ্টারির বেশী চাকরি জোটাতে পারেন নি। যে ভাইটিকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িয়ে সর্বস্ব খুইয়ে বিলেত ঘুরিয়ে নিয়ে এলেন, সে বড় লোকের মেয়ে বিয়ে করে পৃথক হয়ে গেল। তবু মেসোমশাই-এর মুখের হাসিটি একই রকম রয়ে গেল। অবশ্য এর মূলে ছোট মাসীর অবদানও কম নয়। মেসোমশাই যদি ছোট মাসীর মত এমন স্ত্রী না পেতেন তবে হয়তো তাঁর মনে এমন আনন্দ-ধারা বইত না।

"আশ্চর্য! এই মানুষটির প্রতিই বাবা-মার কি অদ্ভুত বিদ্বেষ! সেদিন সবাই এক সঙ্গে খেতে বসেছি—। টেবিলের এক মাথায় বাবা আর এক মাথায় দাদা, এক পাশে মা আর এক পাশে বৌদি আর আমি। মা এক সময় আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'দেখো, খুকু, তুমি শোভার ওখানে যাও এটা আমরা পছন্দ করি না। বহুবার বলেছি, তবু তুমি কথা শুনছ না কেন, কি আছে ওখানে?' আমি চুপ। বাবা মায়ের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বললেন, জীবনে ও নিজে কিছু করতে পারেনি, ওর সঙ্গে যারা বেশী মিশবে তাদের লাইফ-ও নষ্ট হয়ে যাবে।' আমি তখনও চুপ। মা সোজা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে, বললেন, কথা কইছ না যে?'

—কি বলব? —এক পলক মায়ের দিকে চেয়েই চোখ নামিয়ে নিলাম

আমি। মা আমার দিকে চেয়ে রইলেন একটুকাল। তারপর বললেন, 'কিছুদিন থেকেই লক্ষ্য করছি, তোমার আদব-কায়দা চলাফেরা সমস্ত অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে। এমন সব করছ যেটা আমাদের সমাজে বে-মানান। মনে রেখো শোভাকে যা মানায় তোমাকে তা'মানায় না, শোভা যা করতে পারে তুমি তা' করতে পার না, তোমার পথ আর ওদের পথ এক হতে পারে না।'

—তোমরা জিনিসটাকে কেন এমন করে দেখছ, আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। —কথাটা না বলে পারিনি আমি।

—তুমি বুঝতে পারছ না বলেই আমরা অবাক হচ্ছি। যেটা নিজে থেকে বোঝা উচিত ছিল সেটা বলেও বোঝানো যাচ্ছে না, এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয়।

"একটু থেমে মা আবার বললেন, 'শোনো, গরিবানার মধ্যে কোনো বাহাদুরি নেই, ওতে নিজেকেই ছোট করা হয়।' বাবা মুখ না তুলেই বললেন, 'হ্যাঁ, ওদের সঙ্গ তোমাকে ছাড়তে হবে, য়ু মাস্ট।' এরপর আর কোনো কথা চলে না, আমিও চুপ করে গেলাম। কিন্তু বারবার ভাবছিলাম, মেসোমশাই-এর মত লোকেরও শত্রু থাকে কি করে! পরে, অনেকদিন পরে বুঝতে পেরেছিলাম, মেসোমশাই-এর মত লোকের অস্তিত্ব এই সমাজের ওপর তলার কাছে অসহ্য। এঁদের অস্তিত্বই যেন এই ধনিক সমাজের বিরুদ্ধে নিরব জেহাদ। তাই সরব হতে হয় সমাজের ওপর তলার লোককে। এই সব লোকের জীবন ধারা যেন ধনিক সমাজের মূল ধরে নাড়া দেয়। ঠিক এমন করে কথাটা কখনও ভাবিনি ডবসন কাকার সান্নিধ্যে না এলে হয়তো কখনও ভাবতামও না। শুধু এইটুকু কেন, এই পরদেশী মানুষটি আমার সামনে এক নতুন ভাবনার জগত খুলে দিয়েছেন।"…

দুই

এইটুকু পড়েছি, তখনই নামল বৃষ্টি, সেই সঙ্গে দমকা হওয়া। হাওয়ায় এলোমেলো করে দিলে কাগজপত্র। ছুটে গিয়ে ঘরের জানালা বন্ধ করতে করতেও ভিজে গিয়েছিলাম খানিকটা। ফিরে এসে চেয়ারে বসতে বসতেই এক ঝাঁক ভাবনা ঢুকেছিল মাথার ভেতর। আর সেই ভাবনার শুরু দেবজ্যোতির ছেলেবেলার কাহিনী দিয়ে। আসলে এই কাহিনীর শুরুই জট-পাকান সেই ভাবনা দিয়ে।

আমি দেখছিলাম ডবসন সাহেবকে। বইটা উল্টে রেখে এক সময় চেয়ারে

পিঠ দিয়ে চোখ বুজেছিলেন তিনি। তারপর এক সময় চোখ খুললেন আমার। সঙ্গে চোখাচোখি হল, হাসলেন তিনি। আমার চোখে চোখ রেখেই বললেন, 'হঠাৎ আজ ছেলেবেলার কথা বড় মনে পড়ছে। বারবার মনে পড়ছে ডরোথীর মুখখানা।' ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লেন, 'আজ সে কোথায় আছে কে জানে।'

একটুকাল চুপ করলেন আবার। বিষণ্ণতার যে ছায়া ঘনিয়ে এসেছিল তাঁর মুখের ওপর, ধীরে ধীরে তা' কেটে গিয়ে একটা আনন্দের আলো ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর মুখে দেখা দিল একটা খুশির আমেজ। আমার দিকে চেয়ে হাসি মুখে বল্লেন, 'বুঝলে, একদিন সকালে কি কাণ্ডই না করেছিল এই ডরোথী। প্রথমটা আমি সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। সেটা ছিল শীতকালের সকাল। মেঘে মেঘে ছেয়ে আছে সমস্ত আকাশ, কুয়াশায় ঢাকা চারপাশ। কেমন এক ভুতুরে আবহাওয়া। অদূরে চার্চটা নিঃসঙ্গ প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে। কুয়াশার পর্দা দিয়ে দূরের পাহাড়টাকে দেখাচ্ছে ঠিক যেন একটা ভূতের মত। কাঁচের জানালাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে বরফ জমে আছে। আর আমি তখন গায়ে জামার পাহাড় চাপিয়ে বসে আছি ফায়ার প্লেসের সামনে।'

আমার দিকে চেয়ে একটু কৌতুকের হাসি হাসলেন। বললেন, 'আসলে ছেলেবেলায় আমি শীতকে ভারি ভয় করতাম। তুষার দেখলে আগুনের পাশ থেকে নড়তে চাইতাম না কিছুতেই।' কথাটা বলেই হো হো করে হেসে উঠলেন সাহেব। প্রাণখোলা হাসি।

জাঁকিয়ে গল্প শুরু করলেন তিনি। তাঁর গল্পের ছন্দে ছন্দে ফুঠে উঠল এক কিশোরের ছবি। গোব-গাল লাল টুকটুকে চেহারা। সোনালী চুল। নীল এক জোড়া চোখ, কেমন ভীরু ভীরু চাউনি। বুড়ো ঠাকুর্দা-ঠাকুরমার নয়নের মণি। তাঁর কথায় কথায় ফুটে উঠল ইংলণ্ডের গ্রামের এক ছবি। পশ্চিমে কটসওয়াল্ডস-এর কোলে ছোট্ট এক গ্রাম। নাম অটন। পাহাড়ের গায়ে গায়ে ছোট ছোট বাড়ি। সমতল সবুজ শস্যের ক্ষেত। দূরে পশ্চিমে যে উঁচু পাহাড়টা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, তার ও-পাশে চারণ ক্ষেত্র। গ্রামের লোক সেখানে যায় ভেড়া চড়াতে। সাদা ভেড়ার পাল যখন দূর থেকে দূরে চলে যেতে থাকে তখন মনে হয় যেন পাহাড়ের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে এক-এক খণ্ড মেঘ। বালক আর্থার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত সেই দৃশ্য। চারপাশের এলোমেলো ছোট ছোট পাহাড় বুনো ঝোপ ঝাড়ে ঢাকা, সেই ঝোপ ঝাড়ের ফাঁকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে পাইন গাছের দল। বসন্তে দেখা দেয় নানা রঙের

ফুলের আলপনা। —campanules, scabious, milk-wort—আরও কত কি! ফুলে ফুলে ফড়িং প্রজাপতির মেলা।

আর্থার ছোট একটা নেট হাতে ছুটে বেড়াত সেই ফড়িং প্রজাপতির পিছু পিছু, আর তার পেছনে থাকত ছোট্ট মিষ্টি মেয়ে ডরোথী। তার ব্রাউন চুলের ঢেউ আটকা পড়ত হলদে ফিতের বাঁধনে। লাল ঠোঁটে দুষ্টু হাসির বন্যা। ডাগর-ডাগর নীল চোখে অবাক-বিস্ময়। ছুটতে ছুটতে যখন হাঁপিয়ে উঠত ওরা, গিয়ে বসত ঐ বড আখরোট গাছটার নীচে। ডরোথীর এক হাতে কাঁচের পাত্রটায় ততক্ষণে ডজন খানেক ফড়িং জমে গেছে, আর এক হাতে গুচ্ছ গুচ্ছ লাল-সাদা হলদে ফুল। হাঁপাতে হাঁপাতে দুজনে দুজনার দিকে চেয়ে হাসত, অর্থহীন হাসি। অদূরে পাহাড়ের গা বেয়ে পরিষ্কার জলের যে-ঝরণা ধারা নেমে এসেছে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াত ওরা। এক আঁজলা জল খেয়ে আবার দিত ছুট। গ্রামের চার্চটাকে পেছনে ফেলে, ঝাকড়-মাকড় এল্‌ম গাছের দল, সারি সারি বিচ গাছকে পাশে রেখে ওরা ছুটত। ছুটতে ছুটতে এক সময় হারিয়ে যেত পাহাড়ের আড়ালে।

পাহাড়ের কোলে ছবির মত ছোট্ট বাড়ি। বাড়ির সামনে এক ফালি বাগান। বাড়ির পেছনে আস্তাবল। ঘোড়া আছে, গরু আছে। ঘোড়ার সাথে পরম মিতালী সেই বালকের। বাকেট ভর্তি জল এনে খেতে দিত তাকে, পেটে হাত বুলিয়ে আদর করত। সেই ঘোড়াটা হঠাৎ একদিন মরে গেল। সেদিন কি কান্না আর্থারের। ক'দিন খেতেই পারে নি সে। গ্র্যানি-গ্র্যানপা অনেক বুঝিয়েও খাওয়াতে পারেনি তাকে।

ছবির মত ঐ বাড়িটায় থাকে মাত্র তিনটি মানুষ। ঠাকুর্দা-ঠাকুরমা আর আর্থার। ওদের বড় আদরের নাতি সে। শিশুকালে মাকে হারিয়েছে। বাবা, এ্যালফ্রেড আবার বিয়ে করেছেন, থাকেন লণ্ডনের অদূরে হেণ্ডনে। বাবাকে ভাল লাগে না তার। ব্যবসাদার মানুষ, সব সময় থাকেন টাকা-পয়সা আর হিসেব নিকেশ নিয়ে। আর্থারের যত কথা ঠাকুর্দার সঙ্গে। কিছুদিন বাবার কাছে ছিল সে, কিন্তু বেশীদিন স্থির থাকতে পারেনি আর্থার। ঠাকুর্দার কাছে ফিরে এসে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল। ঠাকুরমার গাউনে মুখ লুকিয়ে, রাতের নিরালায় নাইটিঙ্গেলের গান শুনতে শুনতে নিজেকে আবার ফিরে পেয়েছিল সে।

পশ্চিমের পাহাড়টায় টেনে নিয়ে যেত আর্থার তার বুড়ো ঠাকুর্দাকে। ছুটোছুটি দাপাদাপি করে বেড়াত সেখানে। তাড়া দিয়ে দিয়ে ঠাকুর্দাকে

দৌড় করিয়ে ছাড়ত সে। বুড়ো মানুষ অল্পেতেই হাঁপিয়ে উঠতেন, তারপর হাসতে হাসতে এক সময় বসে পড়তেন। সেই বালক ঠাকুর্দার হাত ধরে বলত, 'তুমি কিন্তু হেরে গেলে।' ঠাকুর্দা মাথা দুলিয়ে হাসতেন। তারপর পাইপ মুখে দিয়ে তামাক খেতে বসে যেতেন। আর আর্থার ছুটতে ছুটতে দূরে মিলিয়ে যেত।

ঠাকুর্দাকে সঙ্গে নিয়ে এক-একদিন চলে যেত টেমসের কূলে। সঙ্গে থাকত ডরোথী—মাথায় তার রঙিন রুমাল, গায়ে রঙিন পোশাক। ওকে দেখে মনে হত ঠিক যেন ছোট্ট এক পরী। ঠাকুর্দার চোখের আড়ালে ডরোথীর গালে ছোট্ট একটা চুমু খেয়ে আর্থার ওর কানে কানে বলত, 'ইউ লুক সো নাইস।' ডরোথী হাসি হাসি মুখে ঠোঁটটা বেঁকিয়ে বলত, 'ইউ নটী বয়।' ঠাকুর্দার দুই হাত দুজনে ধরে এক সময় ওরা গিয়ে দাঁড়াত নদীর তীরে। দাদু নদীর দিকে আঙুল তুলে বলতেন, 'পৃথিবী জোড়া এই নদীর নাম। একশো ছিয়ানব্বই মাইল দীর্ঘ এই নদী বৃটিশ সম্রাজ্যের প্রতীক। ইংলণ্ডের প্রাণ।' আরও অনেক কথা, অনেক গল্প করতেন বৃদ্ধ ঠাকুর্দা। বলতেন, এই নদীর ধারে ধারে কত বিচিত্র মানুষের বাস, কত শহর বাজার গড়ে উঠেছে এই নদীর ধারে ধারে।— চিপেনহাম, ফারিংডন, এ্যাবিনডন— আরও কত। কোনোটা ভেড়ার মাংস, শূয়রের মাংস, কোনোটা দুধ-মাখনের জন্য বিখ্যাত। টেডিংটন লক-এর কাছে এসে টেম্‌স্‌ বিরাট আকার ধারণ করেছে। তারপর এক সময় লণ্ডনের বুক চিরে দূরে গিয়ে মিশেছে সাগরে। স্থির হয়ে ঠাকুর্দার কথা শুনত আর্থার। আর ডরোথী ওর কানের কাছে মুখ এনে বলত, 'বড় হলে আমরাও এই নদী বেয়ে একেবারে সাগরে চলে যাব, তারপর ঘুরব দেশ-বিদেশে।' আর্থার খুশি হয়ে ঘাড় নেড়ে বলত, 'সেটা ভারি মজার ব্যাপার হবে।'

সেই ডরোথী, পরীর মত ফুটফুটে ছোট্ট সেই মেয়ে, সেদিন শীতের সকালে একেবারে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। ঘরে ঢুকেই আর্থারকে একেবারে জড়িয়ে ধরে বলল, 'কেমন আছ আর্থার?' চোখ-মুখে ওর আতঙ্কের ছায়া। আর্থার অবাক। ডরোথীর চিবুকে আঙুল ছুঁয়ে অবাক-বিস্ময়ে প্রশ্ন করল, 'হোয়াটস্‌ রঙ?' ডরোথীর মুখে আর রা নেই, ওর চোখে জল টলমল করছে। আর্থারের কথার উত্তর না দিয়েই ওর বুকে মুখ লুকোল সে। আর্থারের তখনও রয়েছে বিস্ময়ের ঘোর। মুখে তার প্রশ্ন, 'ব্যাপার কি ডরোথী?' আর্থারের বুকেই মুখ রেখে উত্তর দিয়েছিল সে, আর সেই উত্তর শুনে আর্থারের সে কী হাসি!

গত রাত্রে ডরোথী এক স্বপ্ন দেখেছে—বিশ্রী স্বপ্ন। টেমসের জলে আর্থার যেন ভাসছে, ভাসতে ভাসতে চলেছে সাগরে, সাগর থেকে গিয়ে পড়ল আর একটা নদীতে—প্রকাণ্ড, ভয়ঙ্কর সেই নদী। সেই নদীর বুকে হঠাৎ উঠল ঝড়, উঠল তুফান, আর সেই ঝড়-তুফানে হারিয়ে গেল আর্থার। ডরোথী প্রাণপণে চিৎকার করে ডাকল তাকে, কিন্তু ঝড়-তুফানের প্রচণ্ড শব্দে ঢাকা পড়ে গেল তার সে ডাক। ফিরে এল না আর্থার। বারো বছরের সেই মেয়েটি আর্থারের বুক থেকে মুখ তুলে প্রশ্ন করেছিল, 'এমন স্বপ্ন কেন দেখলাম, আর্থার?' সে কথায় সেই কিশোরের চোখে ফুটল কৌতুকের ঢেউ, ঠোঁটে হাসির বন্যা।

এর ঠিক চৌদ্দ বছর পর একদিন তিস্তার কূলে হারিয়ে গেল আর্থার। এক জীবন থেকে আর এক জীবনে উত্তরণ হল তার। আর সেইদিন যে-মেয়েটি স্বপ্ন দেখে কেঁদে উঠেছিল, শিউরে উঠেছিল আতঙ্কে, আর্থারের বিপদের সম্ভাবনায় ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছিল সেই কিনা আর একদিন আর্থারের জীবনে একটা ভয়ঙ্কর দিন ডেকে এনেছিল, একেবারে নিঃশেষ করে ফেলেছিল তাকে। ঠিক চৌদ্দ বছর পর এক নতুন ডরোথী এসে দাঁড়িয়েছিল আর্থারের সামনে, ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছিল তার জীবন! প্রয়োজনে একদিন যে-মেয়ে আর্থারের জন্য জীবন দিতে পারত, সেই কি-না একদিন আর্থারের জীবন বিষিয়ে তুলল! কে জানে হয়ত এইটেই জীবনের নিয়ম, এইটেই জীবনের ট্র্যাজেডী।—যে প্রতিজ্ঞা নিয়ে মানুষ একদিন পথ চলতে শুরু করে, কালের স্রোতে কোথায় সেই প্রতিজ্ঞা একদিন ভেসে যায়। তাই হয়ত মানুষের সঙ্কল্পের কথা শুনে বিধাতা পুরুষ মনে মনে হাসেন। হয়ত সেদিনও তিনি হেসেছিলেন, যেদিন ডরোথী সেই শীতের সকালে আর্থারের বুকে মুখ লুকিয়ে বলেছিল, 'আর্থার, তোমাকে দুঃখ পেতে আমি দেব না, কিছুতেই না।'

সেই বালক-বালিকা শীতের সেই সকালে যখন অবোধ ভাষায় কথা বলছিল, কাইজার তখন জার্মানীতে বসে স্বপ্ন দেখছিলেন বিশ্বজয়ের। সেই মুহূর্তে ডরোথী যখন আর্থারের বুকে একেবারে মিশে যেতে চাইছিল, পৃথিবীর বুকে তখন চলছে দিন বদলের পালা। উইলিয়াম কাইজার তখন ভাবছেন, সূর্যের নীচে তাঁর স্থান চাই, চাই বিশ্বজোড়া অগ্রগতি। শক্তির ভারসাম্যে বিশ্বাস ছিল না তাঁর। এদিকে লণ্ডনে প্রধান মন্ত্রী এ্যাসকুইথ তখন চঞ্চল হয়ে উঠছেন। কাইজারের মুখে ফুটে উঠছে ক্রুর হাসি। বিসমার্কের ভবিষ্যৎ বাণী তখন সত্য হতে চলেছে, বলকান রাজ্যগুলো ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। সমগ্র ইউরোপের সামাজিক শক্তি তখন ত্রিধারায় বিভক্ত। একদিকে যেমন বয়ে চলেছে শিল্প-

উন্নয়নের ধারা, অপর দিকে তেমনি চলছে শ্রমিক আন্দোলন এবং সেই সঙ্গে চলছে জাতীয় জীবনে সামাজিক শক্তি বৃদ্ধি। ইউরোপের গণজীবনে বয়ে চলেছে এক ঝড়ো হাওয়া। এমন সময় Serajevo-তে ঘটল-এক অঘটন। অষ্টিয়ার উত্তরাধিকারের হত্যাকাণ্ড সমগ্র ইউরোপের আকাশে ছড়িয়ে দিল আগুন। উত্তাল তরঙ্গে ভেঙে পড়ল সমস্ত গণজীবন।

ইউরোপের গায়ে যখন এমনি করে যুদ্ধের তাপ লাগতে শুরু করেছে, এ্যালফ্রেড ডবসন তখন লণ্ডনে বসে স্বপ্ন দেখছে ভারতবর্ষে এক বিরাট ব্যবসা ফাঁদবার। সে তখন কাইজারের কথা ভাবছে না, ভাবছে না ইংলণ্ডের কথাও, ভাবছে, নিজের কথা, নিজের সুখ-সমৃদ্ধির কথা; ভাবছে কি করে সাত-সমুদ্র পারের ঐ দেশ থেকে ছিনিয়ে আনা যায় ঐশ্বর্য, গড়ে তোলা যায় টাকার পাহাড়। পৃথিবীর সমস্ত এ্যালফ্রেডরা চিরকাল হয়তো এমনি করেই ভেবে এসেছে। আর্থারের ঠাকুর্দা তখন কিন্তু ভাবছেন ভিন্ন কথা। ভিন্ন খাতে বইছে তাঁর ভাবনার স্রোত। ডরোথীর কাঁধে একটা আর্থারের কাঁধে আর একটা হাত রেখে তিনি বলছেন, 'আজ ইংলণ্ড এই যে পৃথিবীর একটা বিরাট অংশ শাসন করে চলেছে, তাতেই জার্মানীর যত ঈর্ষা। পৃথিবীর একটা বড় অংশের সে ভাগ চাইছে, ভোগের লালসা তাকেও মত্ত করে তুলেছে। আর তাই এই লড়াই। কিন্তু এই ক্ষমতার লড়াই-এ আসল যে-চেহারাটা ফুটে উঠছে সেটা কি? সেটা হচ্ছে এই যে, একদল করছে শোষণ আর একদল হচ্ছে শোষিত, এক শ্রেণীর ওপর চলছে আর এক শ্রেণীর পীড়ন। কিন্তু জাতীয়তাবাদের নামে শোষণের এই আসল চেহারাটা পাচ্ছে ভিন্ন রূপ। মানুষ সেখানে যাচ্ছে ছোট হয়ে, বড় হচ্ছে আদর্শের ভাপে ভরা কতগুলো কথা। শোষকের চক্রান্তে বারবার ধোঁকা খাচ্ছে সাধারণ মানুষ। জাতীয়তার মোহে অন্ধ হয়ে এক দেশের শোষিত মানুষ, আর এক দেশের আর এক শোষিতের বুকে বসাচ্ছে ছুরি।' টেমসের তীরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই বৃদ্ধ বলেন, এই সাদা কথাটা মানুষ কেন বোঝে না? আর্থার কিছু বোঝে, কিছু বা বোঝে না, তবু কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে তার মন।

কলকাতায় শশাঙ্কশেখর চৌধুরীর কানে তখন অন্য মন্ত্র। তার পিতার কাছে বসে সে পাচ্ছে ভিন্ন শিক্ষা। পিতা বসে পুত্রকে বোঝাচ্ছেন এই ইংরেজ জাতির মহত্ত্বের কথা, বোঝাচ্ছেন, "কত বড় ব্যবসায়ী বুদ্ধি সম্পন্ন, বিচক্ষণ জাতি এই

ইংরেজ, বোঝাচ্ছেন এই জাতির অধীনে থাকা কত বড় গৌরবের ; সেই সঙ্গে শিক্ষা দিচ্ছেন কেমন করে বড় হতে হয়, কেমন করে সাধারণের কাছ থেকে টাকা ছিনিয়ে নিয়ে হতে হয় অসাধারণ, কেমন করে গড়ে তুলতে হয় ঐশ্বর্যের পাহাড়।

আবার এরই পাশাপাশি তখন ফুটে উঠেছে আরও একটা ছবি। রবীন্দ্রনাথ এবং বালগঙ্গাধরের পাশে দাঁড়িয়ে ভারতের শুভদিনের স্বপ্ন দেখছেন এ্যানি বেসান্ত।

ইতিহাসের এমন এক সন্ধিক্ষণে কেউ-কি একবারও ভাবতে পেরেছিল, টেমসের কূলের সেই খুদে ছেলেটি একদিন ভারতের মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে ভারতের সুদিনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠবে, জীবন পণ করবে বাঙলার জন-জীবনের জন্য ?

আমার এক কথার উত্তরে হাসতে হাসতে একদিন বলেছিলেন সাহেব, এমনিই হয়, প্রতি মুহূর্তে মানুষের জীবনে ঘটে এমন অঘটন।

সত্যিই তো, ভাবছিলাম আমি, এমনই অঘটন যদি না ঘটবে তবে দার্জিলিঙে জলাপাহাড় থেকে ফিরবার পথে দেবজ্যোতির ভাবালুতা, তার জীবনের নিঃসঙ্গতা ললিতাকে এমন করে কাছে টানবে কেন ? এর আগে তার জীবনে এমন ঘটনা তো ঘটেনি কখনও। তার পানি প্রার্থীর তো অভাব ছিল না। কিন্তু কেউ তো তাকে এমন করে কাছে টানতে পারেনি। অথচ সেখানে চোখে পড়ার মত এমন কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেনি যা ললিতার মত মেয়ের জীবনে আনতে পারে এমন অভূতপূর্ব আলোড়ন। সেদিন বার বার কেঁপে উঠেছিল তার বুক, দুলে উঠেছিল মন। আপন ভাবে আপনি যেন পাগল হয়ে উঠেছিল সে। তাই ডায়েরীর পাতায় লিখতে হয়েছিল তাকে ডন-এন দু'ছত্র কবিতা—

All other things to their destruction draw,
Only our love hath no decay ;
This no to-morrow hath nor yesterday,
Running it never runs from us away,
But truly keeps his first, last, everlasting day.

লেখার পর তার হাসি পেয়েছিল, নিজেকে বড় ছেলেমানুষ মনে হয়েছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে হাল্কাও হয়েছিল মন।

তিন

ওদের কথা এমনি এলোমেলো ভাবে ভাবতে ভাবতে কখন যেন একেবারে

শুরুতে ফিরে গিয়েছিল মন। সেই জলাপাহাড়ের পথ। ঢাল হয়ে নেমে এসেছে পথ, ধারে ধারে পাইন গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। দূরে দূরে খেলাঘরের মত পাহাড়ের গায়ে সেঁটে আছে বাড়িগুলো, এলোমেলো চারপাশে মাথা তুলে আছে ছোট ছোট শৃঙ্গ। চারপাশটা দেখতে দেখতে সেই পথে ফিরছিল দেবজ্যোতি। পথেই বৃষ্টি শুরু। ঝিরঝির বৃষ্টি, অথচ তখনও অনেক পথ। একটু একটু করে বৃষ্টির তোড় বাড়তে শুরু করল. দেবজ্যোতি এগোতে সাহস করল না আর। রাস্তার ধারের একটা শেলটারে ঢুকে পড়ল সে। একটা বেঞ্চে জাঁকিয়ে বসে সিগারেট ধরাল একটা। চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল দূরের পাহাড়টাকে, মেঘে-পাহাড়ে কুয়াসায় একাকার হয়ে গেছে। কি একটা নির্মল গাম্ভীর্য যেন ফুটে উঠেছে সমস্ত দৃশ্যটার মধ্যে। দেখতে দেখতে প্রশান্তিতে ভরে উঠল দেবজ্যোতির বুক। মেঘ-বৃষ্টি-কুয়াসা, পর্বতের শান্ত গাম্ভীর্য সব মিলিয়ে দেবজ্যোতি যেন এক নতুন জগতের সন্ধান পেল। এ জগতের স্বাদ তার কাছে একেবারে নতুন—এ জগৎ আনন্দময়তার জগৎ। এ জগৎ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ-কষ্টের গণ্ডী থেকে মানুষকে যেন অনেক উর্ধ্বে টেনে নিয়ে যায়, ভুলিয়ে দেয় তার অস্তিত্বের গ্লানি। বাবা-মা-দিদির কথা মনে পড়লেই শ্বাস রোধকারী যে কষ্টটা তার বুক থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইত, এক লহমায় সেখানে যেন একটা প্রশান্তির প্রলেপ পড়ল। হতাশার যে অন্ধকার তার চোখের ওপর ফুটে উঠেছিল সেখানে দেখা দিল আনন্দের আলো। দেবজ্যোতি ধীরে ধীরে আবৃত্তি করতে লাগল, 'আনন্দ-ধারা বহিছে ভুবনে।' একটু একটু করে কণ্ঠে তার ফুটে উঠল সুর,—

> চারিদিকে দেখো চাহি হৃদয় প্রসারি
> ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি ……
> আনন্দ-ধারা বহিছে ভুবনে।……

গানের মধ্যে সে কেমন তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ বাধা পেল সে। মেয়েলী গলার রিন রিন শব্দ তাকে যেন বাস্তবে টেনে নিয়ে এল।

—বাঃ, আপনিও আটকা পড়েছেন দেখছি। —সেই সুরে কৌতুক। ফিরে তাকাল দেবজ্যোতি। ললিতা চৌধুরী। তার গায়ের রেন কোট বেয়ে ঝরছে জল, মুখে হাসির ঢল, চোখে কৌতুকের বিদ্যুৎ ঝিলিক। দেবজ্যোতি চেয়েই রইল, সরাতে পারল না চোখ। এক লহমায় একটা আলোড়ন হয়ে গেল তার বুকের মধ্যে।

একটু হেসে বলল দেবজ্যোতি, 'যাক্, এতক্ষণে তবু একজন সঙ্গী পাওয়া

গেল। কি দুর্যোগ বলুন তো?' রেন কোটটা খুলতে খুলতে বলল ললিতা, অথচ এই দুর্যোগের দিনে, ঘন ঘোর বরিষায়, আপনি তো দিব্যি আনন্দ-ধারা বইতে দেখছেন। ধন্য আপনার দর্শন শক্তি।' দেবজ্যোতি হাসল, হেসে বলল, 'আপনি কি দেখছেন?' ললিতা বেঞ্চটায় বসল, কাঁধ থেকে ক্যামেরা নামিয়ে রেখে হেসে বলল, 'আমি? আমি তো দেখছি—।' গম্ভীর গলায় সুর করে গান ধরল ললিতা, 'প্রলয়-ঝঞ্ঝা বজ্র হানিছে কালো মেঘে ওঠে ঝড় তুফান।' ওর গান গাইবার ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল দেব-জ্যোতি, বল্লে, 'তা হলে ও দুটোই ঠিক। কেউ ভুল দেখছি না।'

—কমপ্রোমাইজ করতে চাইছেন?

—না, আসলে ও দুটোই ঘটছে।

—কি রকম?

—মাপ করবেন রকম বলতে গেলে কিন্তু আমার নিজের মত করে ব্যাখ্যা দিতে হয়।

—তাই দিন না। —ঠোঁট টিপে হাসল ললিতা।

—এ-কথা তো ঠিক যে, প্রকৃতির প্রতিটি জিনিসে ছড়িয়ে আছে আনন্দ?

—কিন্তু ব্যক্তি বিশেষে তা গ্রহণের তারতম্য ঘটে, সকলের রস গ্রহণের ক্ষমতা তো সমান নয়। —তর্কের স্বাদ ললিতার কণ্ঠে।

—কিন্তু রসগ্রহণ করতে হলে, প্রতিটি মানুষের যতটুকু রসদের প্রয়োজন সবাই কি তা' সমান পায়?

—তা' হয়তো পায় না, কিন্তু তাতে কতটুকু এসে যায়?

—অনেকখানি। বন্টনের এই অসাম্য থেকেই মানুষের মনে জমা হতে থাকে অসন্তোষ। এই অসন্তোষ জমাট বেঁধে ঘনিয়ে ওঠে বিদ্রোহের কালো মেঘ, শুরু হয় প্রলয়-ঝঞ্ঝা। কিন্তু পাশাপাশি আনন্দ-ধারাও বয়—নতুন গড়ার আনন্দ।

দেবজ্যোতির মুখের দিকে একটুকাল চেয়েই সশব্দে হেসে উঠল ললিতা। বলল, 'বাপ্‌রে, আপনি তো একেবারে গুরুগম্ভীর ব্যাপারে চলে গেলেন। তবে যাই হোক, দুটো কনট্রাডিকটরি ব্যাপারকে বেশ যুৎ করে এক খাতে বইয়ে দিলেন। আপনার প্রশংসা না করে পারছি না।

—কনট্রাডিকসন-এর কথা বলছেন? ও-জিনিসটা তো আমাদের জীবনকে সব সময় ঘিরে রয়েছে। আমার কথাই ধরুন, কলকাতায় পরিচিত বন্ধু-

বান্ধবদের মধ্যেও নিজেকে সব সময় কেমন নিঃসঙ্গ মনে হত, ভারি অসহায় মনে হত, অথচ আজ যখন ঝম ঝম করে বৃষ্টি এল, একটা মানুষেরও সারা-শব্দ নেই কোথাও, তখন হঠাৎ নিজের মধ্যে কেমন জোর খুঁজে পেলাম। মনে হতে লাগল, আমি যেন আর একা নই, পৃথিবী জুড়ে আছে আমার অস্তিত্ব, বিশ্বের প্রতিটি মানুষের মাঝে আছে আমার আশার বাণী। লক্ষ লক্ষ বৃষ্টিকণার মধ্যে খুঁজে পেলাম আমার শক্তি, আমার সাহস। নিজেকে এতটুকু অসহায় মনে হল না আর।

শেষের দিকে কথাগুলো আবেগে ভরে এসেছিল ওর। তাই নিজেকে সংযত করতে বাইরের দিকে চাইল সে! ললিতার মুখের ওপর থেকে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়েছিল এতক্ষণের সেই হাল্কা ভাব। একটু একটু করে ভাবনার ছায়া ঘনিয়ে এসেছিল সেখানে। অনেকগুলো ভাবনা এক সঙ্গে যেন হুমরি খেয়ে পড়েছিল ওর মনের ভেতর। দেবজ্যোতির প্রতি বিশেষ আকর্ষণের একটা সূক্ষ্ম রেখা নিজের মধ্যে অনুভব করছিল সে। একটুকাল চুপ করে দেবজ্যোতির পূর্বের কথার জের টেনে বলে, পারহ্যাপস্ ইওর লোনলিনেস ইজ ইওর স্ট্রেংথ্‌, দেবজ্যোতি ওর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে সহজ গলায় বলল, 'কথাটা কেমন যেন শোনা শোনা মনে হচ্ছে।'

—মনে নেই, কোথায় যেন পড়েছিলাম, লেখক বলছেন, My loneliness is my strength।

দেবজ্যোতি একটু চুপ করে বলল, 'আসলে কি জানেন, জীবনটাই বৈপরীত্যের এক সংমিশ্রণ।'

—সে-তো একশো বার। জীবন মানে তো স্থির কোনো কিছু নয়, জীবন বলতে একটা চলমানতাকে বোঝায়। কাজেই সেখানে আজকের বোধের সঙ্গে গতকালের বোধের অমিল থাকতেই পারে, একটা বোধ আর একটা বোধের বিপরীত হওয়াও অসম্ভব নয়।

—আপনার কথা কিন্তু আর একটা প্রশ্নের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

—কি রকম? হেসে উত্তর করলে ললিতা।

—এই যে দুটো বোধের কথা বল্লেন তার কোন্‌টা আমাদের এগিয়ে দিচ্ছে আর কোন্‌টাই বা পেছিয়ে দিচ্ছে তা' বুঝবো কি করে? অর্থাৎ আমরা কি করে বুঝবো যে, আমরা এগোচ্ছি না পেছোচ্ছি।

—এ-ভাবে কিন্তু আমি কখনও ভাবিনি, তবু এই মুহূর্তে যা মনে হচ্ছে তাই বলতে পারি।

—তাই বলুন না। এটা তো শ্রেফ আলোচনা। —সহজ হল দেবজ্যোতি।

—আমার মনে হয়, ব্যক্তি স্বার্থের গোলোক ধাঁধায় যখন ঘুরি তখন আমরা যাই পোছিয়ে, আর সমষ্টি বোধই আমাদের এগিয়ে দেয়।

—তা হোলেও কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়। নিজের কথা না ভেবে কেবল অন্য পাঁচ জনের কথাই ভাববো, নইলে পেছিয়ে যাব, এটাই বা কেমন কথা?

—এ-ভাবে দেখছেন কেন? এক একটা মানুষ তো আর এক একটা দ্বীপ নয়, একজনের সঙ্গে রয়েছে আর একজনের যোগসূত্র। পাঁচ জনের সমষ্টিগত ভালোমন্দের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষটিও জড়িত আছে।

—কিন্তু ব্যক্তি স্বার্থের বোধ তো প্রতি মুহূর্তে মানুষের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায়, তার কি হবে?

—সে-তো হতেই পারে। মনে মনে তখন দ্বন্দ্ব চলবে। দ্বন্দ্বের মাধ্যমেই মানুষ নিজেকে বোঝে, সে এগিয়ে চলে।

—এইরে, আপনি যে একেবারে দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব এনে ফেলছেন দেখছি! হাল্কা গলায় হেসে উত্তর করল দেবজ্যোতি। সেই সঙ্গে ললিতাও হাসল, বলল, 'ভয় নেই, অতদূর এগোতে পারব না, এত বিদ্যে-বুদ্ধি আমার নেই।'

—বটে! —কথাটা বলেই হো হো করে হাসতে লাগল দেবজ্যোতি।

—বাঃ, হাসছেন যে?

—আচ্ছা, নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখার মধ্যে বেশ একটা মাদকতা আছে, তাই না?

—হঠাৎ এ-প্রশ্নের কারণ?

—কারণ আপনি।

—মোটেই না। আমি মোটেই নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখছি না, যা সত্যি তাই বলেছি। —ওর গলায় কেমন এক ছেলেমানুষীর অসহায়তা ফুটে উঠল।

—তা' হোলে বোধ হয় আমার বোঝার ভুল হয়েছে। —কপট গাম্ভীর্যে উত্তর করল দেবজ্যোতি।

—আলবাৎ! —কথাটায় অহেতুক একটা জোর দিল ললিতা।

দেবজ্যোতি আবার হেসে ফেলল, ওর মুখের দিকে চেয়ে হাসল ললিতাও। তখনও অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে।

একটুকাল দু'জনেই চুপ। দেবজ্যোতি সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করল কয়েকবার, পারল না। হাওয়ায় নিভে গেল দেশলাইয়ের কাঠি। ললিতা হেসে

বল্লে, 'নিন, রেনকোটটার আড়াল করছি ধরিয়ে নিন।' দেবজ্যোতি হাসল। ললিতার সাহায্যে সিগারেটটা ধরিয়ে আরাম করে টান দিল একটা। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ভাবছিল, মেয়েটির কী অদ্ভুত মানসিক বল; এই দুর্যোগে এমন এক নিরালা স্থানে আধা-চেনা একটা পুরুষের সঙ্গে এতখানি সময় কাটিয়ে দিতে এতটুকু ভয় পাচ্ছে না! এমন সহজ ভাব, যেন এটা কোনো বিশেষ ব্যাপার নয়। মনে মনে বলল দেবজ্যোতি, এমন মেয়ে বাংলাদেশে সত্যিই দুর্লভ। ঘাড় ফিরিয়ে ললিতার দিকে তাকাল সে, তারপর আস্তে বল্লে, 'আজও তা' হোলে একাই বেরিয়েছিলেন?'

—উপায় কি? দাদা-বৌদিকে কি আর সহজে নডান যায়? কিন্তু বেরিয়েই দেখুন কি কাণ্ড! —বাইরে বৃষ্টির দিকে চাইল সে। বাইরে তখন বৃষ্টির সঙ্গে শিল পডছে।

—আমার কিন্তু ভালই লাগছে। দার্জিলিঙের আর একটা রূপ দেখা গেল।

—দার্জিলিংকে ভালবেসে ফেলেছেন দেখছি।

—সত্যিই তাই। —একটুকাল চুপ করল দেবজ্যোতি, তারপর বলল,— 'আজ ডবসন কাকার কথাই বারবার মনে পডছে। আসবার আগে তিনি বলেছিলেন, যাও ঘুরে এসো, শান্তি পাবে, বুঝতে পারবে মানুষের সাথে পর্বতের কতখানি আত্মিক যোগ রয়েছে। তার কথাটা যে কতখানি সত্যি এখন তা' অন্তরে অন্তরে অনুভব করছি।'

দেবজ্যোতির চোখের দিকে একটুকাল চেয়ে রইল ললিতা, বুঝতে চেষ্টা করল ওকে, তারপর আস্তে বলল, 'ডবসন কাকা কে?'

—ডবসন কাকা! —চুপ করল দেবজ্যোতি, ভাবল একটু, তারপর ধীরে ধীরে বল্লে, 'সামান্য কথায় তাঁর পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। শুধু বলতে পারি, তিনি এক বিরাট মহীরুহের মত, তাঁর ছায়ায় অসংখ্য মানুষ নিশ্চিন্তে আশ্রয় নিতে পারে।' ললিতার দিকে ফিরে, ওর চোখে চোখ রাখল দেবজ্যোতি। বল্ল, 'জাতিতে তিনি ইংরেজ, পিতা ছিলেন মস্ত পয়সাওয়ালা লোক, অথচ তিনি নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন এদেশের কাজে। আজ ভারতই তাঁর দেশ। অবশ্য সত্যি কথা বলতে গেলে, মনে মনে তিনি বিশ্বের নাগরিক। পুরো নাম আর্থার ডবসন। চেনা-জানা মহলে ডবসন কাকা। ষাটের ওপর বয়সের এই বৃদ্ধ মানুষটিকে দেখলে আপনা হোতেই শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে।'

—তাঁর সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে রইল। —ছোট্ট করে উত্তর করল ললিতা।

—হ্যাঁ, আসুন একদিন। নিশ্চয় করে বলতে পারি আলাপ করে আনন্দ পাবেন।

ললিতা উত্তর করল না আর, দেবজ্যোতিও চুপ। বাইরে তখন প্রচণ্ড বৃষ্টি সেই সঙ্গে খৈ-মিছরির মত শিল পড়ছে চার পাশে। সেই দিকে চেয়ে ওরা বসে ছিল চুপ করে। দুজনারই মনে তখন বইছিল একটা নতুন ভাবনার স্রোত। ললিতা এক সময় বল্ল, 'এমন প্রচণ্ড শিলা বৃষ্টি হতে কখনও দেখিনি। ভারি অদ্ভুত লাগছে।' দেবজ্যোতি একটু হেসে বল্ল, 'আমি কিন্তু দেখেছি। ছেলেবেলায় যেখানে থাকতাম, সেখানে খুব শিলাবৃষ্টি হত, তবু কিন্তু আজ আমার সব নতুন মনে হচ্ছে, ভারি ভালো লাগছে।'

—ছেলেবেলায় আপনি বুঝি কলকাতার বাইরে থাকতেন?

—হ্যাঁ। —দেবজ্যোতি একবার বাইরের দিকে চাইল, তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে ললিতার মুখের ওপর রাখল। আস্তে আস্তে বল্লে, 'থাকতাম বগুড়া শহরে। ডিষ্ট্রিক্ট টাউন। ছোট শহর, কিন্তু ভারি সুন্দর করে সাজানো, মনে মনে যেন এখনও দেখতে পাই সে-শহরের ছবি।' —বাইরে উদাস দৃষ্টি মেলে দিয়ে দেবজ্যোতি, ধীরে ধীরে বলতে লাগল, 'দাদু ছিলেন পুলিশ অফিসার, শেষ বয়েসে তিনি বদলি হলেন ঐ শহরে। রিটায়ার করবার পর বাড়ি-ঘর-দোর করে রয়ে গেলেন ঐ শহরেই, বাবাও প্র্যাকটিস শুরু করলেন ওখানকার কোর্টে।' একটু থেমে আবার বল্ল, 'আসলে আমাদের পিতৃ পুরুষের ভিটে বর্ধমানে।' দেবজ্যোতি চুপ করল, ওর চোখে-মুখে ঘনিয়ে এল বিষণ্ণতার একটা ছায়া। ললিতার দৃষ্টি থেকে সেটুকু এড়াল না।

—তারপর? —ললিতার প্রশ্ন।

—তারপর? তারপর পার্টিশন, ধীরে ধীরে গঙ্গা দিয়ে বয়ে গেল অনেক জল। এখন তো আমি পূর্ণ স্বাধীন, একেবারে একা। —কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে একটা বিশেষ ভঙ্গি করল দেবজ্যোতি। এদিকে আকাশ তখন পরিষ্কার হয়ে এসেছে, থেমে গিয়েছে বৃষ্টি। দেবজ্যোতি বলল, আর নয় এখন উঠুন। বৃষ্টি থেমে গেছে।

—হ্যাঁ, চলুন।

উঠে পড়ল ওরা।

ঢালু পথ। সেই পথ বেয়ে নীচে নামতে লাগল দু'জন, পাশাপাশি। হাওয়ার বেগ তখন বেড়েছে অনেক। রাস্তার দু'পাশের রডোডেনড্রন গাছে লেগেছে দোল, মাতাল হয়ে উঠেছে দেবদারুর দল, ঝোপে ঝাড়ে বাতাসের

আলিঙ্গন। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের দল উড়ে চলেছে। অদূরে দুটো পাহাড়ের মাঝ দিয়ে চলেছে দু'এক খণ্ড সাদা মেঘের আনাগোনা। একটু আগের বৃষ্টির জল গাছের পাতায় ফুলের পাপড়িতে। হাওয়া লেগে ঝ'রে পড়ছে সেই জল। বর্ষণক্লান্ত আকাশে ঔদাসীন্যের একটা মিষ্টি আমেজ। সব মিলিয়ে এক মন-মাতান পরিবেশ। চারিদিক দেখতে দেখতে নীচের দিকে নামছিল ওরা—দেবজ্যোতি আর ললিতা।

হাওয়ার উল্টো দিকে নামতে কষ্ট হচ্ছিল বেশ। বে-সামাল হয়ে যাচ্ছিল ললিতার শাড়ি, খোলা চুলে লেগেছিল ঝড়ের মাতন। ওর মনটাও সেই সঙ্গে পাল তুলে যাত্রা করেছিল অজানার পথে। ললিতার চেতনার পটে তখন রঙের ছটা, হাজারো কথার ভিড় জমেছে সেখানে, রকমারী দৃশ্যের সমাবেশ। নতুন অভিজ্ঞতার বারি সিঞ্চনে আবেশময় হয়ে উঠছিল তার মনের তন্ত্রীগুলো। ভাবতে শুরু করেছিল সে. যাচাই করতে চাইছিল নিজেকে।

ললিতার এতদিনের অভিজ্ঞতায় কোথায় যেন একটা চিড় ধরেছিল। চেনা-জানা পরিবেশের চারপাশটা দেখে দেখে পুরুষ সম্বন্ধে যে ধারণাটা রূপ নিয়েছিল, সে যে কত অসম্পূর্ণ হঠাৎ যেন তা' প্রকাশ হয়ে পড়েছিল ওর সামনে। দাদাকে দেখেছে সে, বাবাকে দেখেছে, দাদা-বাবার বন্ধুদেরও দেখেছে। দেখেছে তার পাশে ঘুর-ঘুর করা ওর করুণাপ্রার্থীর দলকে। মনে হয়েছে, ওরা সবাই সমান, সব যেন এক ছাঁচে গড়া। ওদের সকলের যেন একই স্বপ্ন। —রোজগার করব, ভালো রোজগার করব, আরও ভালো রোজগার করব। —বড় হব, আরও বড হব, মনের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যের নির্ভরতা অর্জন করব। জীবনে এর চেয়ে বড় লক্ষ্য যেন আর নেই। কেরিয়ার ওদের ধ্যান-জ্ঞান। অর্থ-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে চাই ভোগের জন্য নারী দেহ—সঙ্গ নয়, কামনাই সেখানে প্রধান। এর মাপ-কাঠিতেই যেন পুরুষের শক্তির বিচার, পুরুষের পুরুষত্ব। নারীকে ভালবাসা দিয়ে কতখানি পূর্ণ করতে পারবে এ-দিয়ে তারা নিজেদের যাচাই করে না. একটা নারীর জীবনে সে কতখানি সিকিউরিটি এনে দিতে পারবে এ-নিয়েই তাদের বড়াই। একটা পুরুষ থেকে তাই আর একটা পুরুষের মধ্যে কোনো প্রভেদ খুঁজে পেতনা ললিতা, সবাইকে যেন একই মনে হত ওর। ভাবতে ভাবতে রতনলালের কথাটা মনে পড়ে গিয়েছিল হঠাৎ। রতনলাল ওদের সোসাইটিরই একজন। তখন সবে ফিরেছে আমেরিকা থেকে। সোসাইটিতে তখন মস্ত প্রতাপ। কোন একটা পার্টিতে দুজন পাশাপাশি বসে গল্প করতে

করতে একদিন বলেছিল রতনলাল, 'দেখো, মিস চৌধুরী, তোমার কাছে এলেই আমার মনে হয়, আমার আইডেনটিটি যেন নষ্ট হয়ে গেছে।'

'কেন?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিল ললিতা।

'বার বার তুমি যখন আমার এবং আমার মত আর পাঁচ জনের সঙ্গে একই রকম ব্যবহার কর, তখন মনে হয় আমরা যেন সবাই এক হয়ে গেছি। আমার সেপারেট একজিসটেন্স যেন আর খুঁজে পাই না। যাই বল, দিস ইজ রিয়লি ডিসট্রেসিং!'

'সত্যি আমি দুঃখিত, ইচ্ছে করে —' কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করেছিল ললিতা।

'No, that won't mend। পরিষ্কার করে বলতো, আসলে তোমার চোখে সমস্ত পুরুষই এক কিনা?'

'সবার যদি একই রকম জীবন-দর্শন হয়, এক রকম করেই সবাই যদি ভাবে, তাহলে আমি কি করতে পারি বলুন?' সহজ ভাবেই উত্তর দিয়েছিল ললিতা।

'দ্যাট্‌স রাইট। আমার তাহলে বুঝতে ভুল হয়নি।' হেসে উত্তর দিয়েছিল রতনলাল।

তার ধারণার সোজা সরল পথে চলতে চলতে এই প্রথম একটা বাঁক পেল ললিতা। থমকে দাঁড়াতে হল তাকে। মেসোমশাই-এর মত মানুষকে অবশ্য সে দেখেছে, কিন্তু তিনি তা সাধারণ মানুষ ছিলেন না, ভাবে ললিতা। সাধারণ মাপকাঠি দিয়েও বিচার চলে না তাঁর। তিনি ছিলেন এক আদর্শ জগতের মানুষ, তাই তাঁর কথা এমন করে কখনও ভাবেনি সে। কিন্তু আজ সে এমন একজন মানুষকে দেখতে পেয়েছে যার ভাবনার সুর আর পাঁচ জনের সুরের সঙ্গে মেলে না। যার গড়ন-পিঠন স্বতন্ত্র। এমন একজন মানুষ যে-নিজের ভাবনার সাগরে ডুব দিতে জানে, বাইরের ভিড়ে হারিয়ে না গিয়ে যে একাকীত্বে খুঁজে পায় তার শক্তি, ফিরে পায় তার সাহস। মানুষের মাঝে শুনতে পায় তার আশার বাণী। কথাটা ভাবতে অবাক লাগে ললিতার। জীবনে এই প্রথম তার এমন একজন মানুষের সঙ্গে আলাপ যে এই সমাজে থেকেও বড়-আরও বড় হওয়ার স্বপ্নে বিভোর নয়, নিজের গণ্ডীর বাইরেও যার আর একটা জগৎ আছে, একটা আদর্শের আবহাওয়ার মধ্যে যে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কি যেন নাম ভদ্রলোকের, ভাবতে চেষ্টা করল ললিতা। দেবজ্যোতি, হ্যাঁ, দেবজ্যোতি। কথায় কথায় বেশ হাল্কা সুরেই বণ্টনের

অসাম্যের কথাটা বলে ফেলেছিল দেবজ্যোতি। আসলে সেটা যে তার ক্রমাগত চিন্তারই বহিঃপ্রকাশ এটা বুঝতে বাকী থাকেনি ললিতার। দেবজ্যোতি যে একটা বিশেষ চিন্তাকে লালন-পালন করে নির্দিষ্ট একটা পথের দিকে এগিয়ে চলেছে, এ-কথাটাও বুঝতে পেরেছিল সে। আর এ-কথাটাও বুঝেছিল, সে-পথ আর যাই হোক, আর পাঁচটা সাধারণ লোকের পথ থেকে একেবারে স্বতন্ত্র।

সবচেয়ে অদ্ভুত ঐ মানুষটির দৃষ্টি! এ-কথা ঠিক, আর পাঁচটা মেয়ের মত পুরুষ মানুষকে অহেতুক ভয় করে না ললিতা, নিরিবিলিতে একা কোনো পুরুষের সামনে হঠাৎ গা ছম ছম করে ওঠে না ওর। তাই বলে নিজেকে সজাগ রাখতেও কসুর করে না সে। বাহুবল তার কম নেই, অপরকে কাৎ করার মত কয়েকটা প্যাঁচও তার জানা, যে-কোনো সাধারণ পুরুষকে রুখবার মত ক্ষমতা সে রাখে, তবু মেয়েদের স্বাভাবিক ধর্ম অনুসারে পুরুষের সব দৃষ্টি সহ্য করতে পারে না সে। সবাই যে দৃষ্টির জিভ দিয়ে নারীদেহ লেহন করে তা' নয়; তবু সব দৃষ্টিতেই কেমন যেন একটা ক্ষুধা, কি একটা মানসিক দারিদ্র্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। তাই অস্বস্তি বোধ করে ললিতা, সেই সঙ্গে মানুষগুলোর জন্য করুণাও বোধ করে সে। কিন্তু এই প্রথম একজন পুরুষের দৃষ্টি তেমন করে বেঁধেনি ললিতাকে, বরং একটা প্রশান্তির প্রলেপ বিছিয়ে দিয়েছে তার মনে। মনে মনে তাকে তাই বারবার শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারেনি সে।

ভাবতে ভাবতে একটা তীব্র অনুভূতি ঘিরে ধরল ললিতাকে। একটা প্রচণ্ড আকর্ষণ অনুভব করল সে, দেবজ্যোতির জীবন সম্বন্ধে একটা অদম্য কৌতূহল চঞ্চল করে তুলল তাকে। একটা নতুন জীবনের স্বাদ পেল ললিতা।

দেবজ্যোতির নাকে অনেকক্ষণ থেকে একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছিল। হিমেল হাওয়ার সঙ্গে মিঠে গন্ধটা একটা আমেজ সৃষ্টি করছিল ওর মনে। বৃষ্টির পর মেঘ কেটে গিয়ে তখন আলো ফুটেছে, সে-আলো ছড়িয়ে পড়েছে প্রতিটি ঘাসে, ঝোপে-ঝাড়ে। বর্ষণ শেষের আকাশে তখন চলেছে খণ্ড মেঘের আনাগোনা। তাতে লেগেছে সূর্যের শেষ রশ্মির আল্পনা। দূরে দূরে চলেছে নীড়ে ফেরা পাখীর আনন্দোৎসব। গাছে গাছে লেগেছে মাতাল হাওয়ার হিল্লোল। সব মিলিয়ে পরিবেশটায় যেন এক রোমান্টিক আবেশের ছোঁয়া। সেই রোমান্টিক পরিবেশের রঙ এসে ছোপ ধরিয়েছিল দেবজ্যোতিরও মনে। বিষণ্ণতার যে মেঘটা জমে উঠছিল সেটা কেটে গিয়েছিল ওর মন থেকে।

ললিতার পাশে পাশে পথ বেয়ে নেমে আসছিল দেবজ্যোতি। দুটো হাত

প্যান্টের পকেটে গলিয়ে প্রায় মাটির দিকে দৃষ্টি রেখেই নেমে আসছিল সে। পথ চলতে চলতে বারেকের জন্য চেয়েছিল ললিতার দিকে। ললিতা তখন হাওয়ায় কাপড় সামলাতে ব্যস্ত, হাওয়ায়-কাপড়ে দুটো পা জড়িয়ে যাচ্ছিল ওর, কষ্ট হচ্ছিল নামতে। তবু দেবজ্যোতির চোখে চোখ পড়তে ঠোঁট টিপে হেসেছিল সে। সেই হাসির রেশ গিয়ে লেগেছিল দেবজ্যোতির মনে, সেখানে উঠেছিল এক বিচিত্র বর্ণের ঢেউ।

দেবজ্যোতির নাকে তখনও ভেসে আসছিল মাতাল-করা, আমেজ-মাখানো সেই মিঠে গন্ধটা। মনে মনে সেই গন্ধের উৎস সন্ধানের চেষ্টা করছিল দেবজ্যোতি। ভাবছিল, এ কি পথের পাশের বনফুলের গন্ধ, না, ললিতার ব্যবহার-করা কস্‌মেটিকসের, কিংবা ললিতার দেহের এ-সুবাস? নাকি সব মিলেমিশে একাকার হয়ে সৃষ্টি হয়েছে সৌগন্ধের এই বিচিত্র সংমিশ্রণ? ভাবতে ভাবতে কেমন এক তন্ময়তার স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল দেবজ্যোতি। গন্ধে ভরা হিমেল হাওয়ায় ললিতার নামটাও যেন ওর মনের সঙ্গে লেপ্টে যাচ্ছিল বারবার। ওর মনে হচ্ছিল, ঐ সহজভাবের মেয়েটা ওর বড় আপন জন, বড় কাছের মানুষ। অথচ নিজের কাছেই এ-ভাবনার কোনো যুক্তি পাচ্ছিল না সে। বরং এ-ভাবনা তার মনের কাঙালপনাকেই প্রকাশ করছিল, মনে মনে সে যে নিঃস্ব তা-ই যেন প্রকট হয়ে উঠছিল এতে। তাই বিশ্রী লাগছিল দেবজ্যোতির। মেয়েটিকে আপনজন ভাবার মধ্যে যেমন একটা আনন্দানুভূতির দোলায় দুলছিল সে, সেই সঙ্গে বাস্তব-ভিত্তিক যুক্তির একটা তীব্র কষাঘাত কষ্টও দিচ্ছিল তাকে।

দেবজ্যোতির সামনে কতগুলো প্রশ্ন যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। কে এই মেয়েটি? ওকে নিয়ে এমন করে ভাবনার কি আছে এত? একটা মেয়েকে নিয়ে এমন ভাবনা কি তার হীন মনেরই একটা নগ্ন রূপ নয়? মেয়েটির সঙ্গে দেবজ্যোতির কিসের সম্পর্ক? কতটুকুই বা তাকে সে জানে? বরং যেটুকু জেনেছে তা'তে তো এই প্রমান হয়েছে যে, ওদের দুজনের বাস দুই মেরু প্রদেশে, দুজনের টান দুই দিকে, দুজনের পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন মুখী। তবু কিসের এত আকর্ষণ? উত্তর মেলেনি। মেয়েটির বুদ্ধি-দীপ্ত-মুখশ্রী, তার বাচন-ভঙ্গিমা, সহজ ভাবের আচার-আচরণ—কোনটা দেবজ্যোতিকে এমন করে কাছে টানছে? এই সব কিছুর সংমিশ্রণে যা হয় তারই নাম কি পারসোনালিটি? মেয়েটির ঐ পারসোনালিটি কি ওকে এমন করে চঞ্চল করে তুলেছে? তারও সঠিক উত্তর খুঁজে পায়নি দেবজ্যোতি। তবে কি এ-আকর্ষণ শশাঙ্কশেখর চৌধুরীর কন্যা বলেই? কথাটা ভাবতেই কিসের একটা খোঁচা লাগে ওর মনে।

একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করে সে। আর তখনই ওর হিসেবী মনটার একটা বিরাট অট্টহাসি ফেটে চৌচির হয় ওর চেতনার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে। তবু চেতনার পটে ভেসে থাকে ললিতার সেই মুখ।

দেবজ্যোতি আর একবার যাচাই করতে চাইল ওর মনটাকে, বুঝতে চাইল নিজেকে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ললিতা ওর দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসল। হাসির সঙ্গে ওর গালে পড়ল টোল। চোখ জোড়া বুজে এল একটু। সঙ্গে সঙ্গে দেবজ্যোতির মনে পড়ে গেল দার্জিলিঙে আসার পর সেই প্রথম দিনের কথা।

অতীতের সেই ভয়ঙ্কর দিনটার কথা মনে পড়লেই একটা বিষণ্ণতার কালো মেঘ ছেয়ে ফেলত ওকে। সমস্ত পৃথিবীর ওপর বিষাদে ভরে উঠত ওর মন। কোনো কিছু ভাল লাগত না আর, সমস্ত দেহ জুড়ে নেমে আসত অবসাদের গ্লানি। সেই সময়টাতে ক্রমাগত কটা দিন ধরে ওর মনটা জুড়েথাকত এমনি এক অশান্তির ছায়া। সব দেখে শুনে ডবসন কাকা একদিন বললেন, 'যাও, কোথাও ঘুরে এসো ক'টা দিন।' তাতে মন সরছিল না ওর। শেষ পর্যন্ত ডবসন কাকার পীড়াপীড়িতেই চলে আসতে হয়েছিল দার্জিলিঙে। আসার আগের মুহূর্তেও কিন্তু মনের সেই গ্লানি কাটেনি, সমগ্র মানব সমাজের বিরুদ্ধেই একটা বিজাতীয় প্রতিহিংসা তখনও ওকে কুরে কুরে খাচ্ছিল।

দার্জিলিঙের প্রথম প্রভাতেই ওর মনের পটে কিন্তু ফুটেছিল নতুন রঙ। নতুন এক আশার বাণী শুনতে পেয়েছিল সে। ঘরের জানালা দিয়ে কাঞ্চন-জঙ্ঘার তুষার শৃঙ্গে যখন দেখেছিল রঙের মেলা, তখন কী-এক অনাস্বাদিত আনন্দে ওর হৃদয়-মন ভরে উঠেছিল। সমস্ত বিষাদের ছায়া কেটে গিয়েছিল ওর মন থেকে, এক লহমায় ভাল বেসেছিল দার্জিলিঙকে, ভাল বেসেছিল ধ্যান-গম্ভীর হিমালয়কে। সেই মুহূর্তে ওর মনে হয়েছিল, এই মানব সমাজের আমরা কেউ কখনও হারিয়ে যাই না, ফুরিয়ে যাই না কেউ, আমাদের ভেতরে যে-শক্তি তার বিনাশ নেই। সে কেবল রূপ বদলায়, তার রূপান্তর ঘটে। এমন করে এর আগে দেবজ্যোতি কখনও ভাবেনি, এ-উপলব্ধি তার একেবারে নতুন। প্রভাত সূর্যের আলো-ঝলমল গিরিশৃঙ্গের দিকে তাকিয়ে সে দার্জিলিঙকে সুপ্রভাত জানিয়েছিল। প্রশান্তির আবেশ ছড়িয়ে গিয়েছিল ওর মনে।

দেবজ্যোতি উঠেছিল লুইস জুবিলী স্যানেটোরিয়ামে। স্টেশন থেকে নীচের দিকে তাকালেই দেখা যায় হোটেলটাকে। পাহাড় কেটে গড়া সাজানো মস্ত হোটেল। শঙ্কাশ-ষাট ফুট ওপরে স্টেশন থেকে হোটেলটাকে দেখে মনে

হয় যেন নানা রকম রঙ ঢেলে আঁকা একটা ছবি। মাঝখানে সবুজ ঘাসে ঢাকা বিরাট একটা লন, তাকে গোল করে ঘিরে রেখেছে বোর্ডারদের জন্য বিল্ডিং, কিচেন, ডাইনিং হল। প্রত্যেকটা বিল্ডিং-এর সামনে ফুলের মেলা—গোলাপ, ক্যাকটাস, হরেক রকম সিজন ফ্লাওয়ার। এক পাশে একটা ফোয়ারা, তার জলে আছে ছোট ছোট মাছ। অদূরে গুটীকয়েক ন্যাসপাতি গাছ। লনে বসেই দেখা যায় তুষারে-ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘা, আরও ছোট ছোট পাহাড়ের চুড়ো দেখতে পাওয়া যায় ঐ লন থেকেই। সব মিলিয়ে সমতলের মানুষের কাছে এক মোহময় পরিবেশ।

সকালের জলখাবার শেষ। বোর্ডারদের অনেকেই রোদে পিঠ দিয়ে বসেছে লনে। কারও যেন কোনো তাড়া নেই, একটা আলস্য ছড়িয়ে আছে সকলের দেহে। এখানে ওখানে তিন চারজনের ছোট ছোট জটলা, কেউ কেউ বই হাতে নিয়ে নিজের মধ্যে ডুব দেবার চেষ্টা করছে। চারিদিক যেন অবসরের ছড়াছড়ি। দেবজ্যোতিও সোনালী রোদ গায়ে মেখে একটা চেয়ার টেনে বসেছিল ফোয়ারাটার ঠিক পাশেই। চারপাশটায় একটা অলস দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ফোয়ারাটার চারপাশের ছোট ছোট মাছগুলোর খেলা দেখতে শুরু করেছিল সে। দেখতে দেখতে একটা ছেলেমানুষী আনন্দ পেয়ে বসেছিল ওকে। একটা মাছ যখন আর একটা মাছকে তাড়া করছিল, ওর তখন হাসি পাচ্ছিল যেমন করে হাসি পেত সেই ছেলেবেলায় করতোয়া নদীর ধারে, বন্ধুর পাশে বসে। সেই ফোয়ারটার কাছে বসে স্মৃতিচারণে মগ্ন হয়েছিল দেবজ্যোতি। ধীরে ধীরে ওর মন থেকে সরে গিয়েছিল অনেকগুলো বছর, আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ভরা কৈশোরের চিত্রটা ভেসে উঠেছিল ওর সামনে বাস্তব গিয়েছিল হারিয়ে।·····

মিষ্টি একটা নাম—করতোয়া। ছোট্ট নদী, কাঁচের মত স্বচ্ছ তার জল। দূর থেকে এঁকে-বেঁকে এসে আবার হারিয়ে গেছে দূরে। কুলুকুলু-কুলুকুলু মিষ্টি সুর ছড়িয়ে দিচ্ছে দুই পারে। একদিনের স্পষ্ট একটা ছবি ভেসে উঠেছিল দেবজ্যোতির মনে।

তখন স্কুলে গ্রীষ্মের ছুটী। আর সেদিনটা ছিল একটা রোদ্দুরে দুপুর। নদীর এ পাশে বিস্তীর্ণ মাঠ। তার মাঝে মাঝে ছোট ছোট বালির পাহাড়। মাঠের ঠিক মাঝখানে জটাজুটধারী বিরাট বুড়ো বটগাছটা। তারই নীচে আছে আদ্দিকালের সেই শিবের মূর্তি। কতকাল আগে নাকি বেরিয়েছিল মাটী ফুঁড়ে, কেউ তার হিসাব রাখে না। নদীর ও-পারে চাষের ক্ষেত, জলের গা-ঘেঁষে সাদা কাশ ফুল। তাতে কাদা-খোঁচা, পানকৌড়ি ·· কর দলের ইতস্তত বিচরণ।

গরুর পাল চরছে মাঠে, সঙ্গে রাখাল। দু'একজন নদীর জলে ছিপ ফেলে বিড়ি টানছে আপন মনে। বটগাছটার ঘন ছায়ায় শুয়ে কেউ কেউ গভীর নিদ্রায় অচেতন। *মাঠে পোকা খেয়ে বেড়াচ্ছে দোয়েল-শালিকের দল। দূরের আকাশে* চিলগুলো উড়ছে আর উড়ছে, যেন ওড়ার নেশা লেগেছে ওদের। ঝাউগাছটার একেবারে মাথায় বসে ডাকছে শঙ্খ চিলটা। সব মিলিয়ে কেমন এক আবেশ-ভরা দুপুর।

এরই মাঝে বড়দের দৃষ্টি এড়িয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে দেবজ্যোতি আর বন্নু। জলের ধারে বসেছে ওরা পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি। বড় বাড়ির মেয়ে লাবণ্য। লাবণ্য থেকে বন্না, বন্না থেকে বন্নু। সেই বন্নু ওর ছোট্ট দুটো হাত রেখেছে দেবজ্যোতির কাঁধের ওপর, দুজনেই ঝুঁকে পড়েছে দুজনের দিকে। এক ঝাঁক ছোট মাছ খেলা করছে পাড়ের একেবারে কাছে। তাই দেখে চোখের ফাঁদ বড় হয়ে উঠেছে বন্নুর, দেবজ্যোতির কানের কাছে মুখ এনে বলছে সে, 'খবরদার, জলে নামতে যেওনা যেন, মাসীমা বকবেন।' ভাবখানা কিন্তু ঠিক উল্টো, আসলে সে বলতে চায়, দেবজ্যোতি যদি জলে নেমে মাছ ধরতে যায়, তাহলে খুবই ভাল হয়, কিন্তু সঙ্গে বন্নুকে নিতে হবে, নইলে সব ফাঁস হয়ে যাবে মাসীমার কাছে। ওকে সঙ্গে নিলে দেবজ্যোতির মার কাছে কিছু বলবে না সে। অর্থ বুঝতে বাকী থাকে না দেবজ্যোতির। বন্নুর দিকে চেয়ে সে হেসে বলে, 'তোকে নিয়ে যদি জলে নামি?'

বন্নু ধরা পড়ে সলজ্জ হাসি হাসে। ছোট্ট করে বলে, 'যাঃ।' ওর চিবুকটা তখন দেবজ্যোতির কাঁধের ওপর, বন্নুর গরম নিশ্বাস লাগছে দেবজ্যোতির বুকে। ইতিমধ্যে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে সেই মাছের ঝাঁক, আর বন্নুরও দৃষ্টি সরে গেছে অন্যদিকে। একটা আঙুল তুলে দূরে দেখিয়ে বলল সে, 'দেখো, দেখো, মাছরাঙাটার ঠোঁট থেকে কিভাবে মাছটা পড়ে গেল।' নাক কুঁচকে বিচিত্র মুখ-ভঙ্গি করে নিজেই আবার বলল সে, 'বেশ হয়েছে!' বলেই হেসে উঠল বন্নু, হাসতে গিয়ে ওর গালে পড়ল টোল, চোখটা এল বুজে। দেবজ্যোতি তখনও তাকিয়েছিল বন্নুর মুখের দিকে।

আর ঠিক তখনই জলতরঙ্গের মত একটা হাসির শব্দে ওর চি ায় ছেদ পড়ল, বর্তমানের ধাক্কায় অতীতটা গেল তলিয়ে। ছোট্ট একটা নিশ্বা

ঠেলে বেরিয়ে এল ওর বুক থেকে, সেই সঙ্গে ভাবল সে, বন্ধু আজ কোথায় কে জানে!

হাসির রেশটা কিন্তু তখনও ওর কানে। চোখ দিয়ে হাসির উৎসটা খুঁজতে গিয়েই দৃষ্টি পড়ল ললিতার ওপর। সেই প্রথম দেখা। অবাক হয়ে দেখল দেবজ্যোতি, ঐ মেয়েটিরও হাসতে গেলে গালে টোল পড়ে, চোখটা যায় বুজে। বাল্যের স্মৃতিতে তখনও ভরপুর ওর মন, বন্ধুর সেই টোল-পড়া গাল হাসি-মাখা মুখ তখনও ওর মনের পর্দায়। সমস্ত চেতনা তখনও প্রায় অতীত দিনের আলোয় মাখামাখি। ঠিক তখন, ঠিক তখনই আর একটি হাসি-মাখা মুখ আছড়ে পড়ল ওর মনের ওপর। কয়েকটা সেকেণ্ডের জন্য একটা আবিষ্টের মত চেয়ে রইল দেবজ্যোতি ঐ মুখের দিকে। ওর মনের পর্দায় দুটো মুখ হঠাৎ মিলে মিশে যেন একাকার হয়ে গেল।

দেবজ্যোতি যখন চেয়েছিল এমনি করে তখনই পাথরওয়ালাটা ডেকেছিল তাকে। দেবজ্যোতি আর একবার ওর চারপাশটায় নজর করেছিল। ওরই হাতকয়েক দূরে গোল হয়ে বসেছিল তিনজন। একজন ভদ্রলোক, দুইজন ভদ্র মহিলা। এক পলকেই বোঝা যায় একজন ভদ্রলোকের স্ত্রী, অপর জন তাঁর বোন। একজন পাথরওয়ালার সঙ্গে কথা হচ্ছিল ওদের। তারই কি-কথায় হেসে উঠেছিল ভদ্রলোকের সেই বোন—ললিতা। সেই হাসিই অতীত থেকে ওকে টেনে এনেছিল বর্তমানে। সে আবিষ্টের মত তাকিয়েছিল সেই দিকে। পাথরওয়ালাটা সাক্ষী মেনেছিল ওকে, কয়েকটা ছোট ছোট চকচকে পাথর হাতে নিয়ে বলেছিল, 'দেখিয়ে তো বাবু ক্যায়সা বড়িয়া চিজ।' ওরা তিনজনেই এক সঙ্গে চেয়েছিল দেবজ্যোতির দিকে। ওর তখন একটা অহেতুক অস্বস্তি। পাথরওয়ালা আবার বল্ল, 'আইয়ে না, সাব, দেখিয়ে।' এবার একটু ইতস্ততঃ করল দেবজ্যোতি, বলল, 'আমি তো ও-সবের কিছু বুঝি না।' কিন্তু কে শোনে সে কথা, সে নাছোড়বান্দা। ভদ্রলোক এবার মুচকি হেসে বল্লেন, 'আসুন না, বলছে যখন।'

এগিয়ে গিয়েছিল দেবজ্যোতি। নেপালী লোকটি তাকে বারবার বোঝাতে চাইছিল, সস্তা দামে কত ভাল জিনিস সে দিচ্ছে। ইংরেজী হিন্দী মিশিয়ে সে বোঝাতে চেষ্টা করছিল। একটা পাথর হাতে তুলে নিয়ে সে বলেছিল, 'দেখিয়ে তো, হাউ গ্লিটার্স।' কথাটায় হেসে উঠেছিল সবাই, হেসেছিল ললিতাও হাসতে হাসতেই বলেছিল সে, 'আবার গ্লিটার্স!' আগের হাসির কারণটা এবার বুঝতে পারে দেবজ্যোতি। মনে মনে সেও কৌতুক বোধ

করছিল, একটু হেসে রসের ওপর রসান দিয়ে বলেছিল, 'তবে ব্যাপারটা কি জান, ভাই, অল দ্যাট গ্লিটার্স ইজ নট গোল্ড।' কথাটার পুরো অর্থ বুঝল না লোকটি, বুঝবার কথাও নয় তার, কিন্তু হেসে উঠল ওরা তিন জনই। একটা এ্যাপ্রিসিয়েসনের দৃষ্টি নিয়ে মেয়েটি চেয়েছিল দেবজ্যোতির চোখের দিকে—এক পলকের জন্য দু'জন দেখেছিল দুজনকে।

এক সময় চলে গিয়েছিল পাথরওয়ালা, আর তার পরই ওদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল দেবজ্যোতির। ভদ্রলোকের অনুরোধে ওদের পাশে গিয়ে বসেছিল সে। স্বাভাবিক কারণেই আলোচনা শুরু হয়েছিল নানা রকম পাথরের কোয়ালিটিকে কেন্দ্র করে, বিভিন্ন স্থানে একই পাথরের দামের তারতম্যের কথাটাও স্থান পেয়েছিল সে-আলোচনায়। কথায় কথায় কাশ্মীরের রেফারেন্স টেনেছিলেন ভদ্রলোক। আলোচনার মোড় এক সময় ঘুরে গিয়েছিল দার্জিলিঙের বর্তমান আবহাওয়া সম্বন্ধে। তিন দিন পরে সেদিনই নাকি প্রথম রোদ উঠেছে। তিনদিন হল এসেছে ওরা, এর মধ্যে বেরোতে পারেনি কোথাও, কেবল মেঘলা আর বৃষ্টি। এমনি করে আলোচনা শুরু হয়েছিল ব্যক্তিগত বিষয়ের অনেক দূর থেকে, ধীরে ধীরে এক সময় আলোচনাটা ব্যক্তিগত পরিচয়ের আদান-প্রদানের মধ্যে এসে থেমেছিল। ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিয়ে স্ত্রী এবং বোনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। দেবজ্যোতিও নিজের নাম-ধাম প্রকাশ করেছিল ওদের কাছে।

কলকাতার অন্যতম শিল্পপতি শশাঙ্কশেখর চৌধুরীর পুত্র ও কন্যা—রঞ্জন আর ললিতা। রঞ্জনের স্ত্রী মিতা চৌধুরী। প্রত্যেক বছরই অন্তত একবার বাইরে কোথাও বেড়াতে বেরোয়। ওরা তিনজন এক সঙ্গে বেড়াতে বেরোবে এটা যেন পরিবারের একটা অলিখিত নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাসখানেক বা মাস দেড়েক কোথাও কাটিয়ে আবার ফেরে কলকাতায়। কচিৎ কখনও চৌধুরী-সাহেবও সঙ্গে আসেন ওদের, তখন একেবারে এলাহি ব্যাপার। প্লেন ছাড়া প্রায়ই কোথাও যান না। কিংবা সটান গাড়ি করে চলে আসেন, কোথাও গিয়ে থাকেনও না বেশীদিন। যতদিন থাকেন ততদিনই কিন্তু একটা হৈ হৈ ভাব। চৌধুরী সাহেব এলে মিসেস চৌধুরীও সঙ্গে থাকেন, কিন্তু কেউই থাকতে পারেন না বেশীদিন। চৌধুরী সাহেবের ব্যবসা সংক্রান্ত হাজার কাজ, মিসেস চৌধুরীও নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, সোস্যাল ওয়ার্ক করেন তিনি, কাজের অন্ত নেই। কাজেই ছেলে-মেয়েরাই এক সঙ্গে বেরোবে কিছুদিন হল এটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আগামী বছর রঞ্জন বিলেত যাচ্ছে, ম্যানেজমেন্ট এ্যাকাউন্টেন্সীর ওপর পড়াশুনো করে আসবে, সঙ্গে মিতাও যাবে। চৌধুরী সাহেবের ইচ্ছে, ললিতাও যাক, কিছু একটা পড়ে আসুক। এ-ব্যাপারে ললিতার উত্তর খুব স্পষ্ট, 'আজেবাজে কতগুলো জিনিষ মগজে ঢুকিয়ে লাভ কি! অতএব তার বিলেত যাওয়া অনিশ্চয়তার ওপর ঝুলছে, সে মন স্থির করতে পারেনি এখনও। গত বছর ইংরেজীতে এম. এ. পাশ করে এখন ক্যামেরা নিয়ে মেতে আছে ললিতা। বাড়িতে তো ছোট খাট স্টুডিও তৈরী করে বসে আছে। নিজের ঘরে যত রাজ্যের ফটোগ্রাফির বই আর জার্নাল। আগে পড়ত, ক্লাসের বই ছাড়া ইকনমিকস্ আর পলিটিকসের বই, এখন পড়ে ফটোগ্রাফির। কথা প্রসঙ্গে হাসতে হাসতে বলেছিল রঞ্জন, 'এবার দার্জিলিঙ তো ললিতার জন্যই আসা। এর আগের বার পরীক্ষার জন্য ও আসতে পারেনি, আমি আর মিতা এসে ঘুরে গেছি। আমাদের দেখা সব সারা। এবার ও ঘুরে ঘুরে ওর মনের মত ছবি তুলবে।'

রঞ্জনের কথার ভাবে হেসে ফেলেছিল ললিতা। বলেছিল, 'অত করুণ স্বরে বলোনা, দাদা, ভয় নেই আমি তোমায় ঘোরাব না। আমি একাই ছবি তুলে বেড়াব। তুমি চুপ-চাপ ঘরে বসে থেকো।'

—নাঃ, একেবারে চুপ-চাপ বসে থাকতে পারব না, ম্যাল পর্যন্ত যাব।—

কথাটায় হেসে উঠেছিল ওরা, হেসেছিল দেবজ্যোতিও। হাসতে হাসতেই বলেছিল ললিতা, 'বেড়াতে বেরিয়ে তুমি যে কি করে এমন বসে কাটাও ভেবে পাইনে।'

—এ্যাণ্ড আই হ্যাভ গট দ্য সেম কোশ্চেন টু আস্ক। বাইরে বেরিয়ে কোথাও একটু আরাম করবি, তা'নয়, কেবল ঘুরে ঘুরে শরীর নষ্ট!

—আসলে তোমরা দুই ভাই-বোন ডায়ামেট্রিক্যালী একেবারে অপোজিট বিন্দুতে বসে আছ, তোমাদের মিলবে কি করে? —গ্রীবা ভঙ্গী করে বলেছিল মিতা চৌধুরী।

—আর তুমি? —ললিতার প্রশ্ন।

—আমার কথা ছেড়ে দাও ভাই, আমার নিজস্ব বলে কি কিছু রেখেছি? কথাটা বলেই দেবজ্যোতির দিকে চেয়ে একটু যেন লজ্জা পেয়েছিল রঞ্জনের স্ত্রী।

—আ-চ্ছা-আ! —হেসে উঠেছিল ললিতা। ওর হাসিতে যোগ দিয়ে-ছিল বাকী সবাই।

সেই প্রথম আলাপেই ভাল লেগেছিল মেয়েটিকে। রঞ্জন আর মিতা সম্বন্ধে ওর মনে হয়েছিল, আজকের এই সমাজে পরগাছা হয়ে যে একটা অংশ বেঁচে আছে ওরা তাদেরই মধ্যে থেকে উঠে এসেছে। ওরা সমাজের রক্ত নিঙড়ে নিয়ে আমোদ করে। এমন কথা কিন্তু ললিতার সম্বন্ধে মনে হয়নি ওর, অথচ সমাজের একই অংশের তিনটি মানুষ ওরা। 'কেন মনে হয়নি সে-কথা ও নিজেই ভেবে পায়নি।

দিন-দুই পর দেখা হয়েছিল মহাকালের গুহার সামনে। হোটেলের বাইরে দুজনের সেই প্রথম দেখা। সেদিন সকালে ম্যালে গোটা কয়েক পাক খেয়ে উঠে এসেছিল অবসরভেটরী হিলে। ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল মহাকালের গুহার সামনে। সেখানে আর কেউ ছিল না, একা সে দাঁড়িয়ে রইল গুহাটার মুখোমুখী। একটা বিরাট গহ্বর যেন হাঁ করে আছে। নানা লোকে নানা কথা বলে গুহাটার সম্বন্ধে। কেউ বলে, এই গুহা নাকি স্বয়ং মহাদেবের, কেউ বলে, এই গুহা পথে হাঁটলে একেবারে নেপালে গিয়ে ওঠা যায়। একবার নাকি এক বিদেশী ট্যুরিষ্ট গুহা পথে এগোতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর ফিরে আসতে পারেনি। লোকের মুখে মুখে ফিরতি কথা, কাজেই সত্য-মিথ্যে যাচাই করার দায় নেই কারও। দেবজ্যোতি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে এগিয়ে গেল গুহাটার কাছে। গর্তটা খানিকটা পথ সোজা গিয়ে তারপর একেবারে নেমে গেছে নীচের দিকে। মিশে গেছে ঘন-কাল অন্ধকারে। একটা গোটা মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না গর্তটার ভেতর। দেবজ্যোতি কৌতুহলী হয়ে মাথা নীচু করে ঢুকতে চেষ্টা করল গুহায়, আর ঠিক তখনই 'ক্লীক' করে একটা আওয়াজ হতেই ফিরে চেয়েছিল পেছনে। পেছনে ফিরেই দেখতে পেয়েছিল ললিতাকে, ওর হাতে ক্যামেরাটা তখনও ফটো তোলার ভঙ্গিতেই ধরা ছিল। দেবজ্যোতি হেসে বেরিয়ে এসেছিল গুহা থেকে। ললিতার সামনে এসে প্রশ্ন করেছিল, 'কখন এলেন?'

—আপনার পেছনেই তো ছিলাম? —খুব সহজ ভাবে উত্তর দিয়েছিল ললিতা।

—একেবারে লক্ষ্য করিনি তো।

—লক্ষ্য করবেন কি করে, যা অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটছিলেন।

—তা'হবে। —দেবজ্যোতির মুখে সলজ্জ হাসি। একটু থেমে, আবার বলেছিল, 'এ পর্যন্ত কত ছবি তোলা হল?'

—খুব বেশী নয়।

—যাক, তবু তো আপনার ক্যামেরায় আমি স্থান পেলাম। —একটু হেসে বলে দেবজ্যোতি।

—তা আর বলি কি করে? —মুচকি হাসে ললিতা। —ছবিটা তো আসলে গুহাটার, আপনার উপস্থিতি তাতে একটু প্রাণের ছোঁয়া এনে দিয়েছে।

ললিতার হাসি-হাসি মুখের দিকে তারিফ-চোখে চেয়ে থাকে দেবজ্যোতি। কোনো উত্তর করে না সে।

পাহাড়টাকে একটা চক্কর মেরে ওরা দুজনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল মহাকালের মন্দিরের সামনে। ছোট বড় অসংখ্য গাছ ঘিরে রেখেছে মন্দিরকে, তাই অরণ্যের মধ্যে প্রাচীন মন্দিরের একটা আমেজ রয়েছে সেখানে। সেদিনটা ছিল কি একটা উৎসবের দিন। দূর দূর গ্রাম থেকে এসেছে অনেক মানুষ, পূজো দিচ্ছে সবাই, ভক্তেরা প্রদক্ষিণ করছে মন্দির। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখছিল ওরা। আর ঠিক তখনই ওর নাকে এসে লেগেছিল সেই গন্ধটা—মাতাল-করা, আমেজ-মথানো সেই মিঠে গন্ধটা। সেই গন্ধটা আচমকা যেন একটা দোলা দিয়েছিল ওর মনে।

'কি ভাবছেন এত?' ললিতার প্রশ্নে দেবজ্যোতির চিন্তায় ছেদ পড়ল। বাস্তবে ফিরে এল সে। কিছুক্ষণের মধ্যে সে যেন একটা জীবন পরিক্রমা করে এল। ওরা ততক্ষণে পৌঁছে গিয়েছিল ম্যালের সীমানার মধ্যে। দেবজ্যোতি ফিরে চাইল ললিতার দিকে, বড় যেন চেনা মনে হল তাকে, মনে হল বড় আপন জন।

—কি ভাবছিলেন এতক্ষণ?

—নাঃ, কিছু না তো। —একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে উত্তর করল দেবজ্যোতি।

—তখন থেকে চুপ করে আছেন, একেবারে সাড়া নেই, তাই জিজ্ঞাসা করলাম। —একটু থেমে আবার বল্ল,—লেখার অভ্যেস আছে বুঝি?

—হঠাৎ এ-প্রশ্ন?

—হঠাৎ মনে হল তাই, কারণ জিজ্ঞাসা করলে কিন্তু উত্তর দিতে পারব না। বলেই হাসল ললিতা।

—নাঃ, আপনাকে দেখছি বিলেত যেতেই হচ্ছে।

—মানে?

—বিলেত যান, গিয়ে ব্যারিস্টারীটা পড়ে নিন। আপনার কাজে না লাগলেও ভবিষ্যতে আমাদের মত লোকের উপকারে আসতে পারে।

—বাঃ, আপনি তো দেখছি ভারি স্বার্থপর, নিজের প্রয়োজনের কথা ভেবে আমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন সাত-সমুদ্র তেরো নদীর পারে! মজা তো মন্দ না।

ওর কথা বলার ভঙ্গিমায় দেবজ্যোতি হেসে ফেলল। কিন্তু কিছু একটা উত্তর দেবার আগেই ওর দৃষ্টি পড়েছিল মিতা আর রঞ্জন চৌধুরীর ওপর। ওরা তখন ম্যালের পেছন থেকে এগিয়ে আসছিল সামনের দিকে! ততক্ষণে ওরাও দেখতে পেয়েছে দেবজ্যোতি আর ললিতাকে, রঞ্জনরা এগিয়ে এসেছিল ওদের সামনে।

—কিরে জলাপাহাড় গেলি না? —মুচকি হেসে ললিতাকে প্রশ্ন করল রঞ্জন।

—নাঃ। যা বৃষ্টি যেতে সাহস হল না। পথে দেবজ্যোতিবাবুর সঙ্গে দেখা, উনি জলাপাহাড় থেকে ফিরছিলেন, দুজনে এক সঙ্গেই ফিরে এলাম।

—তাহলে তুই-ও ভয় পাস? যাক, দার্জিলিং এসে একটা নতুন কথা জানা গেল।

—বাঃ, ভয়কে একেবারে জয় করে বসে আছি এ কথাটা আমি আবার বল্লাম কবে?

—বলবি কেন, তোর কাজ-কর্মই প্রমাণ করেছে।

—আরে, তোমরা থামতো। —রঞ্জনকে ছোট্ট করে একটা ধমক দেয় মিতা, তারপর দেবজ্যোতির দিকে ফিরে বলে, 'আপনিও দেখছি খুব ঘুরতে ভালবাসেন?'

—তা বলতে পারেন, ঘুরতে আমার খারাপ লাগে না। —উত্তর করে দেবজ্যোতি।

—তা হোলো তো ভালই হল,—দু'হাত তুলে একটা ভঙ্গি করে বলে রঞ্জন,—ললিতার একজন সঙ্গী জুটে গেল, ঘুরে বেড়াতে ওর আর কোনো অসুবিধে হবে না।

—তুমি বেশ আছ, দাদা। কেবল তোমার ভয়, কোথাও আবার তোমায় টেনে নিয়ে না যাই। তুমিই দেখালে! —কথাটা না বলে পারে না ললিতা।

বেশ একটু কৌতুক বোধ করে দেবজ্যোতি। খানিকটা গাম্ভীর্যের ছাপ মুখে নিয়েই বলে, 'কিন্তু রঞ্জনবাবু, আমি যে শাস্ত্রের নিষেধ লঙ্ঘন করার অপরাধে অপরাধী হয়ে পড়বো?'

—কি রকম? —রঞ্জন প্রশ্ন করে। মিতা আর ললিতা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় ওর দিকে।

—মিস চৌধুরীর সঙ্গী হ'বার কথা বলছি, শাস্ত্রে আছে না, 'পথি নারী বিবর্জিতা'?

—ও, মাই লর্ড, সে-তো অবলা নারী সম্বন্ধে, সবলার ক্ষেত্রে কি একথা চলে? আই সি, ইউ আর ব্যাক ডেটেড।

রঞ্জনের বলার ভঙ্গীতে সবাই হাসে, হাসে ললিতাও।

রঞ্জনের কথা যে মিথ্যে নয় ক'দিনের মধ্যেই সে-কথাটা বুঝতে পেরেছিল দেবজ্যোতি। বুঝতে পেরেছিল' ললিতা আর পাঁচটা মেয়ের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, সত্যিই সে সবলা।

এরপর ওরা দু'জন কতদিন ঘুরে ঘুরে বেরিয়েছে, হেঁটে বেড়িয়েছে সর্বত্র, এতটুকু ক্লান্তি বোধ করেনি ললিতা, উৎসাহে এতটুকু ভাটা পড়েনি তার। আনন্দের একটা কলতান যেন উৎসারিত হত ওর মনে, তার আভাস দেখা দিত ওর চোখে-মুখে। ওরা বার্চহিল পাহাড়ে গেছে, গেছে বোটানিকসে, ঘুরে ঘুরে দেখেছে চা-এর বাগান, চা-এর গন্ধের মাদকতায় আচ্ছন্ন হয়েছে, দুটি পাতা একটি কুঁড়ির হাতছানিতে দিশেহারা হয়েছে।

স্টেপ এ্যাসাইডের পাশ দিয়ে পাশে পায়ে হাঁটা পথ বেয়ে একদিন গিয়েছিল লেবং রেস কোর্সে।

দু'পাশে পাইন বন, মাঝে পায়ে-হাঁটা খাড়াই পথ। নির্জন সেই পথে ফিরছিল ওরা, দেবজ্যাতি আর ললিতা। ঐ পথ বেয়ে উঠতে শেষের দিকে সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল দেবজ্যোতির। মুখে কথাটা প্রকাশ না করে ললিতাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল সে, 'কষ্ট হচ্ছে না? বসে নেবেন একটু?' ললিতার চোখে-মুখে কিন্তু ক্লান্তির চিহ্ন নেই, দেবজ্যোতির দিকে আড়চোখে চেয়ে বলেছিল, 'আপনার জন্য নিশ্চয় বসতে পারি।' কথাটায় একটু লজ্জা পেয়েছিল দেবজ্যোতি, তবু একটা বড় পাথরের ওপর গিয়ে বসেছিল সে। ওর পাশে প্রায় ঘেঁষাঘেঁষি করেই বসেছিল ললিতা। দেবজ্যোতি সেই মুহূর্তে অবাক হয়ে ভাবছিল, ললিতার মত ধনী-কন্যার পক্ষে এমন সহনশীলতা কি করে অর্জন করা সম্ভব, মনের এতখানি জোরই বা সে পায় কোথা থেকে?

পাইন বনের পাতার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছিল দূরের পাহাড়ের চুড়োগুলো। তাদের মাথায় তখন সূর্যের আলো পরিয়েছে সোনার মুকুট। হাওয়ায় ভাসছিল পাতার মর্মর ধ্বনি, গাছের আড়ালে আড়ালে শোনো যাচ্ছিল

দু'একটা পাখির এলোমেলো কলরব, তবু যেন কেমন একটা নৈঃশব্দ চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে চারদিক থেকে। ললিতা যেন সেই চুঁইয়ে-পড়া নৈঃশব্দ উপভোগ করল একটু, কান পেতে শুনল নির্জনতার গান। তারপর এক সময় আস্তে আস্তে বল্ল, 'কেমন অদ্ভুত লাগছে, তাই না? মনে হচ্ছে, একটা ভিন্ন জগতে এসে পড়েছি।'

দেবজ্যোতি চারপাশটায় চোখ বুলিয়ে নিল আর একবার। গাছ আর গাছ, পাহাড়ের গায়ে গায়ে ঝোপ-ঝাড় তাতে বুনো ফুলের সমারোহ। দেবজ্যোতি দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল ললিতার মুখের ওপর। বল্ল, 'আমার কি মনে হচ্ছে জানেন?'

—কি? —ললিতার চোখে কৌতূহল।

—মনে হচ্ছে, আমার চেতনার কোথায় যেন এমনি একটা পরিবেশের ছবি এতদিন লুকিয়েছিল, আজ সুযোগ বুঝে হঠাৎ সে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই ভেতরটা বাইরের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হতে চাইছে, অথচ পারছে না, কোথায় যেন একটা বাধা।"

ললিতা ওর চোখের দিকে চেয়ে রইল একটুকাল, স্থির নিষ্কাম দৃষ্টি। সে-দৃষ্টির সামনে একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল দেবজ্যোতি, বল্ল, 'বোধ হয় একটু কাব্য করে ফেল্লাম।' ললিতা এবার হাসল, বল্ল, 'ঠিক কথাটি ঠিক ভাবে, প্রকাশ করতে গিয়ে যদি কাব্য হয়ে পড়ে, তবে কাব্যই করতে হবে। এতে লজ্জার তো কিছু নেই।' ললিতা আবার একটু হাসল,—কী মিষ্টি সে হাসি! প্রাণের সমস্ত সুধা যেন ঝরে পড়েছে সেখানে। দেবজ্যোতি চেয়ে রইল ওর সেই হাসি-মাখা মুখের দিকে। ললিতা আস্তে এমন আস্তে যাতে বনের এই গাছ-গাছালিও যেন ওর কথা শুনতে পায়, প্রায় ফিস ফিস করে বল্ল, 'কি দেখছেন?'

—আপনাকেই। —স্পষ্ট করেই উত্তর দিলে দেবজ্যোতি।

—রক্ত-মাংসে গড়া শরীরটাকে দেখে কতটুকু পারেন? —ললিতার চোখে হাসির ঝিলিক।

—দেখার পরেও যতটুকু অ-দেখা রয়ে গেল তাকে দেখার চেষ্টা করব।

—তাতে লাভ?

—সীমা দিয়ে চিনতে শিখব অসীমকে।

—আশ্চর্য! —কেমন একটা ভাবে টলটলে ওর কণ্ঠ।

—কি?

—এতক্ষণ তো এই ভাবটাই আমার মনের মধ্যে ঘুরছিল, অথচ দেখুন

ভাষা পাচ্ছিল না সে, আপনি যেন তাকে মুক্তি দিলেন। —গভীর হয়ে এল ওর কণ্ঠস্বর।

একটুকাল। চুপ করে রইল ওরা দু'জনেই! নীরব প্রকৃতি যেন ওদের ভাবের রাজ্যে দোলা দিল। ভাবের ঘোরে বিভোর হল ওরা, একই খাতে বইতে শুরু করল ওদের মনের গোপন ধারা। সেই মুহূর্তে প্রকৃতির সেই আধো ঘুমের রাজ্যে ওদের পরস্পরের দূরত্বের ওড়নাটা গেল উড়ে। লোকালয়ে মানুষের ভিড়ে যা' ছিল অকল্পনীয় তাই হল সেখানে স্বাভাবিক। —পরস্পর পরস্পরের কাছাকাছি এল, একজন শুনতে পেল আর একজনের মনের গভীর সুর।

কিছুকাল চুপ করে থেকে এক সময় বলেছিল দেবজ্যোতি, 'হঠাৎ কেন এমন মনে হচ্ছে বুঝতে পারছি না।' —কেমন যেন থমথম করছিল ওর গলার স্বর। ললিতা সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিয়ে চেয়েছিল ওর দিকে। দেবজ্যোতি ওর মুখের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেছিল, 'মনে হচ্ছে, একটা বোবা কান্না যেন আমার বুকটা চেপে ধরছে। এই মুহূর্তে মানুষের নিঃসঙ্গতা যেন বড় প্রকট হয়ে ধরা দিচ্ছে আমার কাছে। মনে হচ্ছে—।' মাঝপথে থেমে গিয়েছিল দেবজ্যোতি।

—কি ? — প্রশ্ন করেছিল ললিতা।

—মনে হচ্ছে, দিনের পর দিন মানুষ খুঁজে বেড়ায় তার সঙ্গীটিকে, খুঁজতে খুঁজতে কখনও বা তার দেখা মেলে, কিন্তু সে তাকে ধরে রাখতে পারে না নিজের কাছে, হারিয়ে ফেলে। আর তারপর একটা বোবা কান্না তার বুকটা চেপে ধরে। —একটু চুপ করে বলেছিল, '—আমিও যেন এমনি কাউকে হারিয়ে ফেলেছি, হারিয়ে ফেলছি।'

কথা বলতে বলতে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল দেবজ্যোতি। ওর মুখের দিকে একটুকাল চেয়েছিল ললিতা, চেয়ে থাকতে ওর ঠোঁটের কোণে দেখা দিয়েছিল একফালি হাসি, সে-হাসির আভা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছিল ওর সারা মুখে, চোখের কোণে। দেবজ্যোতির কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলেছিল, 'আমি কিন্তু আশাবাদী।'

—মানে ? —প্রায় চমকে উঠেছিল দেবজ্যোতি।

—আসলে আপনার ঐ বোবা কান্নাটাই আপনাকে প্রতারণা করছে। — একটু থেমে আবার বলেছিল, 'আপনি যাকে খুঁজে পেলেন তাকে যে হারাবেনই, সে-কথাটাই বা ভাবছেন কি করে ? কে বলতে পারে, হয়তো আপনার খুঁজে-পাওয়া সঙ্গীটি আপন গরজেই থেকে যাবে আপনার কাছে।

—মিস চৌধুরী!—আশা-নিরাশার দোদুল দোলায় হঠাৎ যেন কেমন দিশেহারা হয়ে উঠেছিল দেবজ্যোতি।

—নিন, উঠুন, আর নয়। —হেসে কথাটা বলেই উঠে দাঁড়িয়েছিল ললিতা। কি একটা যেন বলতে গিয়েছিল দেবজ্যোতি, তাকে বাধা দিয়ে বলেছিল, 'না, আর একটা কথাও নয়।'

দু'জনে হাঁটতে শুরু করেছিল আবার। দেবজ্যোতির মনে কিন্তু তখনও কি-একটা স্বপ্নের ঘোর। ললিতা আস্তে আস্তে বলেছিল, 'ডবসন কাকার গল্পটা কিন্তু শেষ করলেন না।' একটু যেন অপ্রস্তুত হয়েছিল সে, তারপর ধীরে ধীরে বলতে শুরু করেছিল একেবারে সেই প্রথম পর্ব থেকে।

চার

সেটা উনিশশো কুড়ি সাল, প্রচণ্ড জ্বর থেকে ইউরোপ তখন সবে মুক্তি পেয়েছে, সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেনি তখনও। অবসন্ন তার শরীর, ম্লান মুখ, হতাশায় ভরা চোখ। ইউরোপের পাশে আমেরিকার ডাক্তার-বদ্যির তখন চলছে ঘনঘন আনাগোনা। প্যারিস-বার্লিন-রোমের বুকে যেমন অস্বস্তি, লণ্ডনের বুকেও তেমনি তার প্রতিক্রিয়া। যুদ্ধের বিভীষিকা তখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে চারিদিকে। এমনি এক আবহাওয়ায় আর্থার থাকে লণ্ডনের এক শহরতলি হেণ্ডনে। এ্যালফ্রেড ডবসন তখন ভারতে নিজের ভাগ্য ফেরাতে ব্যস্ত। নিজের পথে অনেকখানি এগিয়েও গেছেন তিনি, ভাল করে গুছিয়ে নিয়েছেন তাঁর ব্যবসা-পত্তর। অল্পদিনের মধ্যে পুত্র আর্থারকে কাছে আনবেন এমন একটা পরিকল্পনাও করে রেখেছেন তিনি। এদিকে আর্থার পড়াশুনো শেষ করে চাকরিতে ঢুকেছে এক ফার্মে। আসলে তখনও চলছে তার শিক্ষানবিশী। ডেবিট-ক্রেডিট মেলানোর কাজ ভাল লাগে না তার, কিন্তু উপায় নেই, বাবার হুকুম, কোর্সটা কমপ্লিট করতেই হবে। থাকে সে শহরের এক প্রান্তে, আর এক প্রান্তে অফিস। যুদ্ধের পর আবার সব গড়ে তুলবার জন্য সরকার তৎপর। অফিসের এই দীর্ঘ পথে যাতায়াতের সময় সেই সব গড়ার কাজ দেখতে দেখতে আর্থার ভাবে, এত বড় একটা যুদ্ধ যে-মানুষেরা করতে পারে তারা কি সত্যিই সভ্য? বাড়িতে যখন সে ফিরে আসে তখনও থাকে সেই ভাবনার রেশ।

হেণ্ডনের সেই বাড়িটার সামনে, রাস্তার ওপর মস্ত একটা ওক গাছ।

ঘরে বসে জানালা দিয়ে ওক গাছটার দিকে চেয়ে নানা কথা ভাবে আর্থার। ভাবতে চেষ্টা করে গত মহাযুদ্ধের কথা, কেমন করে গোটা ইউরোপ জড়িয়ে পড়েছিল সেই যুদ্ধে, কত ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করেছে উভয় পক্ষই, কত মানুষের তাজা রক্তে লাল হয়ে গেছে মাটি। কিন্তু কেন এই যুদ্ধ? আরও ভাবে, সে, এই যে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারাল, তারা কারা, কি প্রয়োজন ছিল তাদের এই যুদ্ধের? জার্মানির যে মানুষটি কারখানায় কাজ করে, ফ্রান্সে যে তৈরী করে ফলের বাগান, লণ্ডনে সওদাগরি অফিসের যে-কেরাণী হিসেব-নিকেশ মেলাতে গলদঘর্ম হয়, তাদের মধ্যে তো কোনো বিরোধ ছিল না। তাদের সুখ-দুঃখের ইতিহাস তো একই রকমের, একই খাতে বয় তাদের অভাব-অভিযোগের সুর। অথচ এরাই একদিন যুদ্ধ করল, পরস্পর পরস্পরের বুকে গুলি বিদ্ধ করল। কিন্তু কেন এই বিভ্রান্তি, ভেবে পায় না আর্থার।

জন টেলরকে একদিন এমনি একটা প্রশ্নই করেছিল আর্থার ডবসন। হেগুনের সেই একই বাড়িতে পাশাপাশি দুটো ঘরে থাকত ওরা দু'জন। বড় হুল্লোড়ে ছেলে ঐ জন টেলর, ব্যবসা করে সে, লণ্ডনে ছোট একটা বই-এর স্টল আছে। বিরাট আশা, মস্ত একজন পাবলিশার হবে সে। ইংরেজ জাতি সম্বন্ধে তার প্রচণ্ড দুর্বলতা, এরাই আসলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি, এমনি একটা ধারণা মনে মনে পোষণা করে সে। এমনি একটা অহঙ্কারের বশেই দাদার মৃত্যু-শোকটাও সহজেই ভুলতে পেরেছিল। জনের দাদা ছিল ভাল স্পোর্টসম্যান, অফুরন্ত স্বাস্থ্যের অধিকারী, হাসি-খুশীতে ভরপুর। দাদার বড় আদুরে ভাই ছিল জন। বেলজিয়ামকে কেন্দ্র করে জার্মানির সঙ্গে বৃটিশের যখন বাধল লড়াই, সেই লড়াইয়ে যোগ দিয়েছিল সে। সেই লড়াইয়েই জার্মান সৈন্যের গুলিতে ফ্রান্সের মাটিতে প্রাণ হারিয়েছিল জনের সেই দাদা এ্যাণ্টনি। তার তাজা রক্তে ফ্রান্সের সবুজ মাটি লাল হয়ে গিয়েছিল। সে-খবর যখন শুনতে পেয়েছিল জন, তখন সে অস্থির হয়ে উঠেছিল, ক'রাত ঘুমোতে পারে নি, এক টুকরো রুটী মুখে তুলতে পারেনি ক'টা দিন। সে-শোকটাও ভুলতে পেরেছিল সে। সান্ত্বনা পেয়েছিল এই ভেবে যে, তার দাদা ইংরেজ জাতির গৌরব রাখতেই প্রাণ হারিয়েছে, জার্মান জাতির ঔদ্ধত্যের জবাব দিতে গিয়ে প্রাণ হারিয়ে সে হয়েছে শহীদ।

সেই জনকেই প্রশ্ন করেছিল আর্থার, 'আচ্ছা জন, এত বড় যুদ্ধটা যে তোমরা করলে, তা'তে কার কি লাভ হল?'

—তোমরা? 'তোমরা' মানে? —উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসেছিল জন।

—মানে—ইয়ে—আমরা।

—*That's right—not 'you', but 'we'*।—একটু নরম হয়েছিল জন। চেম্বারের পিঠে হেলান দিয়ে ধীরে ধীরে বলেছিল, 'তোমার কথাটার উত্তর দিতে হলে Mr. Asquith-এর কোটেশনটাই তুলে ধরতে হয়।'

—কি রকম?

—হাউস অফ কমনসে একদিন তিনি বলেছিলেন, 'We are fighting to vindicate the principle that small nationalities are not to be crushed·· by the arbirary will of a strong and overmastering power'। তাহলেই বুঝতে পারছো, আমরা যুদ্ধ করেছি ক্ষুদ্র জাতিগুলোর স্বার্থ রাখবার জন্য একটা মদমত্ত শক্তিতে দমন করতে। And the power has been crushed—এটাই আমাদের গর্ব।

—অর্থাৎ যে-শক্তিটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল তার রাইভালরি আমরা সহ্য করিনি, তাকে দমন করে আমরা আমাদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রেখেছি।

—ননসেন্স! এটা অপব্যাখ্যা!

—ভাল কথা, মেনে নিলাম, আমরা ক্ষুদ্র জাতির স্বার্থ রাখতেই যুদ্ধ করেছি। তাহলেও কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়। জার্মান জাতি যখন চিৎকার করে বলেছিল, পৃথিবীর কলোনীগুলোর ভাগ-বাঁটোয়ারায় তারও অধিকার আছে, জাতিগত দিক দিয়ে সে-ও ছোট নয়, শক্তিতেও সে কোনো অংশে কম নয়, তখন কি তার কথায় আমরা কান দিয়েছিলাম? আর তাই জার্মান চ্যান্সেলর একদিন তাঁর জাতির উদ্দেশ্যে বল্লেন, 'we are fighting for the fruit of our peaceful labour'।

—ফ্রুট অব্ পিসফুল লেবার! কথাটা সিম্পলি ধোঁকা বাজি।

—আসলে 'জাতীয়তা' ব্যাপারটাই ধোঁকা বাজি।

—তার মানে?

—তার মানে, ঐ কথাটা দিয়ে সবাইকেই নেশায় বুঁদ করে রাখা যায়। আর আমরা যখন নেশায় বুঁদ হয়ে যাই তখন আমাদের দিয়ে যা' খুশী তা-ই করিয়ে নেয় কতগুলো ক্ষমতালোভীর দল। তাই চ্যানেলের ওপারে বসে গোঁফ চুমড়ে কাইজার যখন বলেন, আমার আরও ক্ষমতা চাই, তখন লাফিয়ে ওঠে ও-দেশের লোক। এ-পারের এঁরা তাই শুনে চিৎকার করে বলেন, না, এ-হোতে পারে না, এ-মদমত্ততা, আমরা তখন সোর্ড খুলে দাঁড়িয়ে যাই। লেগে যায় লড়াই। আর সে-লড়াইয়ে বলি হয় কারা? তোমার

আমার মত লোকের ভাইয়েরা। বাট হোয়াই, হোয়াই উই আর গেটিং স্লটার্ড ? ক্ষমতার চূড়োয় বসে সুখ ভোগ করবে এক দল, আর রক্ত-ক্ষয়ী সংগ্রামে বলি হবে আর একদল, কেন এমন হবে ?

—My Lord, you are getting crazy !—একেবারে লাফিয়ে উঠে পড়েছিল জন, তারপর সোজা বেরিয়ে গিয়েছিল বাইরে। একটা কথাও বলেনি আর।

ওক গাছটার দিকে চেয়ে সেদিনও চুপ চাপ বসেছিল আর্থার। ভাবছিল নানা কথা। এলোমেলো সব ভাবনা। পিতা থাকেন ভারতে, কিছুদিনের মধ্যে তাকেও হয়তো যেতে হবে সেখানে, তাই অনিবার্য ভাবেই তার ভাবনার পথে এসে পড়ছিল ভারতের কথা। —তার ভৌগোলিক অবস্থান, ঐতিহাসিক পটভূমিকা, রাজনৈতিক পরিবেশ। একে একে মনে পড়ছিল সব। মনে পড়ছিল দাদুর কাছে শোনা সব গল্প—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, রবার্ট ক্লাইভের গল্প, ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর কথা। ভাবতে ভাবতে নিজেকে এক সময় বড় ছোট মনে হয়েছিল ওর। শাসনের নামে ভারতের বুকে যে লুঠ চলেছে, সে-লুঠের মালের অংশীদার তো সে-ও। দীর্ঘদিন ধরে একটা জাতি আর একটা জাতির ওপর যে-অন্যায় করে চলেছে, তার ফল তো তাকেও ভোগ করতে হবে একদিন। অথচ—একটা করুণ হাসি মুখে নিয়ে ভাবে সে—অথচ ক্ষুদ্র জাতিগুলোর স্বার্থ রাখতেই নাকি বৃটিশ সরকারকে লড়তে হয়েছে এই মহাযুদ্ধটা ! কী প্রহসন !

ওর চিন্তায় বাধা পড়ে। একেবারে উল্কার মত এসে পড়ে জন টেলর। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে আর্থারের সামনে, বলে, 'একটা মজার কাণ্ড শুনেছো ?'

জনের কথায় ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিল আর্থার। পাইপে টোবাকো ঠুকতে ঠুকতে বলেছিল সে, 'পাগলামী আর কাকে বলে ! এক নেকেড ইণ্ডিয়ান বাগার বলেছে, সে নাকি খালি হাতেই বৃটিশ সরকারের সঙ্গে লড়বে !' কথাটা শেষ করেই হোহো করে হাসতে থাকে জন, হাসতে হাসতেই বলে, 'রিয়্যালী এ নাইস জোক।' পাইপ টেনে এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে বলেছিল জন, 'তুমি তো ও-দেশে যাবে। ওখানে গিয়ে ঐ কালো লোকগুলোকে বলো, হ্যাভলক-আউট্রাম-এর মত জেনারেল বৃটিশ সরকারে এখনও আছে। তারা মরে যায়নি।' তারপর কতকটা আপন মনেই বলেছিল, 'নন-কোঅপরেসন ! অল রাস্কেলস !'

ঐ ঘটনার প্রায় ছয় বছর পর গঙ্গার পারে দাঁড়িয়ে এইসব কথাগুলোই ভাবছিল আর্থার। তখন প্রথম কলকাতায় এসেছে সে, কিন্তু কিছুই ভাল লাগেনা তার। চুরি করার একটা অপরাধ-বোধ যেমন তাকে পীড়া দেয়, তেমনি আবার এ-দেশের লোককেও আপন করে নিতে পারে না সে। নিজেকে কেমন নিঃসঙ্গ মনে হয়। একা একা ঘুরে বেড়ায় গঙ্গার ধারে, গড়ের মাঠে, ভিক্টোরিয়ার পাশে। ঘুরতে ঘুরতে নানা কথা ভাবে, ভাবে, এই গঙ্গা-পথে একদিন এসেছিল রবার্ট ক্লাইভ, ভাবে লর্ড কার্জনের কথা, ভাবে, ভারতীয় আন্দোলনের কথা। সেই সঙ্গে মনে পড়ে ঠাকুর্দার উক্তি। ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন তিনি, ইতিহাসের শিক্ষাকে তাই অমান্য করতে পারতেন না। নাতিকে পাশে বসিয়ে একদিন বলেছিলেন ঠাকুর্দা, 'দেখো, আর্থার এশিয়ার ওপর আফ্রিকার ওপর যে-অন্যায় আজ আমরা করছি ইতিহাস তার ক্ষমা করবে না। ইতিহাসের চাকা ঘুরবেই। আজ হোক কাল হোক এর ফল আমাদের ভুগতেই হবে।'

ইতিহাসের কথা ভাবতে ভাবতে আর্থারের মন থেকে হিসেবের ডেবিট-ক্রেডিট যেতো হারিয়ে, জীবনের ব্যালান্সশীট মেলাতে গিয়ে সমস্ত যেত তাল-গোল পাকিয়ে। ডবসন এ্যাণ্ড কোম্পানির লাভ-লোকসানের কথা ভাবতে পারত না সে। মানুষের স্বার্থপরতা, অর্থলোলুপতা তাকে পীড়া দিত। গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে সেই দীর্ঘকায় মানুষটি কেমন অসহায়ের মত চেয়ে থাকত গঙ্গার স্রোতের দিকে।

ছেলের ভাবগতিক দেখে একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন এ্যালফ্রেড ডবসন। একদিন নিজের চেম্বারে ডেকে পাঠালেন পুত্রকে। পুত্রের কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে বল্লেন, 'হোয়াট্‌স আপ, মাই বয়? সব সময় এমন বিমর্ষ হয়ে থাক কেন? কি ভাব রাত দিন?' উত্তর করে না আর্থার, মাটির দিকে তাকিয়ে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে সে।

এ্যালফ্রেড ডবসন গিয়ে বসেন তাঁর নির্দিষ্ট আসনে, ইঙ্গিতে পুত্রকে বসান সামনের চেয়ারটিতে। পিতা-পুত্র মুখোমুখী।—দুই ভিন্ন ধর্মী জীবন দর্শন যেন এক অপরের সামনে। চর্বিবহুল বিশাল দেহ, একজোড়া বিরাট গোঁফ, চোখে লোভ-সমৃদ্ধির বাসনা। পুত্রের দিকে কিছুকাল চেয়ে থাকেন এ্যালফ্রেড। একটু যেন শঙ্কিত হন তিনি পুত্রের সেই স্বপ্নালু চোখের দিকে তাকিয়ে। তারপর গাঢ় স্বরে বলতে শুরু করেন তিনি, 'ইউ সি, মাই বয়, এটা হল সোনার দেশ। যত পার এ-দেশ থেকে লুঠে নাও, তৈরী কর অর্থের পাহাড়, নিজের ভাগ্যকে উজ্জ্বল

করে তোল। ভয় নেই, এখানকার লোকগুলো ভারি ভীতু, কেউ তোমায় বাধা দেবে না।'

কি একটা বলতে যাচ্ছিল আর্থার, বাধা পেল সে। এ্যালফ্রেড হেসে বল্লেন, 'ও, ইয়েস, দেয়ার আর সাম পিপ্‌ল—কিছু গোঁয়ার লোক আছে বটে, কিন্তু তাদের বাধা দেবে আমাদের সরকার।' কথাটায় কে যেন পিঠে চাবুক মারল আর্থারের,—এর-নাম শাসন! এক মুহূর্তে সব যেন কেমন গুলিয়ে গেল ওর, অস্বস্তিতে নড়ে চড়ে উঠল একটু, কি বলতে গিয়ে কি বলে ফেলল। বল্ল, 'কিন্তু এখানকার ক্লাইমেট ভারি বিশ্রী।' হোহো করে হেসে উঠলেন এ্যালফ্রেড ডবসন। হাসির দমকে তার বিরাট দেহ দুলে-দুলে উঠল। লাল রঙের বিশাল মুখটা বিকট হোল। হাসি থামিয়ে তিনি বল্লেন, 'আই সি, এই জন্যে ক্লাইমেটের জন্য তুমি এমন বিমর্ষ হয়ে থাকছো। আরে, টাকার কাছে ওসব তো তুচ্ছ। ডু ইউ নো, মাই বয়, ক্লাইভ যখন এই কলকাতায় এসেছিলেন তখন এর অবস্থা কেমন ছিল? সিম্পলি হরিব্‌ল—বন আর জঙ্গল, মশা আর সাপের ডিপো। কিন্তু তিনি ভয় পাননি, নিজেকে এ্যাডজাষ্ট করে নিয়েছিলেন। আর তার ফলেই তাঁর জীবনে এসেছিল সাকসেস।' একটু থেমে আবার বলেছিলেন, 'লাইফটা আসলে কি জান, এ সিরিজ অফ এ্যাডজাষ্টমেণ্টস্। লক্ষ্য স্থির রেখে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে এগিয়ে যেতে হবে, তবেই আসবে সাকসেস্। এ্যাণ্ড দ্যাটস লাইফ।'

এবার উঠে এসেছিলেন এ্যালফ্রেড ডবসন। পুত্রের কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন, 'তোমার সাহস সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কি জান, ইউ আর মাই ওনলি চাইল্ড, ফলে আমার মনটা বড় দুর্বল হয়ে থাকে, কেবলই একটা হারাই-হারাই ভাব। তার জন্য কিছু মনে কর না। হ্যাঁ, তুমি এবার জলপাইগুড়ি যাও, সেখানকার চায়ের বাগানটা একটু দেখাশুনো করো, ধীরে ধীরে সব বুঝে নাও। তাছাড়া, আরও দুটো বিজনেসের প্ল্যান মাথায় ঘুরছে। সে-সব নিয়েও তোমার সঙ্গে আলোচনা করব। ইউ জাষ্ট ওয়েট, আই উইল বিল্ড এ্যান এমপায়ার।' হঠাৎ চোখ দুটো তাঁর চকচক করে উঠল, গাঢ় হয়ে এল গলার স্বর, বল্লেন। 'কিন্তু তুমিই আমার আশা-ভরসা, তুমি যেন আমায় দুর্বল করে দিও না।' ঠিক সেই মুহূর্তেই নিজেকে যেন বড় নিঃস্ব মনে হয়েছিল আর্থারের। মনে হয়েছিল, এই বিরাট বিশ্বে সে যেন একা, বড় অসহায়। হঠাৎ কান্নায় বুজে আসতে চেয়েছিল ওর গলা।

এরপরই তিস্তা। গঙ্গার ধার ছেড়ে তিস্তার পারে এসে উঠেছিল আর্থার

ডবসন। সমতলের ভিজে মাটি আর জোলো হাওয়া থেকে পাহাড়ের কোলে এসে ভাল লাগল ওর। চা-বাগানের চৌহদ্দিতে পা দিয়েই একটা প্রশান্তিতে ভরে গিয়েছিল ওর বুক।

জলপাইগুড়ি শহর থেকে অনেকখানি উত্তরে ডবসন সাহেবের চা-বাগান। উচুনীচু পাহাড়ী জমির বিশাল জায়গা জুড়ে সেই বাগান। চারিদিক সবুজ সবুজ আর সবুজ, যেন লাল মাটির বুকে সবুজের তরঙ্গ-মালা। বাগানের চারিদিক শাল-শিমূল, পাইন-গাছের বন। দূরে মেঘের আড়ালে পাহাড়, কুহেলীঘেরা বনানীর আবছা রেখা। বাগানের পুব দিক দিয়ে বয়ে চলেছে তিস্তা, তীরে তীরে তার অসংখ্য নুড়ি পাথর, মাঝে মাঝে জেগে উঠেছে ছোট ছোট চর। শীত-গ্রীষ্মে তিস্তার শান্ত তনুরেখা পথিককে মোহাবিষ্ট করে, বর্ষায় তেমনি দুকূল প্লাবিনী হয়ে ভয়ঙ্করীর রূপ নেয়। নদীর কুলুকুলু ধ্বনি আর পাখীর কাকলিতে মুখর হয়ে ওঠে সেই পরিবেশ। আর্থার হঠাৎ যেন এক নতুন জগতে প্রবেশ করল। তিস্তা নদীর নিরবচ্ছিন্ন গতি, লাল মাটির বুকে সবুজের আমেজ, চায়ের নেশা-ধরানো গন্ধ, পাখী-ডাকা ভোর, নীড়ে-ফেরা-পাখীর ডানা-ঝাপটায় থমকে-দাঁড়ানো সন্ধ্যা—এই সব কিছু আর্থারের মনে যেন এক আবেশ সঞ্চার করেছিল। মুগ্ধ হয়েছিল আর্থার। টেমসকে ভাললেগেছিল আবার ভাললাগল তিস্তাকে, নিজেকে নতুন করে। আবিষ্কার করল সে। এই প্রথম উপলব্ধি করল, সে কবি,—দেশে দেশে আছে তার ভালবাসার ঠাঁই।

শিউলীকেও ঠিক এই কথাটাই বলেছিল আর্থার। তখনও তার বাংলা শেখা শুরু হয়নি, ভাঙা বাংলা, বিকৃত উচ্চারণ। তবু বাংলা বলার প্রচণ্ড প্রয়াস। শিউলী আর আর্থার বেড়াতে বেরিয়েছিল তিস্তার ধারে। আর্থারের হাতে ছিল এক রাশ কাশফুল, শিউলীর খোঁপায় লাল ঘাস ফুল এক গুচ্ছ। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় বলেছিল সাহেব, 'জানো, শিউলী, এ্যাট ফার্ষ্ট যখন হামি তিস্তা আসল, তখন হামার মনে হোল, সমস্ত নেচার হামাকে ডাকছে। মনে হোল, নেচারের সে-কল-এ হামি রেসপণ্ড করতে পারে। মনে হোল, হামি ক-বি।' সাহেবের উচ্চারণে হাসি চাপতে পারেনি শিউলী, মুখে আঁচল চেপে হেসে ফেলেছিল সে।

—হাসছো যে?—সাহেবের চোখে যেন অসন্তোষের ছায়া।

—হাসবো না? কি-সব বাংলা উচ্চারণ, বাব্বা।

—ওয়েল। তুমি হামাকে বাংলা শিখাও।—কাঁধে একটা দোলা দিয়ে বলেছিল আর্থার।

শিউলী আর কোন কথা বলেনি, ওর চোখে ফুটে উঠেছিল একটা কৌতুকের আলো।

সেদিন সন্ধ্যার চায়ের টেবিলে কথাটা তুলেছিল শিউলী। অন্যদিনের মত আর্থারও ছিল সেখানে! কথায় কথায় গৌরীনাথকে শিউলী বলেছিল, 'জান বাবা, তোমার আদরের ডবসন সাহেবের বাংলা উচ্চারণ শুনে মাঝে মাঝে কিছুতেই হাসি চাপতে পারি না! আজ হেসেছি বলে রেগে-মেগে টং। রেগে বলে কিনা, বেশ তুমি আমাকে বাংলা শেখাও।' ওর কথা শুনে গৌরীনাথও হেসে ফেল্লেন। বল্লেন, 'বেশ তো ওর বাংলা শেখার যখন এত ইচ্ছে, বাংলাটা ভাল করে শিখিয়ে দাওনা। পরে শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ পড়তে পারলে বেশ আনন্দও পাবে।'

এর পরই শুরু। সাহেবের জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছিল সেদিন থেকেই। শিউলী হাতে ধরে বাংলা শিখিয়ে দিয়েছিল সাহেবকে। আর ডবসন সাহেব পেয়েছিল জীবনের এক নতুন স্বাদ।

গল্প শুনতে শুনতে ললিতার যেন কেমন নেশা ধরেছিল। শিউলী-আর্থার-ডরোথীর জীবন-স্রোত যেন তাকেও ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল অনেক দূরে, অতীতের পাতায় পাতায়। প্রতি মুহূর্তে কিসের এক আকর্ষণ অনুভব করছিল সে। সদ্য-শোনা সেই বিদেশী মানুষটি সম্বন্ধে কেমন কৌতূহল, একটা মমত্ব বোধ ওকে ঘিরে ধরেছিল। শরতের নীল আকাশে ভেসে-যাওয়া টুকরো টুকরো সাদা মেঘের সঙ্গে মানুষের যে চিরন্তন আত্মীয়তা, সাহেবের সঙ্গে তেমন এক আত্মীয়তা অনুভব করেছিল ললিতা। অপরিচয়ের মধ্যেও পরিচিতির একটা সুর ভেসে চলেছিল ওর মনে।

টাইগার হিল থেকে ফিরবার পথে গাড়িতে বসে এই রকম একটা কথাই বলেছিল ললিতা। দেবজ্যোতির চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল সে, 'কি একটা অদ্ভুত অনুভূতি বলুন তো! যে-মানুষটিকে আমি কখনও দেখিনি, যাঁর কথা এর আগে কখনও শুনিনি, তাঁকে যেন কেমন চেনামানুষ, খুব কাছের মানুষ বলে মনে হচ্ছে।' একটু চুপ করে নিজেই আবার বলেছিল, 'কেন এমন হয় কে জানে!' বলেই এক অদ্ভুত ভঙ্গি করে ঠোঁট উল্টেছিল, তারপর উদাস দৃষ্টি মেলে বাইরের দিকে চেয়েছিল অনেকক্ষণ।

টাইগার হিল যাবার কথা ছিল ওদের চার জনেরই। রঞ্জন, মিতা, ললিতা

আর দেবজ্যোতি। এমনি কথার ভিত্তিতেই গাড়িখানাকে ঠিক করা হয়েছিল। কথা অনুসারে গাড়িখানাও এসে উপস্থিত হয়েছিল সেই ভোর-রাতে। কিন্তু সেই শীতের ভোরে বিছানা ছেড়ে কিছুতেই উঠল না রঞ্জন, গায়ে চাপা টেনে কুঁকড়ে বিছানা আঁকড়ে পড়ে রইল সে। ললিতার ঠেলাঠেলিতে কম্বলের তলা থেকেই রঞ্জন বল্ল, 'তোরাই যা, আমাকে নিয়ে আর টানা হেঁচড়া করিসনে। আমাকে নিয়ে গেলে তোদের কপালেও সানরাইজ দেখা হবেনা। জানিস তো, এ-ব্যাপারে আমার লাক ভারি খারাপ।'

ললিতা তখন শাড়ি পাল্টে, গায়ে গরম জামা-কাপড় চাপিয়ে মাথায় একটু চিড়ুনি বুলিয়ে নিতে ব্যস্ত। রঞ্জনের কথায় হেসে ফেল্ল সে। বল্ল, 'তা' সূর্য মশাই তো তোমার জন্য কম্বল মুড়ি দিয়ে অপেক্ষা করতে পারে না। সময় মত তাকে উঠতেই হয়।'

—এ্যাণ্ড দেয়ার লাইজ দি ডিফিকাল্টি, সূর্যের সঙ্গে আমার তাই একেবারে বনিবনা হল না। —এবার সেই মোলায়েম কম্বলটা সরিয়ে একটা চোখ বার করেছিল রঞ্জন। আস্তে বলেছিল, 'তাই বলে তুই আমার কাঁচা ঘুমটা নষ্ট করে দিবি? যা না, ভাই, দেবজ্যোতিবাবুর সঙ্গেই যা।'

ফ্লাস্কে চা ঢালতে ঢালতে বলেছিল ললিতা, 'তা না হয় গেলাম, কিন্তু তাই বলে এখনও কাঁচা ঘুম!' রঞ্জনের আর কোনো সাড়া নেই, কম্বলের নীচে আবার পুরোপুরি অদৃশ্য হয়েছিল সে। ললিতাও এবার ফিরেছিল মিতার দিকে, মিতা এতক্ষণ ওর দিকে চেয়েই শুয়েছিল চুপচাপ। ললিতা হেসে বলেছিল, 'বৌদি, তুমিও না?'

—আমি? মিতা যেন কেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে, আস্তে বলে, রঞ্জন না গেলে—আমি—।

—বুঝলাম। তা' পতিদেবতা যদি পারমিশন দেন?

—তাহলেই বা যাই কি করে? আমারও তো একটা কর্তব্য-বোধ থাকা উচিত, না-কি বল?

—বটেই তো!—মাথায় রুমালটা বেঁধে, কাঁধে ফ্লাস্ক আর ক্যামেরাটা ঝুলিয়ে বল্ল, 'তোমরাই দেখালে। বিলেত গিয়ে তোমরা করবে কি?'

কম্বলের মোলায়েম গহ্বর থেকে আবার একটা চোখ বার করে রঞ্জন বলে, 'তার জন্য ভাবিস না। বিলেতের সাহেবদের হাওয়া গায়ে লাগলেই সব অন্যরকম হয়ে যাবে।'

হাসতে হাসতে বেরিয়ে গিয়েছিল ললিতা। দেবজ্যোতি ততক্ষণ গাড়িতে

বসেই অপেক্ষা করছিল। হাসতে হাসতেই ওকে বলেছিল সে, 'নাঃ, ওরা কেউ এল না। এই ঠাণ্ডায় দাদা-বৌদিকে বিছানা থেকে তোলা শিবেরও অসাধ্য!' দেবজ্যোতিও হেসেছিল।

সেই কনকনে ঠাণ্ডায় ল্যাণ্ড-রোভার গাড়িখানা এগিয়ে চলেছিল ওদের নিয়ে। ওদের গাড়ির সামনে-পেছনে ছিল আরও কয়েকখানা কার, সকলেরই গন্তব্যস্থল এক। আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে তাদের গাড়িটা ক্রমশ চলেছিল ওপর দিকে, কোথাও পথের এক পাশে খাড়াই পাহাড়, আর এক পাশে খাদ, কোথাও পথের দু'পাশেই বড় বড় গাছের জঙ্গল। কোথাও পাহাড়ের গা বেয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে জল, তার চারপাশে ঘন সবুজ শ্যাওলায় কার্পেটের আমেজ; কোথাও পাহাড়ের পাথুরে গায়ে গাছ-গাছালির লেশ নেই। আর এদিকে নীল আকাশে তখন তারার মেলা। সেই তারা-ভরা নীল আকাশের নীচে পথের দুই পাশ দেখতে দেখতে চলেছিল দেবজ্যোতি। গায়ে তার শীতের জোব্বাজুব্বি, মাফলারে কান মাথা ঢাকা। হাতে একটা জলন্ত সিগারেট নিয়ে চুপ করে বসেছিল সে। আবছা-আলোর ওড়না ঢাকা প্রকৃতি কেমন যেন উদাস করে দিয়েছিল তাকে। ললিতার দৃষ্টিও তখন বাইরের দিকেই, বাইরের সৌন্দর্যে ডুব দিয়েছিল সেও। অনেকক্ষণ কারও মুখে কোনো কথা ছিল না। একটা ভাবের জোয়ার যেন বয়ে চলেছিল উভয়ের মনে, হৃদয়ের কূলে আছড়ে পড়ছিল উচ্ছ্বাসের তরঙ্গ। দেবজ্যোতি এক সময় বলেছিল, 'বাইরের যেন কি অদ্ভুত এক আকর্ষণ আছে, ঘর থেকে বাইরে একবার বেরিয়ে এলে ঘরে ফেরার আর মন থাকে না।' দেবজ্যোতির কথায় দুষ্টু চোখে মিষ্টি মিষ্টি হেসেছিল ললিতা, কোনো কথা না বলে গুন গুন করে গেয়ে উঠেছিল গানের দুটো কলি।

'যাবনা, যাবনা, যাবনা ঘরে
বাহির করেছে পাগল মোরে'···

দেবজ্যোতি হেসে বলেছিল, 'বাইরের জগৎ একেবারে পাগল না করলেও উন্মনা করে যে তোলে, সেকথা কিন্তু অস্বীকার করা যায় না।'

—অন্য সবার কি হয় জানি না, আমি কেবল আমার নিজের কথাটাই বলতে পারি। আর সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে আপনার কথাটা অস্বীকার করতে পারি না। ধীরে ধীরে কথা কয়টা বলেছিল ললিতা।

একটু কালের মধ্যেই মুখটা কেমন গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল ললিতার। ওর মুখের দিকে চেয়েছিল দেবজ্যোতি; ললিতার চোখে-মুখে সেই হালকা হাসির ভাব আর ছিল না, অন্যভাবের একটা তরঙ্গ উঠেছিল ওর মনে। বাইরের

দিকে চেয়েই ধীরে ধীরে বলেছিল, 'বাইরের আকর্ষণটা উন্মনা করে তোলে বলেই তো ছুটে বেড়াই এখানে-সেখানে, কিন্তু মাঝে মাঝে নিজেকে বড় অপরাধী বলে মনে হয়।'

—কেন? অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিল দেবজ্যোতি।

—মনে হয়ে এ-যেন পলাতকের পথ—এস্‌কেপিজম। বেড়াতে বেড়াতে বার বার মনে হয়েছে, সমাজ-সংসারের দায়-দায়িত্ব থেকে যেন এড়িয়ে বেড়াচ্ছি, খারাপ লেগেছে, কিন্তু পথ খুঁজে পাইনি।

—এটাকে এস্‌কেপিজম বলেছেন কেন? পাঁচটা দেশ দেখে বেড়ানো, অচেনা মানুষের সাথে মেশা, প্রকৃতির মাঝে নিজেকে খোঁজা, ঐসবের মূল্য কি কম?

—কম বেশী বুঝি না। এইটুকু বুঝি, সমাজের কাছ থেকে, মানুষের কাছ থেকে যতটুকু পাচ্ছি ততটুকু প্রতিদিন আমি দিতে পারছি না। দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে একটা ফারাক থেকে যাচ্ছে, অথচ নিজেকে নিয়ে বিভোর হয়ে থাকছি সর্বক্ষণ! কথাটা যত-বারই ভেবেছি ততবারই নিজেকে ছোট মনে হয়েছে।

—কিন্তু দোষ তো আপনার নয়, আপনি প্রতিদানের পথ খুঁজেছেন কিন্তু পাননি।

—মানসিক পীড়ন তো সেখানেই, নিজের মনেই প্রশ্ন জেগেছে বারবার, তেমন করে কি পথ খুঁজতে চেষ্টা করেছি আমি? উত্তর পাইনি, কেমন যেন ধোঁয়াটে হয়ে গেছে সব।

ললিতার এমন আত্মবিশ্লেষণের মুখে দেবজ্যোতির কথা হারিয়ে যায়, চুপ করে থাকে সে। ললিতাও চুপ, বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিজেকে হয়তো আর একবার যাচাই করতে চেষ্টা করে সে। বাঁকের পর বাঁক পেরিয়ে গাড়ি উঠতে থাকে ওপরে। অতিবাহিত হয় খানিকটা সময়। ললিতা বাইরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আনে, তার মুখে আবার সেই হাসির ঝলক, সহজ ভাবের আলপনা, কতকটা নিজের মনেই বলে, 'চলেছি তো টাইগার হিল, কে জানে সান-রাইজ আজ দেখা যাবে কিনা। তারপর দেবজ্যোতির মুখের দিকে চেয়ে বলে, আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়, আজ সান-রাইজ দেখা যাবে?'

—কি করে বলি?

—কি করে আবার এমনিতেই বলুন।

—তা কি করে হয়?

—আহা, হঠাৎ এক এক সময় মনে হয় না, একটি জিনিস হবে কি হবে না? সেই ভাবেই বলবেন।

ললিতার ছেলেমানুষীতে দেবজ্যোতি হাসল, হেসে বল্ল, 'আচ্ছা ভেবে দেখি।' একটুকাল চোখ বুজে চুপ করে থেকে বল্ল, 'হ্যাঁ, দেখা যাবে।'

—নাঃ আমার সঙ্গে মিলল না। —ঠোঁট ওল্টাল ললিতা। —আমার মনে হচ্ছে, আকাশটা এমন মেঘলা থাকবে যে, সান-রাইজ আর দেখা যাবে না।

—সর্বনাশ করেছে, আপনি এখন ইনটুইশনের পথ ধরলেন নাকি?—হেসে বল্ল দেবজ্যোতি।

—ইনটুইশন, ইনটেলেক্ট বুঝিনা, যা মনে হল বল্লাম।

—কিন্তু আপনার মনে হওয়া যে আমায় ভাবিয়ে তুলছে, এতখানি পথ আসা তাহলে বৃথা হল?

তুজনে তুজনার দিকে তাকাল, চোখাচোখি হতে হেসে ফেল্ল তু'জনাই।

টাইগার হিলে পৌঁছে গেল ওরা, ততক্ষণে যাত্রীদের আরও কয়েকটা গাড়ি এসে পৌঁছে গেছে। ওরা এক কাপ করে চা খেয়ে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। দর্শকদের সুবিধের জন্য সামনে একটি রেলিং ঘেরা ছাদ। সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে গিয়ে উঠল দেবজ্যোতি আর ললিতা, আরও অনেকেই জড়ো হয়েছিল সেখানে। এদিকে হিমেল হাওয়ায় হাড় কাঁপানো শীত, তখনও অন্ধকার, চারপাশটায় ঘন কুয়াশা, আকাশে কেমন যেন একটা মেঘলা আবরণ। সামনে পেছনে যেদিকে তাকান যায় সেদিকেই যেন ঘন বনের গাছে গাছে চাপ-চাপ অন্ধকার দানা বেঁধে আছে। সামনে যেন থমকে-যাওয়া সাগরের অসংখ্য তরঙ্গমালা, সেই স্তব্ধ তরঙ্গরাশির সাথে আবার চলমান মেঘের মেশামেশি। দেবজ্যোতি, ললিতা মুগ্ধ হয়ে চেয়েছিল সেই দিকে, কিছুক্ষনের জন্য কথা হারিয়ে গিয়েছিল তাদের, একটা বিচিত্র অনুভূতিতে ভরে গিয়েছিল ওদের মন।

এবার অপেক্ষার পালা, কখন সূর্য ওঠে। এলোমেলো কথার মালা সাজাতে সাজাতে সবার সঙ্গে অপেক্ষা করতে থাকে দেবজ্যোতি আর ললিতা। একটু একটু করে লোক জমেছে বেশ, কিন্তু সবার মুখেই একটু যেন সন্দেহের ছায়া, এত কষ্ট করে আসা বুঝি বৃথা হল। আকাশে যেমন করে মেঘের পরে মেঘ জমার খেলা চলেছে, তাতে সেই সন্দেহটা ক্রমশ দানা বাঁধতে থাকে। ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে থাকে, ধীরে ধীরে চারপাশে ফুটে ওঠে আলো, কিন্তু মেঘের আড়ালেই থেকে যায় সূর্যদেব, তার দেখা মেলে না। সবার চোখেই হতাশা, যে যার নেমে যায় এক এক করে। ললিতা দেবজ্যোতির দিকে চেয়ে বলে,

'দেখলেন, আপনাকে আমি হারিয়ে দিলাম। আমার কথাই ফলে গেল,— সান-রাইজ দেখা গেল না।'

—তাইতো দেখছি।

শেষ পর্যন্ত সূর্যোদয় দেখা হলনা, অন্য সবার মত একটু ক্ষুন্ন মনে ফিরে এসেছিল ওরাও। ফিরবার পথে অনেকগুলো ফটো তুলেছিল ললিতা। প্রকৃতির সাথে দেবজ্যোতিরও ফটো তুলেছিল কয়েকখানা। পথে গাড়িতে বসে কথা হয়েছিল অনেক। কথায় কথায় 'শিউলী আশ্রমের' কথা এসে পড়েছিল, আর সেই সঙ্গে ডবসন সাহেবের কাহিনী। ডবসন সাহেবের জীবনী শুনতে শুনতে বলেছিল ললিতা, 'যতই শুনছি তাঁর কথা, ততই মনে হচ্ছে, তিনি যেন আমার বড় আপন জন।' কথা বলেই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েছিল ললিতা দেবজ্যোতিও কোনো কথা বলেনি আর।

গাড়ি থেকে নেমে হোটেলের পথে পা বাড়িয়েই বলেছিল দেবজ্যোতি, 'এবারের যাত্রায় আমার আর দার্জিলিঙের সূর্যোদয় দেখা হল না।'

—কেন?

—অফিসের ছুটি তো ফুরিয়ে গেল। কাল কিংবা পরশু এখান থেকে স্টার্ট করতেই হবে।

—কাল কিংবা পরশু! কই এর মধ্যে এক বারও তো বলেন নি?

—অতটা খেয়াল ছিলনা।

—ও। —ললিতার গলায় যেন হঠাৎ এক ভিন্ন সুরের অনুরনণ।

—আসলে তা' নয়, কথাটা বলব-বলব করেও বলতে পারিনি। বলতে যেন কেমন খারাপ লাগছিল—।

ললিতা ভুরু কুঁচকে দেবজ্যোতির দিকে একটুকাল তাকিয়েই হেসে ফেলেছিল। ওর হাসিতে ফিরে এসেছিল আগেকার সেই হাল্কা সুরের আমেজ।

পরদিন সকালেই যাত্রা করেছিল দেবজ্যোতি। স্টেশনে পৌঁছে দিতে এসেছিল ললিতা। খেলাঘরের সেই ছোট্ট গাড়িটা হুইসল দিয়ে একটু একটু করে চলতে শুরু করেছিল, আর সেই মুহূর্তে ললিতা একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল দেবজ্যোতির দিকে। দেবজ্যোতি দু'হাত দিয়ে সেই হাতটা ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়েছিল, আস্তে বলেছিল, 'কলকাতার সব ক'টা ঠিকানাই রইল, ফিরেই দেখা করবেন।'

আর কোনো কথা হয়নি। ট্রেনের গতি জোর হয়েছিল, দেবজ্যোতি লাফিয়ে উঠে পড়েছিল ট্রেনে। দেবজ্যোতি দরজায় দাঁড়িয়ে চেয়েছিল ললিতার দিকে,

ললিতার মুখে তখনও হাসি। ট্রেনটা তখন সবে মাত্র প্ল্যাটফরম ছাড়িয়েছে, দেবজ্যোতির হঠাৎ যেন নিজেকে বড় একা মনে হয়েছিল, বড় নিঃসঙ্গ মনে হয়েছিল নিজেকে। সেই মুহূর্তে চোখটা কেমন যেন জ্বালা করে উঠেছিল ওর। মা-বাবা দিদিকে ঘিরে সংসারের যে-আনন্দের স্বাদ একদিন সে পেয়েছিল, তার প্রতি ছিল ওর চুম্বকের টান। সংসারের সেই আনন্দের স্বাদ পুনরায় পাবার জন্য মনে মনে সে ছুটে বেড়িয়েছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে সংসারের সুখের এক সুপ্ত বাসনা ছিল ওর মনে, কিন্তু ডবসন সাহেবের পাশে দাঁড়িয়ে তার সেই বাসনা জেগে উঠতে পারেনি। আজ এই মুহূর্তে ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে ললিতাকে দেখতে দেখতে সংসারের সেই সুখের জন্য মনটা তার হঠাৎ কেমন মোচড় দিয়ে উঠেছিল। কি এক আকুলতায় চোখ দুটো জলে ভরে উঠতে চেয়েছিল ওর।

পাঁচ

সেটা ছিল এক ধূসর গোধূলি। অন্যদিনের মত এই ঘরে বসে দেবজ্যোতি আর আমি সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে গল্পে গল্পে মশগুল হয়ে ছিলাম। দেবজ্যোতির মনে তখনও ছিল দার্জিলিঙের আবেশ, তাই স্বাভাবিক নিয়মেই গল্পের সুরও ছিল দার্জিলিংকে ঘিরেই। পশ্চিমের জানালাটা দিয়ে সামান্য একটু আলো এসে পড়ছে ঘরে, আবছা অন্ধকার ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে পুবের দরজা দিয়ে। ঠিক এমনি সময়ে আমার ঘরের সামনেই একখানা গাড়ি এসে থেমে গেল। আর তারপরই আমাদের দুজনকে একেবারে অবাক করে দিয়ে ললিতা আমার ঘরের দরজায় এসে হাজির। সেই আমার প্রথম দেখা, কিন্তু দেবজ্যোতির মুখে ওর কথা এত শুনেছি যে চিনতে কষ্ট হলনা একটুও। লম্বা ছিপছিপে গড়ন, গায়ের রঙ উজ্জল শ্যাম টানা-টানা চোখ, পরনে আকাশি রঙের সাদামাটা একখানা শাড়ি, সাধারণভাবে খোঁপা বাঁধা, বাঁ হাতে ঘড়ি চুরির কোনো বালাই নেই, কানও খালি, কেবল গলায় সরু একটা চেন, মুখে পাউডারের আলতো একটু ছোপ। বুদ্ধি-দীপ্তির স্পষ্ট ছাপ চোখে মুখে।

ওকে হঠাৎ এভাবে আসতে দেখে কেমন যেন বিব্রত বোধ করছিলাম। দেবজ্যোতির অবস্থাও তা-ই। ললিতা ঘরের ভেতর এগিয়ে এসে সহজ স্বরে বল্ল, আপনাদের আড্ডার ভাগ পাবার জন্য সোজাসুজি এখানেই চলে

এলাম।' ওর সহজ ভাবের ঢেউ এসে লাগল আমাদের মনেও। দেবজ্যোতি হেসে বল্ল, 'আসুন, এতক্ষণ আপনার কথাই হচ্ছিল।'

—আচ্ছা! —মিষ্টি করে হেসে আমার সামনের চেয়ারটায় বসল ললিতা।

মামুলি পরিচয়ের পালা শেষ করে আলাপ শুরু করেছিলাম আমরা। একটু একটু করে নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল সেদিন গল্পে-গল্পে এক সময় আমাদের মধ্যে থেকেচ দূরত্বটুকু ঘুরে গিয়েছিল, আমরা পরস্পরের অনেক কাছে এসেছিলাম। ওকে আমাদের মধ্যে পেয়ে যেমন ভাল লাগছিল তেমনি মনে মনে ভয়ও ছিল—হারাবার ভয়। বড় লোকের মেয়ে, ক'দিনের এ-খেয়াল কে জানে! হয়তো ক'দিন পরেই মিটে যাবে শখ, আবার ফিরে যাবে নিজেদের সোসাইটিতে। মনের ভাবটা গোপন রাখতে পারিনি, কথায় কথায় প্রকাশ করেই ফেলেছিলাম সে ভাবটা। গল্প শেষে তখন ওঠার পালা ললিতাকে বলেছিলাম, 'আপনাকে আমাদের মধ্যে পেয়ে আনন্দের সঙ্গে একটু ভয়ও হচ্ছে।

—ভয়?—ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিল ললিতা।

—ঠিক ভয় নয়, একটা সন্দেহ।

—কি রকম?

—কতদিন আপনাকে আমাদের মধ্যে পাব কে জানে!

—দেখাই যাক। ভবিষ্যতকেই সেটা ভাবতে দিন। —মুচকি হেসে উত্তর করেছিল ললিতা।

সেই প্রথম। তারপর একটু একটু করে আমাদের সবাইকে যাচাই করে নিয়েছিল সে—দেবজ্যোতি, ডবসন কাকা, আমাকে। আমাদের কাউকে বাদ দেয়নি ললিতা। শউলীর প্রতিটি মানুষকে পরখ করে নিয়েছিল হঠাৎ একটা কিছুকে আঁকড়ে ধরেনি সে। এতদিন মনে মনে একটা কাজের সন্ধান করে বেড়াচ্ছিল ললিতা, এমন একটা প্রতিষ্ঠানের খোঁজ করে বেড়াচ্ছিল যার আদর্শকে সে আপন বলে মনে করতে পারে। দেবজ্যোতির কাছে তেমনি একটা আদর্শরই আভাস পেয়েছিল, তাই সে ছুটে এসেছিল 'শিউলীর' দোরে, ডবসন সাহেবের কাছে। কিন্তু এক কথাতেই ঝাঁপিয়ে পড়েনি, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছিল সব।

এমনি আর একটা দিন। সেদিনও নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে সোজা-সুজি এসে হাজির হয়েছিল আমার এখানে। একাই বসেছিলাম আমি। এর মধ্যে ডবসন সাহেবের সঙ্গে অনেক আলোচনা হয়েছে ললিতার, এই ঘরেই হয়েছে অনেক বৈঠক, শিউলীর কয়েকটা জেলার অফিসে ঘুরে এসেছে সে, তবু মনটা

স্থির করতে পারছিল না। কথায় কথায় আমাকে প্রশ্ন করেছিল, 'আচ্ছা, শিউলীর সাথে আপনার পরিচয় ঘটল কি করে?

—অত্যন্ত মামুলী ভাবে। —উত্তর করেছিলাম আমি।

—যেমন?—বাঁ হাতের চেটোতে থুতনির ভার রেখে, ভুরু কুঁচকে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিল ললিতা।

—যেমন?—একটু থেমে বলেছিলাম—ছেলে-বেলা থেকেই লেখালেখির বাতিক, আর সেই সুবাদে বহু পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে, নানা পত্রিকা হাতে এসে পড়ে। এমনি ভাবে হঠাৎ একদিন 'শিউলী, পত্রিকাও হাতে এসে পড়ল। কাগজটা পড়ে ভাল লাগল, নতুন একটা আমেজ পেলাম। কৌতূহলী হয়ে একদিন সোজা চলে গেলাম পত্রিকার অফিসে। আর সেখানে গিয়েই ওদের বিরাট কর্মজগতের পরিচয় পেলাম। এর পর ওদের আর কখনও ছেড়ে-আসতে পারিনি।

—কাজ করে আনন্দ পাচ্ছেন?

—কতটুকু আর করি? কাজের মধ্যে তো 'শিউলী' পত্রিকায় মাঝে মাঝে লেখা।

—তবু? একেবারেই আনন্দ পাচ্ছেন না?

—তা, আনন্দ না পেলে যোগাযোগ রেখেছি কেন? একটা কর্মজগতের সঙ্গে যুক্ত আছি, এর উত্তেজনাও কি কম?

চেয়ারে পিঠ দিয়ে সোজা হয়ে বসল ললিতা, একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। আমি হেসে বল্লাম, 'এত হেজিটেট করছেন কেন? কাজে নেমে পড়ুন, কোমার বেঁধে এগিয়ে আসুন। কাজ ভাল না লাগে ফিরে যাবেন, ফিরে যাবার পথ তো খোলা রইলই।

—দেখি। —ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল ললিতা।

—আর দেখাদেখি নয় এবার কাজে নেমে পড়ুন। কর্মযজ্ঞে মেয়েদের আজ অত্যন্ত প্রয়োজন।

কথাটা হয়তো ওর কানে একটু বেসুরো ঠেকেছিল, তাই ভুরু কুঁচকে আমার দিকে চেয়েছিল ললিতা, আমিও কেমন একটু অপ্রস্তুত বোধ করেছিলাম। ললিতা একটুকাল চুপ করে বলেছিল, 'আপনি এ-কথা মনে প্রানে বিশ্বাস করেন, না, এ-কেবল কথার কথা?'

—হয়তো করি, নিশ্চিত ভাবে বলতে পারছি না। —দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে বল্লাম আমি।

কয়েকটা সেকেণ্ড ললিতা চুপ করে বল্ল, 'জানি, জীবনের প্রতিটি

ক্ষেত্রে মেয়েদের আজ ছড়িয়ে পড়তে হবে, নতুবা তাদের মুক্তি নেই। মুক্তির ঐ একটাই পথ—কাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া।'

ললিতা আর কোনো কথা বলেনি, আমিও চুপ করেই ছিলাম। ললিতার মনে হয়তো তখন নানা ভাবনার দোলা, তাই ওকে নাড়া না দিয়ে সেই মুহূর্তে নিজের মনের মধ্যেই ডুব দিয়েছিলাম আমি।

এমনি নানা ভাবনার বাঁক পেরিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনটা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। আর তখনই দৃষ্টি পড়েছিল ডবসন কাকার মুখের ওপর। নিমীলিত চোখে তিনি হয়তো তখন অতীতের কথাই ভাবছিলেন, কিংবা হয়তো ভাবছিলেন, 'শিউলী'র আগামী দিনের কর্মসূচীর কথা। আমার মনটা কিন্তু সেই মুহূর্তে যেন আর্তনাদ করে উঠতে চেয়েছিল। এই ঘরে বসে এমনি ঝর-ঝর বাদল দিনে আমরা চারজন গল্পে-গল্পে কত যে মুখর হয়ে উঠতাম—সেই স্মৃতিটা এই মুহূর্তে বার বার আমাকে তাড়া করে ফিরছিল। বৃষ্টিটা ততক্ষণে থেমে গিয়েছিল, পরিষ্কার হয়ে এসেছিল আকাশ, কেবল এলোমেলো বাতাসটা বয়ে চলেছিল।

ডবসন কাকা ছাতাটা হাতে নিয়ে এক সময় উঠে গিয়েছিলেন, আমি কিন্তু চেয়ারটা ছেড়ে উঠতে পারিনি, অতীত দিনের ভাবনাগুলো আমায় সেদিন নেশায় যেন বুঁদ করে রেখেছিল।

মনে পড়ছিল একটা দিনের কথা। ওরা দু'জন, দেবজ্যোতি আর ললিতা গিয়েছিল বসিরহাট শহরে। সেখানে 'শিউলীর' যে তাঁতের সেণ্টার আছে তাই দেখতে গিয়েছিল ললিতা। ফিরবার পথে ইছামতীর ধারে ঘাসের ওপর বসেছিল ওরা দু'জন। সামনে জলের কুলু-কুলু ধারা তাতে নৌকোর আনাগোনা, চারিদিকে সবুজের আলপনা। সেই পরিবেশে বসে অনেক কথার জাল বুনেছিল দু'জনে। ললিতা ছোট ছোট মাটির ঢেলাগুলো নিয়ে একটার পর একটা ছুঁড়ছিল জলে, মনটা তার কিসের এক এলোমেলো ভাবনায় ভর করে উড়ে উড়ে চলেছিল। আবেশময় চোখে চারদিকটা দেখতে দেখতে বলেছিল একসময়, 'জায়গাটা ভারি সুন্দর। বেশ লাগছে।' একটা ঘাসের শিষ দাঁত দিয়ে ছিঁড়তে ছিঁড়তে প্রশ্ন করেছিল দেবজ্যোতি, 'এর আগে এখানে কখনও এসেছিলে?'

—আর একদিন এসেছিলাম। —উত্তর করেছিল ললিতা। —'গাড়ি করে।

একটা গাড়িতে দাদা-বৌদি। আর একটা গাড়িতে আমি, বৌদির এক বোন আর দাদার বন্ধু সমীরদা। বসিরহাট ছাড়িয়ে আরও অনেকদূর গিয়েছিলাম সেদিন। ফিরবার পথে নামল জোর বৃষ্টি। ষ্টীয়ারিং-হুইল হাতে, রাস্তা ফাঁকা, কাজেই আমাকে আর পায় কে, বৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমিও ছোটালাম গাড়ি। সবাই তো ভয়ে অস্থির।' এবার দেবজ্যোতির দিকে ফিরে হেসে বল্ল, 'বৃষ্টির মধ্যে ফাঁকা রাস্তায় গাড়ি চালাতে কি মজাই যে লাগে! ঐ আমার একটা শখ, বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালানো।'

কথাটায় কি ছিল জানি না, কিন্তু কেমন একটা আচমকা ধাক্কা খেয়েছিল দেবজ্যোতি।

আমিও সেদিন ধাক্কা খেয়েছিলাম যেদিন প্রথম উপলব্ধি করলাম, দেবজ্যোতি প্রচণ্ড বেগে গড়িয়ে পড়ছে ললিতার দিকে। শশাঙ্কশেখর চৌধুরীর কন্যার প্রতি তার এই আকর্ষণ ভাল লাগেনি আমার। কিন্তু আমার সেদিনের সেই সন্দেহ মিথ্যে হয়ে গেল, ঘটনার রূপ গেল বদলে। ললিতাই হল শিউলী আশ্রমের পরম বন্ধু, আর দেবজ্যোতি গেল দূরে সরে। হয়তো এমনিই হয়, এইটেই নিয়ম, নতুবা শিমুরালী গাঁয়ের ভট্টাচার্য মশায়ের মেয়ে প্রভা, চৌধুরী বাড়ির বৌ হয়ে এমন হল কেন।

শশাঙ্কশেখর চৌধুরীর পিতা সেই গরীব ভট্টাচার্য মশায়ের মেয়েকে পুত্রবধূ করে ঘরে এসেছিলেন। মেয়েটি রূপে মুগ্ধ করেছিল চৌধুরী মশাইকে। নিজে গিয়ে কোষ্ঠী মিলিয়েছিলেন চৌধুরী মশাই, একেবারে রাজরানী হবার মত— কোষ্ঠী তবে কিনা একটু দম্ভ থাকবে বেশী।

খুশী হলেন চৌধুরীমশাই, এমন মেয়েই তাঁর চাই—একটু দম্ভ না থাকলে চৌধুরী পরিবারের পুত্রবধূ হিসেবে মানাবে কেন? তা' পাড়া-গাঁয়ের সেই মেয়ে চৌধুরী পরিবারে এসে পড়াশুনো শিখল, শিখল গান-বাজনা, সোসাইটিতে মিশে নতুন মানুষ হল। প্রভাকে কাছে বসিয়ে চৌধুরী মশাই নিজে নানা রকম শিক্ষা দিতেন। বলতেন, 'দেখো, মা, মেয়েদের যখন বিয়ে হয়, তখন তারা হয় নতুন মানুষ। বলতে গেলে, বিয়েটা তাদের পুনর্জন্ম। আসলে মেয়েদের নিজস্ব স্বত্বা বলে কিছু থাকতে নেই, পিতৃকুলে পিতার ধর্মই হবে তার ধর্ম, আর শ্বশুরকুলে স্বামীর পথই তার পথ।'

আরও বলতেন, 'এই যে তুমি আজ এই বংশের বৌ হয়ে এসেছো, এই সঙ্গে তোমার পুরনো সব কিছু মুছে গেছে, তোমার পুনর্জন্ম হয়েছে। এই

বংশের মান-মর্যাদা নির্ভর করছে তোমারই ওপর, তুমি তাকে ওপরেও তুলতে পার, আবার নীচেও নামাতে পার।' পরম শ্রদ্ধাভরে বিত্তবান শ্বশুরের কথাগুলো শুনত প্রভা।

যে-ঘরটায় শ্বশুর মশাই বসে কথা বলতেন, সেই ঘরটার চারদিকটা চেয়ে চেয়ে দেখত প্রভা। শ্বশুরের কথা শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ত সে। বিরাট হলঘর। দেয়ালে পূর্বপুরুষদের অয়েল পেইন্টিং। মেজেতে পুরু কার্পেট, দামী কাঠের ভারি চেয়ার-টেবিল, দরজা জানালায় ঝুলছে ভারি পরদা। পশ্চিমের দেওয়াল জুড়ে কাঁচের মস্ত এক আলমারি, তাতে নানা ধরনের জিনিস—কোনোটা হাতির দাঁতের তৈরী কোনোটা চন্দন কাঠের, কেষ্ট নগরের জীবন্ত মাটির পুতুল।

আলমারিটার ঠিক ওপরে দেওয়ালে টাঙানো রানী ভিক্টোরিয়ার এক বিরাট ছবি। চৌধুরী মশাই-এর কথা শুনতে শুনতে প্রভা চেয়ে থাকত সেই ছবিটার দিকে। চেয়ে থাকতে থাকতে কেমন আনমনা হয়ে পডত সে—শাসন করবার কি এক মোহ যেন আবিষ্ট করে তুলত তাকে।

চৌধুরী মশাই বলতেন, 'ত্যাখো, বৌমা, পৃথিবীতে আসলে আছে দুটো জাত—প্রভু আর ভৃত্য। একটা জাত শাসন করে, তারা প্রভু, আর একটা জাত শাসিত হয়, তারা ভৃত্য। এই দুটো জাতে কখনও মিশ খায়না, মিশ খেতে পারে না। এক দল থেকে হয়ত আর এক দলে যাওয়া যায়, কিন্তু এক সঙ্গে দু'দলেই বাস অসম্ভব।' থেমে থেমে বলতেন তিনি, 'পূর্ব-জন্মের সুকৃতির ফলে তুমি আজ ওপরের পঙ্‌ক্তিতে এসে পড়েছ, তোমাকে আজ সব নতুন করে বুঝে নিতে হবে, নতুন করে তোমার জীবন শুরু।'

শ্বশুরের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল প্রভাবতী। নিজের চলাফেরার চৌহদ্দিটা বুঝে নিয়েছিল পুরোপুরি। নিজের দল বাছাই করতে ভুল হয়নি তার, পুরনো অতীতকে ছিন্ন বস্ত্রের মতই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল সে। এমনি সময় একদিন শিমুরালী গ্রাম থেকে এলেন সেই ভট্টাচার্য মশাই, বাপের বাড়ি নিয়ে যাবেন মেয়েকে। প্রভার বিয়ে দশ বছরের ওপর হয়ে গেছে, এর মধ্যে মাত্র বার তিনেক গেছে বাপের বাড়ি। ছেলে-মেয়ে হবার পর একবারও যায়নি আর।

সেবার শিমুরালী গ্রামে কি এক উপলক্ষে খুব ধুম-ধাম করে পূজো হচ্ছে, গ্রামের সব বাড়ির মেয়েরাই শ্বশুর বাড়ি থেকে এসেছে বাপের বাড়ি। প্রভার মায়ের চোখে ঘুম নেই, কেবল তার মেয়েই এল না তার ঘরে। স্ত্রীর অনেক ঠেলাঠেলিতে তাই শেষ পর্যন্ত আসতে হয়েছিল ভট্টাচার্য্য মশাইকে। বড় লোক

আত্মীয়ের বাড়ি আসা, তায় কলকাতা শহর—সাজ-বাস তাই তার একটু ভিন্ন। হাঁটু-অবধি-তোলা নতুন কাপড়। গায়ে আঁটো সাঁটো নতুন জামা। পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, টিকি সামনে তেরী কাটা। এমন লোককে দেখে চাকরতো ঢুকতেই দিল না ভেতরে। তাই খবর পাঠিয়ে ভট্টাচার্য মশাই অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন বাইরে। শেষটায় চাকরের সঙ্গে গিয়েছিলেন অন্দর মহলে। প্রভাবতী চৌধুরী তখন একটা সোফায় চুপ-চাপ বসে! মুখটা তার থম থম করছে। আর ঠিক তার পাশেই ছয় সাত বছরের ফুট ফুটে সেই মেয়েটি—ললিতা।

ভট্টাচার্যমশাই ঘরে ঢুকতেই তার দিকে কিছুটা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল প্রভাবতী। কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করেছিলেন ভট্টাচার্যমশাই। বিমূঢ়ের মত একটু হেসে বলেছিলেন, 'এবার পুজোতে ক'টা দিনের জন্ম তোকে নিয়ে যেতে চাই, মা। গ্রামে পুজোয় এবার বড় ধূম ধাম। গ্রামের সব মেয়েরাই বাপের বাড়ি এসেচে, আর তুই যাবিনি, তা'তো হয়না মা। মাত্র পুজোর ক'টা দিন। প্রভাত আসচে, শোভা আসচে।'

কোন উত্তর দেয়নি প্রভা, ইঙ্গিতে কেবল সামনের সোফাটায় বসতে বলেছিল সে। নিঃশব্দে সোফাটায় বসেছিলেন ভট্টাচার্যমশাই। কিছুক্ষণ কারও মুখে কোন কথা নেই। প্রভাবতী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কি ভাবছে। ভট্টাচার্য মশাই মাটির দিকে চেয়ে হয়তো বা মিশে যেতে চাইছেন মাটির সঙ্গে। সেই অবসরে সেই ছোট্ট মেয়েটি গিয়ে দাঁড়িয়েছিল দাদুর পাশে, সেই বুড়ো মানুষটির মুখটা দেখে কেমন যেন কষ্ট হচ্ছিল তার। পুরোপুরি পরিচয় জানা নেই, তবু অস্ফুট স্বরে ডেকে উঠেছিল "দাদু!"

একেবারে চমকে উঠেছিলেন ভট্টাচার্যমশাই। সঙ্গে সঙ্গেই জড়িয়ে ধরেছিলেন সেই ছোট্ট নাত্‌নিটিকে। একটা ডুবন্ত মানুষ যেমন করে একটা অবলম্বনকে জড়িয়ে ধরে তেমনি করে জড়িয়ে ধরেছিলেন তিনি। ললিতার মাথা বুকে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, 'দিদি-ভাইরে, বুড়ো গরিব ভাইটাকে মনে রাখিস।' কেমন যেন একটু দিশেহারা হয়ে পড়েছিল ললিতা। ঠিক তখনই মেয়েকে ডেকেছিল প্রভাবতী "খুকু, এদিকে এসো, দুষ্টুমী করোনা।' ললিতা আবার গিয়ে বসেছিল মায়ের পাশে, কিন্তু বুড়ো মানুষটির সেই করুণ মুখটা ভুলতে পারছিল না কিছুতেই।

আজও ভুলতে পারেনি ললিতা, কথায় কথায় সেদিন বলেছিল সে, 'আজও যে-কোনো করুণ মুখ দাদুর সেদিনের সেই মুখের সঙ্গে কেমন একাকার হয়ে যায়।'

প্রভা যায়নি। বাবাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল সে। বেশ মোলায়েম করেই বলেছিল, 'ভাখো, বাবা, তুমি তো অবুঝ নও, মেয়ের বিয়ের পর তার নিজের বলে কিছু থাকে না। শ্বশুর বাড়ির সঙ্গেই তার দায়-দায়িত্ব জড়িয়ে যায়, এ-কথা তো তোমায় আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। এঁরা কেউ চান না যে, তোমাদের ওখানে আমি যাই......কাজেই......।' একটু থেমে আবার বলেছিল সে, 'একটা কথা বলছি, কিছু মনে করোনা। তোমরা এখানে কেউ আর এসোনা এতে আমার মান বাড়েনা, লজ্জা বাড়ে। তবে যখন যা' প্রয়োজন আমায় লিখো আমি পাঠিয়ে দেব, টাকার জন্য কখনও ভেবনা।'

সেদিন ওই পর্যন্তই, আর কোন কথা হয়নি। যাবার সময় বাবাকে প্রণাম করেছিল প্রভাবতী। ভট্টাচার্য মশাই দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করতে গিয়ে কথা বলতে পারেননি, গলা বুজে এসেছিল তাঁর।

ললিতা বলেছিল, 'মেসোমশাই কিন্তু এর পরও আসতেন। এসে হৈ চৈ করতেন। হাসতেন হো হো করে। দুই ভাই-বোনকে কাঁধে নিয়ে ছুটোছুটি করতেন।' ললিতা মেসোমশাই-এর কাঁধের ওপর চেপে খুশিতে ডগমগ হয়ে বলতো, 'হট ঘোড়া হট।' মেসোমশাই ঘোড়ার মত ছুটতে ছুটতে বলতেন, 'তোরা যখন বড় হবি, আমার বাড়ি যেতে পারবি, তখন কিন্তু আমি আর আসবো না। ঘোড়া তখন বাড়ি বসে থাকবে, আর সওয়ার যাবে ঘোড়ার বাড়ি।' কথা শুনে খিল খিল করে হেসে উঠত ললিতা।

ছয়

এদিকে ললিতা যখন মেসোমশাই-এর কাঁধে চেপে খুশিতে ভরপুর, ওদিকে সেই দামাল ছেলেটি তখন কৈবর্তদের ভবঘুরে বাদলের সঙ্গে কারা তোয়ার স্রোত ঠেলে চলেছে দূরে ভাটকান্দি শ্মশান ছাড়িয়ে আরও পুবে।

বাদলের বয়েস বছর ষোলো, দেবজ্যোতির চেয়ে বেশ কিছু বড়। শক্ত-সমর্থ চেহারা, মাথায় ঝাকড়-মাকড় চুল। চোখে-মুখে কেমন এক বেপরোয়া ভাব। ইচ্ছে করলেই সে যেন এই এক মুঠো পৃথিবীটাকে পায়ে দলে যেতে পারে—ঠোঁটের কোণে এমনি একটা ভঙ্গি। তার বাবার আছে ছোট্ট এক কামারশালা, সেখানে সে নিজেও মাঝে মাঝে হাঁপর টানে। কিন্তু মন

দিয়ে কাজ করার মত সময় কোথায় তার? এই বিশ্ব-সংসারে চারপাশ থেকে যার ডাক এসেছে,' সে কি করে পড়ে থাকে আগুনের ধারে হাঁপর নিয়ে? কখনও সে যোগ দেয় যাত্রায়—সাজে কৃষ্ণ কিম্বা বলরাম। কখনও অংশ নেয় কীর্তনে—রাধার বিরহের জ্বালা প্রকাশ করে গানে গানে—নিজে কাঁদে, যারা শোনে তারা মোছে চোখের জল। আর যখন থাকে একা, তখন বাজায় বাঁশি—ভাটিয়ালী সুর। ঐ বাঁশি শুনলেই কেমন একটা কান্না যেন দেবজ্যোতির বুকে গুমরে গুমরে উঠত। কেবলই মনে হত কি যেন ছিল হারিয়ে গেছে। ভারি ইচ্ছে হত, সে নিজে বাজায়। কতদিন বাদলকে তাই বলেছে 'বাদলদা আমাকে বাঁশি বাজাতে শিখিয়ে দেবে?'

উত্তরে বাদল তো হেসেই অস্থির। তারপর মুখ থেকে বাঁশিটা নামিয়ে বলে 'হ্যারে, তুইনা উকিল বাবুর ছাওয়াল, তোর এট্টু বুদ্ধি নাই? একেরে বোকা!'

এ-প্রশ্নে বোকা হওয়ার কথা আসে কি করে বুঝতে পারে না দেবজ্যোতি। বাদলই পরিষ্কার করে কথাটা বলে, 'বাঁশি আবার শিখামু কি-রে? কান খাড়া কইর‍্যা শুনবু আর বাজাবু, ব্যস্।' খুব সহজ পথ। কিন্তু দেবজ্যোতির মন ভরে না, বাদলের কাছে যা সহজ দেবজ্যোতির কাছে তা নয়। না পাওয়ার একটা বেদনা নিয়েই সে বাদলের পাশে বসে বাঁশি শোনে, আর ভাবে বাদলটা কি সুখেই না আছে।

বাদলের একবার যা খেয়াল চাপবে তা' সে করবেই। সেদিন সন্ধ্যে-বেলা দেবজ্যোতির বাড়ি এসে হাজির, বল্ল 'চল্ দেবু' মাগন তুলতে যাই। দেবজ্যোতি তো লজ্জায় লাল। সারা পৌষ মাস জুড়ে ছেলে-ছোকরার দল সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে মুষ্টি ভিক্ষে নেয়—সেই হল মাগন। সংক্রা-ন্তির দিন এই মুষ্টি ভিক্ষে দিয়ে হয় বনদেবীর পুজো, তারপর সবাই মিলে বনভোজন। আগে কোনো দিন সে যায়নি, তা ছাড়া বাড়ির অনুমতি পাওয়াও সম্ভব নয়। কিন্তু কে শোনে সে-সব কথা। শেষ পর্যন্ত যেতে হয়েছিল দেবজ্যোতিকে, বাড়ির কাউকে না বলেই যেতে হয়েছিল। কয়েকটা বাড়ি ঘুরে ঘুরে সবার সাথে গলা মিলিয়ে গানও গেয়েছিল দেবজ্যোতি। অদ্ভুত সব গানের কথা—

> হু-হু রে লড়িয়া, হস্তীর উপর চড়িয়া—
> হস্তী তুল তুল করে
> তারই উপর ময়না ওড়ে।

উড়ুৎ ময়না, ফুড়ুৎ ত্যাল,

আম-গুরুয়া আর পাকা ব্যাল।

গান গাইতে গাইতে বার বার হেসে ফেলছিল দেবজ্যোতি। গানের কথার কোনো অর্থই বুঝতে পারছিল না সে। তবু সেই শীতের সন্ধ্যায় চাদর মুড়ি দিয়ে প্রতি বাড়ির দরজার কাছে আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে না-বোঝা কথার মালা সাজিয়ে সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গাওয়া তাকে যেন এক নতুন জগতের আমেজ এনে দিয়েছিল।

সেই বাদল সেদিন বিকেলে দেবজ্যোতির হাতটা চেপে ধরেছিল খপ করে। বলেছিল, 'ক্যারে নৌকা কর‍্যা বেড়াবার যাবু?' কেমন একটা চমক-লাগা কৌতূহল নিয়ে প্রশ্ন করেছিল, 'কোথায়?'

—যাবু তো চলনা। কোনো অবসর না দিয়েই দেবজ্যোতির একটা হাত ধরে হাঁটতে সুরু করেছিল বাদল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে বলেছিল, 'ভাটকান্দি শ্মশান ছাড়ায়ে আরও পুবে যামু, দ্যাখনা আজ কেমন মজা হয়।'

মজার গন্ধে দেবজ্যোতির মনটাও নেচে উঠেছিল, বাদলকে নিঃশব্দে অনুসরণ করেছিল সে।

ঘাটের কাছে জেলেদের নৌকোটা বাঁধা, জেলে পাড়া থেকে নৌকোটা চুরি করে এনে বাদলই বেঁধে রেখেছিল ওখানে। সেই নৌকোয় দেবজ্যোতিকে আগে তুলে বৈঠা হাতে নিয়ে বসেছিল বাদল। বৈঠা বাইতে বাইতে দেবজ্যোতিকে বলেছিল সে, 'নোক কর‍্যা বস্যা থাক, বেশী দোলা-পাড়া করিস না যান, নৌকাটা ভাল না, ফুটা ফাটা আছে।' দেবজ্যোতিকে চুপ করে বসে থাকতে বলে সে আপন মনে গান ধরেছিল—

ইচা মাছের ফিচা

দাইড়কা মাছের ঝোল

নয়া জামাই শুত্যা আছে

ঠ্যাকনা দিয়া তোল।

গানটা শুনতে শুনতে দেবজ্যাতির যেমন হাসি পাচ্ছিল, তেমনি কেমন একটা অজানা ভয়ও ঘিরে ধরছিল তাকে।

মাঝ দরিয়া দিয়ে স্রোতের টানে নৌকো চলেছিল প্রচণ্ডবেগে। কখন এক সময় নদীর দু'পাশে শুরু হয়েছিল ঘন জঙ্গল। বাঁশ-বেতের নিবিড়তায় জায়গাটা ছায়া-ছায়া অন্ধকার। বড় বড় বাঁশ গুলো নুয়ে নুয়ে পড়েছে নদীর একেবারে মাঝ মধ্যিখানে। কলকল করছে নদীর কালো জল। কোথাও

কোনো মানুষের সাড়া নেই, একটা দম-আটকানো নৈঃশব্দ। বাঁশ-বেতের জঙ্গল ভেদ করে দেখা যায় না কিছু। কেবল শোনা যাচ্ছিল হরেক রকম পাখীর ডাক আর ঝিঁ ঝিঁ পোকার এক টানা সুর। অদূরে কোথায় যেন একটা শব্দ হচ্ছিল—হুপ্ হুপ্—কিসের শব্দ কে জানে! অকারণেই দেবজ্যোতির গা-টা কেমন ছম-ছম করে উঠেছিল। সকলের আগে ওর যে কথাটা মনে পড়েছিল তা হল এই যে, এখানে কোনো ভূত প্রেত নেইতো! আর ঠিক তখনই বাদল একবার পেছনে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলেছিল, 'ভয় করিস্ না যান, এটি সব ভূত-পেত্নীরা থাকে! ভর করিছু কি ঘাড মটকে দিবি। ওরা থাক ওগেরে মনে আমরা আমাগেরে, বুঝিছু?'

হক কথা। ভয় করলেই ভয়, আর না করলে, কিছু না। ওরা ওদের মত থাক আর আমরা আমাদের মত—কেউ কারও অস্তিত্বে বাধা দেবে না—দুই জগতে বিরোধ থাকবে না কোনো। খুব ভালো কথা। কিন্তু চোরা না মানে ধর্মের কাহিনী—দেবজ্যোতির মন তখন ভয়ে হিম। কাঠ হয়ে বসে আছে সে। এদিকে বাদল তখনও উপদেশ দিয়ে চলেছে, 'বুঝিছু দেবু, এই করতোয়া নদী হল্য মহাদেবের নদী - এর জল হল্য গিয়ে মহাদেবের হাত ধোয়া জল। তাই যখনই মনে ভয় লাগবি মহাদেবের নাম করবু—বাস্, আর কোনো ভয় থাকবি না। কিন্তুক মহাদেবকে গাল-মন্দ করিছু কি—ব্যস, সব্বাই তোর ঘার মটকে দিবি!'

কথা শুনে দেবজ্যোতির তো দম বন্ধ হবার জোগাড়। এমন জায়গায় সে আর আসেনি কখনও। ওর কেবলই মনে হতে লাগল, এইবার সব ভূত পেত্নীরা লাফিয়ে পড়বে নৌকোর ওপর আর তার ঘাড় মটকে দেবে। ভয়ে চোখ বন্ধ করল দেবজ্যোতি। চোখ খুলতে সাহস পেলে না সে। পাছে ভূতের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়। আর সেই সঙ্গে মহাদেবের কথা ভুলে গিয়ে রাম-নাম জপ করতে শুরু করল। হঠাৎ এক সময় পায়ে জল লাগতেই চমকে উঠেছিল দেবজ্যোতি, চোখ মেলে তাকিয়েই হতভম্ব—একি কাণ্ড, জল কোত্থেকে? বাদল তখন নৌকোর সামনে, একেবারে কৌণিক বিন্দুটিতে বসে আপন মনে দাঁড় টানছে। আর দূরে দৃষ্টি রেখে গাইছে গান। দেবজ্যোতি এক মুহূর্তে সমস্ত অবস্থাটা উপলব্ধি করে চিৎকার করে উঠেছিল, 'বাদলদা' নৌকোর ফুটো দিয়ে ভীষণ জল ঢুকছে।

—সে কি-রে!—গান থামিয়ে আঁতকে উঠেছিল বাদল।

—এবার কি হবে?—দেবজ্যোতির গলা শুকিয়ে কাঠ।

কয়েকটা ফুটো দিয়ে হু হু করে তখন নৌকোয় ঢুকছে জল। নৌকোর

ভেতর জল থৈ থৈ। দেবজ্যোতি সেই দিকে তাকিয়ে প্রায় কাঁদ-কাঁদ স্বরে বল্ল, 'এবার আমরা ডুবে যাব, বাদলদা।' ভাটকান্দি শ্মশানের পাশ দিয়ে তখন চলেছে ওরা, সেইদিকে আঙুল তুলে বাদল বল্ল, 'দাঁড়া, দাঁড়া, অত ভয় পাস্ছু ক্যান? ঐ শ্মশান ঘাটেই নৌকা লাগামু।' বলতে বলতেই নৌকোর মুখ ঘুরেছে ঘাটের দিকে, আর সেই সঙ্গে কেমন একটু গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করেছিল বাদল, 'ক্যারে দেবু, মনে মনে মহাদেবকে গাল মন্দ করিছিলু?'

—সে কি কথা! ঠাকুর দেবতাকে গাল-মন্দ করতে যাব কেন?

দেবজ্যোতির ভুরু কুঁচকে ওঠে।

– তা হল্যে এমন হল্য ক্যান?—একটা চিন্তার রেখা মুখে ফুটে ওঠে। যেন বিরাট এক সমস্যার সমাধান খুঁজে পাচ্ছে না।

দেবজ্যোতি ভয়ে ভয়ে আস্তে বল্ল, 'চুরি করে নৌকোটা এনেছো তো, সেই পাপেই বোধ হয়—।'

—চুরি হল্য কুটি? নৌকাটা তো আবার ফিরায়েই দিমু।

—তবু তো না বোলে এনেছো?

—তা হবি—। —কেমন যেন আহত হল বাদল।

নৌকো এসে ভিড়ল শ্মশান ঘাটে। সেখানে তখন জন-প্রাণীর চিহ্ন নেই। ধূ ধূ করছে চারদিক, ফাঁকা মাঠের মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে আছে এক একটা বড় গাছ। কেমন যেন নিঃসঙ্গ প্রহরীর মত। দম-বন্ধ করা নৈঃশব্দ চারদিক। কি একটা অজানা ভয়ে দেবজ্যোতির বুকটা টিপ টিপ করছিল। তবু তীরে নৌকো লাগতেই সাহসে ভর করে নৌকো থেকে একেবারে পারে লাফ দিয়েছিল দেবজ্যোতি। আর সঙ্গে সঙ্গেই ওর কানের কাছে বিকট চিৎকার উঠেছিল,—"খবরদার! খবরদার বলছি।"

সেই বিকট চিৎকারে মুহূর্তে দেবজ্যোতির সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গিয়েছিল। এতক্ষণ ভয়ের সঙ্গে যুজ তে যুজতে নিজেকে সচেতন রাখার সামর্থ্যের শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়ে ছিল সে। পেছন থেকে, একেবারে কানের কাছে ঐ বিকট চিৎকারের ধাক্কা আর সামলাতে পারল না তাই। একটা অস্ফুট শব্দ করে চৈতন্য হারিয়ে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু বাদল ধরে ফেলেছিল ওকে। ওর শরীরটাকে কয়েকটা ঝাঁকুনি দিয়ে প্রশ্ন করেছিল, 'কি-রে দেবু কি হল্য?'

ততক্ষণে দেবজ্যোতিও সামলে নিয়েছিল নিজেকে, চোখ মেলে চাইতেই

সামনে দেখতে পেয়েছিল জগা পাগলাকে। ওদের সামনে এসে হাজির হয়েছিল সে। পরনে সেই ছেঁড়া গেরুয়া, মাথায় জটা, মুখে কাঁচাপাকা দাড়ির ঝোপ, কপালে সিঁদুর। ওদের দিকে আঙুল তুলে বলছিল, 'খবরদার! খবরদার বলছি!'

এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছিল বাদল। দেবজ্যোতির কাঁধে একটা হাত রেখে বলেছিল, 'দূর গাধা, জগাদারে দেখ্যাই-ভয়?' তারপর জগাপাগলার দিকে চেয়ে হেসে বলেছিল, 'কি হল্য জগাদা?' জগাদার দৃষ্টি তখন ওদের ওপর থেকে সরে গিয়ে চলে গেছে নদীর ওপারে। আপন মনে সে তখনও বকে চলেছে, 'আমারটা আমার। আমার সম্পত্তি আমার, আমার যাবতীয় আমার—খবরদার বলছি, খবরদার!'

এবার দেবজ্যোতিরও হাসি পেয়েছিল। জগা পাগলাকে কে না চেনে! আত্মীয় স্বজনেরা ফাঁকি দিয়ে ওর সম্পত্তি নিয়ে নিয়েছিল। অনেক চেষ্টা করেও সে তার সম্পত্তি ফিরিয়ে আনতে পারেনি। সেই শোকে 'আমার—আমার' করে শেষপর্যন্ত পাগল হয়ে গেল লোকটা। শহরের এমন কোন লোক নেই যে তাকে চেনে না, তার চিৎকার শোনেনি। আর তার গলা শুনেই কিনা ভয় পেল দেবজ্যোতি। কেমন একটা লজ্জায় ওর মুখেও এতক্ষণে হাসি ফুটে উঠেছিল। বার বার মনে হচ্ছিল ওর, সত্যি এতটা ভয় পাওয়া তার উচিত হয়নি।

পাছে দেবজ্যোতি আবার ভয় পায় তাই ওর একটা হাত ধরে শ্মশানের ঠিক মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চলেছিল বাদল। কিছুক্ষণ আগে যে একটা চিতা জ্বলেছিল তার চিহ্ন এখানে সেখানে ছড়ানো। ভিজে পোড়া কাঠ তখনও রয়েছে ছড়িয়ে। সেই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল বাদল, ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বল্ল, 'সান্যাল বাড়ির বড় বৌ মাগ্গা গেছে। বড় ভাল মানুষ ছিল।'

একটু চুপ করে আবার বলেছিল, 'সকালবেলা ওগেরে বাড়ি গেছিলাম, বড় ছাওয়ালের সে কি কান্দা!" নিজের মনেই আবার বলেছিল সে, 'কাঁদবি না। মাত্তর কয় বছর হল্য বিয়া হছিল।' পরক্ষণেই কেমন একটা বিরক্তির স্বরে বলেছিল, 'লোকে যে বিয়া করে ক্যান বুঝিনা, যত্তসব উট্‌কো ঝামেলা। এই যে বৌটা মলো এখন কান্দ।' বিশ্বজোড়া সমস্ত মানুষের নির্বুদ্ধিতায় হঠাৎ যেন বড় বিরক্তি বোধ করেছিল বাদল। একটা অস্বস্তি ফুটে উঠেছিল ওর মুখে। কিন্তু পরক্ষণেই কেমন একটু চমকে মাটির দিকে ঝুঁকে পড়েছিল সে, অস্ফুট স্বরে বলে উঠেছিল, 'আরে!'

দেবজ্যোতিও ঝুঁকে পড়েছিল মাটির দিকে। বাদল ততক্ষণে দু'খানা ইঁটের ফাঁক থেকে তুলে এনেছে একটা সোনার হার। ওর হাতে চকচক্ করছে সেটা, লকেটে ছোট্ট করে লেখা একটা অক্ষর, হয়তো কোন নামের আদ্যক্ষর হবে। বাদল বলল 'আরে, এ যে সান্যালদের বড় বৌ-এর হার, আমি বৌদিমনির গলায় দেখিছি।' তারপর কতকটা আপন মনেই বলল 'আহারে, শোকে তাপে কারও আর কিছু খেয়াল নাই, সব ফেলায়ে চলে গেছে।' চোখটা কেমন জলে ভরে উঠেছিল বাদলের, দেবজ্যোতির দিকে ফিরে বলেছিল, চল্, আগে এইটা দিয়াসি।'

—তার মানে? এখন অতদূরে সান্যালদের বাড়ি যাবে নাকি?

—যামুনা! —বিস্ময়ে চোখ বড় হল বাদলের।

—এদিকে যে সন্ধ্যে হয়ে এলো?

—তা হোক, ওরা বেচারীরা কত খোঁজা-খুঁজি করবি। আহা বৌদিমনি বড় ভালো লোক ছিল রে!

বাদলের কথা শুনতে শুনতে দেবজ্যোতির চোখে তখন ভেসে উঠেছিল ভিন্ন দৃশ্যপট।

বাগচিরা হল পাবনার জমিদার। মস্ত বড় বাড়ি, বিরাট বিরাট থাম-ওয়ালা গেট। সেই গেট পেরিয়ে মস্ত চত্বর, তার চারপাশে নায়েব গোমস্তাদের থাকবার ব্যবস্থা। কাছারি বাড়ি পেরিয়ে ঠাকুর-দালান, তারপর অন্দর মহল। বারো মাস দুর্গা পুজো হয়, সোনার দুর্গা মূর্তি! আগে মাটীর প্রতিমাই ছিল, কিন্তু সেই প্রথম, যে-বার বাগচিদের জমিদারীতে নীলের চাষ সুরু হল সেই বারই মায়ের আদেশ পেলেন জমিদার বাবু, মায়ের সোনার মূর্তি চাই। সেই থেকেই সোনার দুর্গা।

এক বিকেলে ঠাকুর বাড়ির উঠোনে খেলা করছিল সবাই—বাগচিদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা, পাড়ার দু'চার ছেলে, এবং দেবজ্যোতি। আর বাদলও ছিল সেখানে। ঠাকুর দালানের সিঁড়ির ওপর বসেছিল চুপচাপ। বাদল সেদিন সবে ভবানীপুর থেকে যাত্রা করে ফিরেছে। তখনও ভবানীপুরের মাহাত্ম্য আর যাত্রার আমেজ তার চেতনায়। বলতে গেলে সেদিন সারাটা দুপুরই বাদলের কাছে ভবানীপুরের গল্প শুনেছে দেবজ্যোতি।

সেরপুর থেকে আরও দূরে ভবানীপুর। মস্ত তীর্থক্ষেত্র। ভারতের পীঠস্থান-গুলির একটি। বেশ আয়েস করে পীঠস্থানের কাহিনীটিও বলেছিল বাদল। সতীকে মহানিদ্রায় নিদ্রিতা দেখে মহাযোগী মহাদেব ধরলেন রুদ্রমূর্তি।

সতী-দেহ নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে তিনি শুরু করলেন তাণ্ডব নৃত্য—সৃষ্টি যায়। ভাবিত হলেন বিষ্ণু। চক্রধারী তখন সুদর্শন চক্রের সাহায্যে সতীর অঙ্গচ্ছেদ করলেন—এক একটি ছিন্ন অঙ্গ পড়ল এক একটি স্থানে, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থান হয়ে উঠল পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। ভবানীপুরও এমনি একটি তীর্থস্থান।

বিশাল মন্দিরের চারপাশে তালবীথি। মন্দিরের বাইরে চারিদিকে এলোমেলো ছোট-বড় শিব মন্দির। আম-জাম-জামরুলের ছায়া। মন্দিরগুলো যেন প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে গেছে। কত লোক-কাহিনী গড়ে উঠেছে এই মন্দিরকে ঘিরে। এক এক করে দেবজ্যোতিকেও সেইসব কাহিনী শুনিয়েছিল বাদল!

···বুড়ো ফকির মাহ্‌মুদ যাত্রা-পালা-গান বড় ভালবাসে। বাদলের যাত্রা বড় ভাল লেগেছিল বুড়োর। ফলে বাদলের সঙ্গে মিতালী পাতিয়েছিল সে। সেই বুড়োর মুখেই শুনেছিল সে অনেক কথা। ভবানীপুরের মাহাত্ম্যের কাহিনী। তালের বড়া না হলে নাকি মা ভবানীর ভোগই হয় না। কিন্তু বারোমাস কি তাল হয়! হয় বৈকি! কোনো-না কোনো গাছের নীচে অন্তত: একটি পাকা তালও পড়ে থাকতে দেখা যাবে। অসময়ের তাল যে-ই কুড়িয়ে পায়, সে-ই গিয়ে দিয়ে আসে মন্দিরে। ফকির মাহ্‌মুদ কতবার পেয়েছে, গিয়ে দিয়ে এসেছে মায়ের মন্দিরে। একবারের ঘটনা বলেছিল ফকির মাহ্‌মুদ। —তার বড় ছেলের খুব অসুখ—সেরে ওঠার সম্ভাবনা কম! ফকিরের মন বড় খারাপ। একটা পুকুরের ধারে চুপ চাপ বসেছিল সে। এদিকে আর এক কাণ্ড,সেদিন পাকা তাল পাওয়া যায়নি একটাও, পূজারী থেকে সাধারণ লোক পর্যন্ত সকলের মুখে চিন্তার রেখা। এমন সময় ফকিরের সামনের গাছটা থেকে পড়ল একটা পাকা তাল, ফকির তো অবাক। সে সেটা নিয়ে ছুটল মন্দিরে। তারপরই ভাল হয়ে গিয়েছিল ফকিরের ছেলে।

গল্প শুনতে শুনতে প্রশ্ন করেছিল বাদল, 'তা' ফকিরচাচা, তোমরা হলে মুসলমান, হিন্দুদের মায়ের পূজা করো ক্যান?' তামাক টানতে টানতে ফোকলা মুখে খানিক হেসে নিয়েছিল ফকির মাহমুদ, তারপর বলেছিল, 'তুইতো, বড় বোকা ছাওয়ালরে, হিন্দু মুসলমানের কথা ক'স্ ক্যান? ভবানী-মা হল্য আমাগের গাঁয়ের মা, গ্রামের মা—এটি হিন্দু-মুসলমানের কথা কি!' ভুড়ুক ভুড়ুক করে আবার একটু তামাক খেয়ে বলেছিল, 'হিন্দুরা পীরের কাছে সিন্নী মানত করে না? ক্যান করে? নিজের বলিই তো? ত্যাখ্, ঐ মা-ই ক', আর পীরই ক'—এঁরা কারও কেনা লয়।'

সার কথা। ধর্মের বেড়া দিয়ে ভগবানকে আটকানো যায় না, হৃদয়ের নির্যাসেই তার উপস্থিতি। সে-নির্যাস কারও কেনা নয়। না হিন্দুর না মুসলমানের।

মন্দিরের অদূরে যে মস্ত পুকুর তাকে নিয়েও একটা কাহিনী প্রচলিত। সত্য মিথ্যে যাচাই করতে যাওয়া বৃথা, তবে স্থানীয় লোকের প্রাণের সুবাসে ভরা সে কাহিনী। একবার এক শাঁখারী হেঁকে চলেছে পথ দিয়ে, শাঁখা চাই, মা, শাঁখা। ধর্মপ্রাণ শাঁখারী। হাঁটু অবধি কাপড়, ময়লা। খালি গায়ে গলায় একটা চাদর, খালি পা। হেঁকে চলেছে সে। সারাদিন বিক্রী হয়নি —পরিশ্রমে-খিদেয় অবসন্ন শরীর। শরীরটাকে একটু জুড়িয়ে নেবার জন্য পুকুরপারে গাছের নীচে হাত পা ছড়িয়ে একটু শুয়েছে শাঁখারী! এমন সময় এক কালো মেয়ে তার সামনে এসে হাজির। বলে, তাকে পরিয়ে দিতে হবে এক জোড়া শাঁখা। শাঁখারী চেয়ে দেখে সেই মেয়েকে—একেবারে চোখ-জুড়োন রূপ। বছর বারো বয়েস। মেঘলাবরণ এলো চুল, ডাগর-ডাগর ভ্রমর-কালো চোখ, পরনে লাল-পেড়ে ডুরে শাড়ি। উঠে ব'সে প্রশ্ন করে শাঁখারী, তুমি কাদের বাড়ির মেয়ে গো?

—আমি মন্দিরের পূজারীর মেয়ে গো। শাঁখা পরিয়ে দাও, বাবা পয়সা দেবে।—কথা শেষ করেই দু'হাত বাড়িয়ে দেয় সেই মেয়ে। মুখে তার কৌতুকের হাসি। শাঁখারী একটা হাত তুলে নেয় মেয়ের, বলে, 'বাবা পয়সা দেবে তো?'

—দেবে গো দেবে। আর যদি না দেয়,—কালো মেয়ের মুখে এক ঝিলিক হাসি, 'আমি এই এখানে বসে রইলুম, তুমি এসে তোমার শাঁখা খুলে নিও।
—তা আমি পারব না মেয়ে, শাঁখা পরিয়ে আবার খুলতে পারব না। না দিলে কি আর করব!

কথা শুনে কালো মেয়ে হাসে। শাঁখা পরানো শেষ হলে সেই কালো মেয়ে বসে রইল গাছের তলায়, আর শাঁখারী গেল পূজারীর কাছে পয়সা আনতে। পূজারী সব শুনে বলে, 'সে কি কথা গো, শাঁখারী, আমার তো কোনো মেয়েই নেই। নিশ্চয় কোনো মেয়ে তোমায় ঠকিয়েছে।' মেয়ের বিবরণ দেয় শাঁখারী, পূজারী হাসতে থাকে। বলে, 'বিশ্বাস করি কেমন করে, এমন মেয়ে যে এ তল্লাটেই নেই।' কি সর্বনাশ! একেবারে মিথ্যেবাদী! শাঁখারীর তখন কাঁদতে বাকি! শাঁখারীর অনুরোধে পুকুর-ঘাটে আসে পূজারী—কিন্তু কোথায় কি! কোথায় সেই মেয়ে—পুকুর-ঘাটে কেউ নেই।

পুজারী হেসে বলে, 'দুটো পয়সা চাই, সে-কথা বল্লেই হতো, এসবের কি প্রয়োজন ছিল?'

শাঁখারীর চোখে তখন জল টলমল করছে।—মাগো, শেষে এই বুড়ো বয়েসে মিথ্যেবাদী সাজালি?' আর ঠিক তখনই পুকুরের ঠিক মাঝখানে দেখা যায় শাঁখা-পরা এক জোড়া কালো হাত। সমস্ত শরীরটা জলের নীচে, কেবল হাত দুটো উঁচিয়ে আছে ওপরে। সে দৃশ্য দেখে দু'জনেরই চক্ষুস্থির। পুজারী কেঁদে জড়িয়ে ধরে শাঁখারীকে, বলে, 'ওরে ও-ভাই শাঁখারী এ-তুই কাকে শাঁখা পরিয়েছিস, এ-যে আমার মা, মা ভবানী। ওরে, আমি বুঝতে পারিনি, আমি আগে বুঝতে পারিনি।' শাঁখারীর মুখে তখন আর কথা নেই, দু'চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে।

সাতমাথায় নবাব বাড়ির সামনে যে-বটগাছটা আছে তারই নীচে বসে গল্প বলছিল বাদল। নবাব বাড়ির সেই চারতলা সমান বিরাট গেটটার দিকে তাকিয়ে গল্প শুনছিল দেবজ্যোতি। গল্প শুনতে শুনতে সেদিন কিন্তু একবারও তার মনে হয়নি, এই শহর ছেড়ে একদিন তাদের চলে যেতে হবে। এই শহর যাবে পাকিস্তানের অধিকারে, আর সেই পাকিস্তানের একজন প্রধান মন্ত্রী হবে এই নবাব বাড়িরই ছেলে—মহম্মদ আলি। গল্পের শেষে বাদল বলেছিল সেদিন, 'বুঝিছু, দেবু, ঐ ভবানীপুরে গেলে না আর আসবার ইচ্ছা করে না, মনটা কেমন জানি হয়ে যায়।' গল্প শুনে দেবজ্যোতির মনটাও যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল। নবাব বাড়িটার দিকে তাকিয়ে ভাবছিল আকাশ- পাতাল। হঠাৎ কেমন এক ঘর-পালান নেশা তাকে পেয়ে বসেছিল।

বিকেলে বাগচিদের বাড়িতে যখন খেলতে এসেছিল, তখনও বাদলের গল্পের রেশ ছিল তার মনে। তাই সেদিন খেলায় মন ছিলনা তার। অবোধ মনের কি এক আকুতি নিয়ে মন্দিরের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে নির্নিমেষে তাকিয়ে ছিল সেই সোনার দুর্গামূর্তির দিকে। মন্দিরের সেই ফুল চন্দনের গন্ধে-ভরা পরিবেশে দাঁড়িয়ে কি কথা যে সে ভাবছিল তা সে নিজেও ভালোকরে জানত না। অহেতুক একটা কান্না ভাব বুকে গুমরে উঠতে চাইছিল। ভাল লাগছিল না কিছু, মন দিতে পারছিল না কিছুতে।

আর ওই দিন ওই বিকেলেই গোল বাধল বাদলকে নিয়ে। বাচ্চারা সবাই খেলায় মত্ত, হঠাৎ দেখা গেল বাগচিদের বাড়ির ছোট মেয়েটার গলার হারটা নেই। বছর পাঁচেক বয়েস, জিজ্ঞাসা করলে দেখিয়ে দিল একটা দিক। আর

বাদলও দাঁড়িয়ে ছিল সেই দিকেই। বাদলকে ঘিরে সবাই জিজ্ঞাসা করল 'কি-রে বাদল তুই নিয়েছিস ?'

অবান্তর প্রশ্নে বাদল হাসে। সে পেলে কি-এতক্ষণে ফিরিয়ে দিতনা ! তাই এ-প্রশ্নের উত্তর দেয় না বাদল, কেবল হাসে। তার হাসিতে বাকী সবার সন্দেহ বাড়ে সবার যত সন্দেহ বাড়ে বাদল তত হাসে। সকলের নির্বুদ্ধিতায় কেমন যেন একটা মজা পায় বাদল। ব্যাপারটা ক্রমশ চরমে উঠতে থাকে। এগিয়ে আসে বাগচিদের মেজো ছেলে। বছর বাইশ বয়েস। বলে, 'দিয়ে দে বাদল, চুরি করে পার পাবি না।' বাদলের মুখ থেকে হঠাৎ হাসি মিলিয়ে যায়, একটা নিষ্ফল ক্রোধে সমস্ত মুখটা কালো হয়ে ওঠে। পলকহীন চোখে চেয়ে থাকে মেজো ছেলের মুখের দিকে। মেজো ছেলে ব্যঙ্গ করে বলে, 'ও-ভাবে তাকিয়ে থেকে লাভ নেই, এটা যাত্রার আসর নয়, যা নিয়েছিস ভালয়-ভালয় তা' ফিরিয়ে দে।' এ-যেন বাদলের আত্মসম্মানে এক প্রচণ্ড আঘাত। তার সমস্ত চেতনা তখন ফুঁসে উঠতে চাইছে। তার মুখে একটা কথাও নেই, তাকিয়েই আছে। পলক পড়ছে না চোখের।

—এ বাদলা, দিয়ে দে, ছোট লোক হোয়ে ভদ্দর লোকের বাড়ি এ-সব করিস না, ভালো হোবে না। —হিন্দুস্থানী দারোয়ানটা এগিয়ে এসে শাসায় বাদলকে, 'উঠ্ কাঁহা রেখেছিস্ বোল্।'

—কমু না। —বাদল তখন মরিয়া, রাগে অপমানে থর থর করে কাঁপছে।

—বোলবি না, হারামজাদা। —তেড়ে যায় হিন্দুস্থানী দারোয়ান্।

দেবজ্যোতি ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে বাদলের পাশে। চিৎকার করে ওঠে সে, 'মিথ্যে কথা, বাদলদা নিতেই পারে না।' কিন্তু কে তার কথা শোনে ! বাদল দু'পা পেছিয়ে গিয়ে বল্ল, 'হ্যাঁ, আমি নিছি, দিমুনা আমি।'

—দিবে না, হারামজাদা ! —বাদলের গলা টিপে ধরে দারোয়ান।

বাদলের মুখ লাল হোয়ে ওঠে, প্রচণ্ড চাপে ওর চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়, দু'চোখ দিয়ে ঝরতে থাকে জল। তবু বাদল অস্ফুটে বলতে থাকে, 'না দিমুনা।' সবাই নীরবে দেখতে থাকে সেই দৃশ্য।

—ছেড়ে দাও, মরে যাবে। —আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে দেবজ্যোতি এবং পর-মুহূর্তেই ঝাঁপিয়ে প'ড়ে দারোয়ানের হাতটা প্রাণপণে কামড়ে ধরেছিল সে। 'আরে রাম'—বলে আঁতকে উঠে দু'পা পিছিয়ে গিয়েছিল সেই হিন্দুস্থানী দারোয়ান।

দেবজ্যোতির এই অতর্কিত আক্রমনে সব যেন কেমন ওলট পালট হয়ে

গিয়েছিল, বিহ্বল হয়ে পড়েছিল সবাই। চলতি ঘটনাটা হঠাৎ যেন কেমন বাঁক নিয়েছিল একটা। কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল সব। বাদল কিন্তু তবু রেহাই পায় নি, তার সমস্ত জামা কাপড় খুঁজে দেখা হয়েছিল, খুঁজে দেখা হয়েছিল যেখানে সে দাঁড়িয়ে ছিল তার চার পাশটা। কিন্তু না, পাওয়া যায়নি সোনার হর। খুঁজে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিল বাড়ি থেকে। সেই সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল দেবজ্যোতিও।

ভাটকান্দি শ্মশানের বুকে তখন অন্ধকার নেমে এসেছে, দূরে দূরে শোনা যাচ্ছে শেয়ালের ডাক। কি একটা অজানা ভয় অন্ধকার হয়ে দানা বেঁধে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে চারপাশে। গাছ-গুলো দাঁড়িয়ে আছে একপেয়ে ব্রহ্ম দত্যির মতন। সেই মুহূর্তে দেবজ্যোতিকে কিন্তু এ সবের কোনো কিছুই স্পর্শ করেনি। বাদলের জন্য মনটা তার অকারণে ব্যাথায় ভরে উঠেছিল। বাদলের একটা হাত নিজের হু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল সে।

বাদল হেসে বলেছিল, 'ক্যারে ভয় করিছে?'

নাঃ। —নিজের আবেগকে প্রচ্ছন্ন রেখেছিল দেবজ্যোতি।

এর অনেকদিন পর পাওয়া গিয়েছিল সেই সোনার হার, ওই উঠোনের এক গর্ত থেকে। ফুল গাছ লাগাবার জন্য মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে পাওয়া গিয়েছিল সেটা। সেদিন বাদল যেখানে দাঁড়িয়েছিল তার থেকে অনেক দূরে ছিল সেই স্থান। হা নী পেয়ে সবাই সেদিন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেছিল, কেউ কোন কথা বলেনি আর। বাদল কিন্তু নিজের পক্ষে কথা বলার জন্য অতদিন আর অপেক্ষা করেনি, এর অনেক আগেই সে সরে পড়েছিল। মাত্র হু'দিনের জ্বরে এই পৃথিবীর সবাইকে ছেড়ে বাদ-প্রতিবাদের অনেক উর্ধ্বে চলে গিয়েছিল সে। দেবজ্যোতির কিন্তু সেই মুহূর্তে সমস্ত রোষ ফুঁসে উঠতে চেয়েছিল। ওর মনে হয়েছিল, ঐ দারোয়ান, ঐ বাগচিদের মেজো ছেলে, ছুটে গিয়ে ওদের সবার টুঁটি টিপে ধরে। কিন্তু নাঃ, তা সে পারেনি, ক্ষোভে দুঃখে নিজের মনে মনেই ফুলে ফুলে উঠেছে সে।

পারেননি ডবসন সাহেবও। মনুষ্যত্বের অতবড় অপমান নীরবে সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে, তাঁর মত আরও অনেককে। সেটা ছিল ৬ই আগষ্ট ১৯৪৫।

একটা নিঃসঙ্গ আমেরিকান প্লেন মৃত্যুদূতের মত এগিয়ে গিয়ে জাপানে হিরোসিমার ওপর বোমা বর্ষণ করে এল,—নাগাসাকির ওপরও পড়ল পারমাণবিক বোমা। সমস্ত মানবজাতির কলঙ্ক হয়ে ধ্বংস হল দুটো শহর, আর সেই ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ল হাজার হাজার নিরীহ শিশু-নারী-পুরুষ। সেদিন মাত্র গুটিকয়েক লোকের খেয়ালের জন্য এতগুলো অসহায় মানুষকে এমন ভয়াবহ মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল। কিন্তু কই সেই গুটিকয়েক লোকের বিরুদ্ধে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের রোষ তো ফুঁসে ওঠেনি, যেমন করে বাদলের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে ফুঁসে উঠতে চেয়েছিল দেবজ্যোতির রোষ! অথচ প্রহসন এই যে, সকলেই বলে মানব কল্যাণের কথা! হিরোসিমা-নাগাসাকির ওপর বোমা বর্ষণ হল, তার কয়েক মাস আগেও এমনি এক প্রহসন ঘটেছিল ইয়াল্টায়। সেদিন রুজভেল্ট-চার্চিল-স্টালিন মিলিত হয়ে সমগ্র মানব সভ্যতার কল্যাণের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন।

শিউলী-আশ্রমে বসে এই খবর শুনতে শুনতে ডবসন সাহেবের চোখে যেমন জল টলমল করে উঠেছিল, তেমনি সেই সঙ্গে বজ্রের মত কঠিন হয়ে উঠেছিল তাঁর মন। তিনি সঙ্কল্প করেছিলেন, এই শাসক-শোষক গোষ্ঠীর মুখোস খুলে দিতে হবে সাধারণ লোকের সামনে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, সাধারণ মানুষকে সজাগ করতে না-পারলে ঐ শাসক-শোসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তারা কোনদিন ফুঁসে উঠতে পারবে না, কোনদিন তারা চিনতে পারবেনা তাদের আসল শত্রু কে!—মানবতার টুঁটি টিপে ধরবার প্রয়োজন কাদের সে-কথা তারা জানতে পারবে না কখনও।

সেদিন সেই দুপুরে ডবসন সাহেব যখন চিন্তার স্রোতে পাক খাচ্ছিলেন, বাদল তখন তার খড়ো ঘরের দাওয়ায় জ্বর গায়ে বসে ছিল, আর বাদলের মুখের দিকে তাকিয়ে তার ঠিক পাশেই বসে ছিল দেবজ্যোতি। বাদলের চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'সব ব্যাপারে তুমি যে কেন নাক গলাতে যাও! এবার ভোগো।' একটু হেসেছিল বাদল, তারপর বলেছিল, 'বুঝিছু দেবু আমাগের কথা কেউ ভাবেনা—ঐ হিন্দুই ক' আর মুসলমানই ক', বড় নোক হল্য বড় নোক, গরিব গরিব। এর বেলা শালার ধম্ম-টম্ম কিছু নাই।'

দেবজ্যোতি তখনও তাকিয়েইছিল ওর মুখের দিকে। বাদলের চোথ মুখ আরও ফুলেছে। সারা মুখের কালশিটে দাগ সেই ঘটনাটার সাক্ষ্য বহন

করছে। দেবজ্যোতি তখন হয়ত সেই ঘটনার কথাই ভাবছিল। ঘটনাটা এই রকম!

তখন প্রায় বিকেল। রাবেয়া চলেছিল রমজান আলির বাড়ি। পথে বাদলের সঙ্গে দেখা। বছর ষোল বয়েসের মেয়ে রাবেয়া। সুন্দর মুখশ্রী, ফর্সা গায়ের রঙ, এক মাথা চুল—কিন্তু সমস্ত সৌন্দর্য যেন ঢাকা পড়েছে দারিদ্র্যের অন্ধকারে। ছিন্ন শাড়ি-ব্লাউজ, দেহে মার্জনার অভাব, তার ওপরে মুখে একটা বিষাদের ছায়া। বাপজান বাঁধে বিড়ি, মা জ্বালানির জন্য শুকনো কাঠ-পাতা কুড়িয়ে আনে। কোনো ক্রমে সংসার চলে। রাবয়াকে দেখে হাসল বাদল, তারপর আস্তে প্রশ্ন করল, 'কুটি যাচ্ছ রে রাবেয়া?' একটু করুণ হেসে বলেছিল, 'ফুফুর খুব জ্বর ডাক্তার আসবি। মা রমজান চাচার ঠেঙে হাওলাত করবার পাঠাল।'

—রমজান চাচা! ওরে বাবা! ও শালা যে এক নম্বরের বদমায়েস।

কথা শুনে ভয়ে আঁতকে উঠেছিল রাবেয়া। চাপা গলায় বলেছিল, 'বাদল তুই একদিন মরবু রে! ওরা হল্য বড় নোক, ওগেরে নামে এসব ক'ল্যে তোকে যে মাইরা ফেলবি।'

—ঘণ্টা করবি।—দু'হাত তুলে কলা দেখিয়েছিল বাদল।

রাবেয়া দাঁড়ায়নি আর, ভয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়েছিল। বাদলও দাঁড়ায়নি আর, আলি সাহেবের বাড়ির পেছন দিককার বড় পেয়ারা গাছটায় গিয়ে চড়েছিল সে। ডাঁসা পেয়ারাও খাওয়া যাবে ওখানে বসে বাড়ির ভেতরটাও দেখা যাবে। এক ঢিলে দু'পাখিই মরবে।

বিরাট বাড়ি আলি সাহেবের। বাড়ির যে দিকটায় তিনি থাকেন সে দিকটায় অন্য কেউ আসেনা। আলি সাহেবের বারণ, গণ্ডগোলে তাঁর কাজের ক্ষতি হয়। বিকেলের পড়ন্ত রোদ তখন লম্বা হয়ে বারান্দার ওপর পড়েছে, আলিসাহেব সেই রোদে চোখ বুজে বসে ছিলেন চুপ চাপ। বছর পঞ্চাশ বয়েস, কাঁচা-পাকা দাড়ি। ধর্মে মন আছে, প্রতিদিন পাঁচবার নামাজ পড়েন। প্রচুর জমি-জায়গা, দুটো বড় ব্যবসা। কাজেই নানা ভাবনায় তাঁকে থাকতে হয় সব সময়। সব দিকে তাঁর দৃষ্টি, একটা পয়সা কারও বাজে খরচ করার অধিকার নেই।

অনেক ইতস্তত করেও এপাশের দরজায় আস্তে ধাক্কা দিয়েছিল রাবেয়া।

—কে ?—আলিসাহেবের বাজখাই গলা শোনা গিয়েছিল।

—চাচা, আমি। আমি রাবেয়া।

—বেটী তুই !—গলায় স্নেহ ঝরে পড়ছিল আলি সাহেবের।

দরজা খুলে রাবেয়া ভিতরে ঢুকতেই দরজায় আবার হুড়কো এঁটে দিয়েছিলেন রমজান আলি। চোখ দুটো তার যেন একটু চক চক করে উঠেছিল। রাবেয়া কেমন ভয়ে ঢোক গিলেছিল একবার, তারপর আস্তে বলেছিল, 'ফুফুর খুব অসুখ, মার হাতে ট্যাকা নাই। তাই আপনার ঠেঙে ক'টা ট্যাকা হাওলাত করার জন্য মা পাঠাল।' রাবেয়ার যেন কেমন ব্যস্ত ভাব, পালাতে পারলে বাঁচে।

—দিমুরে দিমু, অত হাঁক-পাক করিচ্ছু ক্যান ? একটুক বস্।

দাড়ি নাচিয়ে হাসলেন আলি সাহেব। রাবেয়াকে বারান্দায় বসিয়ে দু'খানা দশ টাকার নোট নিয়ে এলেন ঘর থেকে। ফিরে এসে হাসি মুখে বসলেন রাবেয়ার পাশে। রাবেয়া তখন ঘামছে।

—তুই আবার কচি ছাওয়াল, ট্যাকা হাইরে ফেলাবু',—বলেই বুক থেকে ওর আঁচলটা টেনে নিলেন আলি সাহেব, ওর শাড়ির খুঁটে নোট দু'খানা বাঁধতে বাঁধতে বল্লেন, 'তাই নিজেই বাইন্দা দিলাম।'

আলি সাহেবের আচরণে কোন বিকৃতি নেই, সহজভাব। রাবেয়া তখন কিন্তু হাঁপাতে শুরু করেছে। বুকের ওপর কাপড় নেই, ছিন্ন ব্লাউজে ধরা পড়ছে না উদ্ধত যৌবন, মরিয়া হয়ে বুকের ওপর দুটো হাত আড়াআড়ি রেখে নিজেকে আড়াল করবার চেষ্টা করল সে। আলি সাহেবের এবার হঠাৎ যেন দৃষ্টি পড়ল ওর ছেঁড়া ব্লাউজের ওপর। ওর পিঠে একটা হাত রেখে বল্লেন, 'ক্যারে তোর জামা যে এক্কেরে ছিঁড়া গ্যেছে। আগে ক'স নাই ক্যান ? চাচাকে আবার সরম কি-রে ?' একটু থেমে বল্লেন, 'দেখিরে এট্টু মাপটা, একটা কিন্না আনমু।' কথাটা শেষ করেই জোর করে ওর হাত দুটো সরিয়ে দেন বুক থেকে, সেই সঙ্গে পট-পট করে খুলে ফেল্লেন ব্লাউজের বোতাম। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ হয়ে পড়ল অসহায় সেই যুবতীর সমস্ত যৌবনের ভাণ্ডার। অস্ফুট একটা চিৎকার করে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলেছিল রাবেয়া। সেই মুহূর্তে আলিসাহেবকে একটা খুনি বলেই মনে হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল, রাবেয়ার দেহটাকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবেন তিনি।

গাছ থেকে বাদল সব দেখছিল, আর সহ্য করতে পারল না সে। চরম

মুহূর্তে পাঁচিল টপকে বাড়ির মধ্যে লাফিয়ে পড়েছিল। বাদলকে দেখে ওরা দু'জনেই হতভম্ব। মুক্তির আনন্দে নিজের জামা-কাপড় সামলে নিতে ভুলেই গিয়েছিল রাবেয়া। কিন্তু পরমুহূর্তেই অবস্থার গুরুত্ব বুঝেছিল সে। নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে তাই ভয়ার্ত গলায় বলেছিল 'তুই এটি ক্যান? খোদার কসম্, তুই চল্যা যা বাদল, পালা।'

'না শালাক আজ দেখামু। ট্যাকা আছে বলে যা' লয় তাই করবি। আজ ভুতির মা, কাল শাকিলা পরশু————। শালাক আজ মাইর‍্যাই ফেলমু।' বলেই ছুটে গিয়েছিল বাদল, হতবাক আলিসাহেবের গালে মেরেছিল এক চড়, তারপর কয়েকটা কিল-ঘুষি।

ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছিল রাবেয়া। আর আলি সাহেব চিৎকার শুরু করেছিলেন, 'মাইর‍্যা ফেলল চোট্টা...........ডাকু।' আলি সাহেবের চিৎকারে বাড়ির ও-পাশ থেকে ছুটে এসেছিল সবাই—ছেলে-ছোকরা চাকর-বাকর।

—শালা চুরি করবার আসছিল, টের পায়্যা রাবেয়া দরজা বন্ধ কর্যা দিছে। আমি যেই ধরতে গেছি শালা মারবার লাগিছে, এত সাহস।'

আর বেশী কিছু বলার প্রয়োজন ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছিল হাটুরে মার। রাবেয়া সহ্য করতে পারেনি সে-দৃশ্য, ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে।

বাদলকে ছেড়ে দিয়েছিল ওরা। টলতে টলতে বাড়ি ফিরেছিল বাদল। চোখ-মুখ ফুলে উঠেছিল ওর, সারা গায়ে কালশিটে। চৌরাস্তার মোড়টা পেরোতেই দেখা হয়েছিল রাবেয়ার মার সঙ্গে। রাবেয়া আর ওর মা ছুটতে ছুটতে আসছিল তার কাছেই। বাদলকে দেখে একেবারে কেঁদে ফেলেছিল রাবেয়ার মা। ওর মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে বলেছিল, 'আরে আমার সোনার চাঁদ ছাওয়ালরে, এক্কেরে মাইর‍্যা ফেলিছে। বাইচ্যা থাক সোনা আমার।'

কিন্তু না বেঁচে থাকেনি বাদল। সেদিন রাত্রেই প্রচণ্ড জ্বর এসেছিল ওর। আর সেই জ্বরেই শেষ।

বাদলকে হারিয়ে কেমন যেন অসহায় বোধ করছিল দেবজ্যোতি। সেদিন একা একা বসেছিল মাঠের একধারে। রাবেয়া ফিরছিল ঝুড়ি হাতে শাক-পাতা সংগ্রহ করে। দেবজ্যোতির সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সে। কি একটা কথা বলতে গিয়েও বলতে পারেনি, কান্নায় বুজে এসেছিল ওর

গলা। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে। অস্ফুটে একবার বলেছিল কেবল 'হায় খোদা!'

মৃত্যুর আগে দাওয়ায় বসে জ্বর গায়ে বলেছিল বাদল, 'বুঝিছু দেবু লেখা পড়া শিখ্যা একদিন মস্ত মানুষ হবু, তারপর সব শালাক শায়েস্তা করবু। কোন শালাক খাতির করবুনা—ধলা-কালা কারুকে লয়।'

কথাটা কোনো দিন ভোলেনি দেবজ্যোতি, ভুলতে পারেনি। সেদিনও কথাটা মনে ছিল তার কলকাতার বুকে প্রকাশ্য রাস্তায় ডবসন সাহেবের হাতটা যেদিন কামড়ে ধরেছিল সে। সেই মুহূর্তে বাবার কথাটাও মনে পড়েছিল ওর। বাবা বলতেন, এই সাহেবরাই দেশের সর্বনাশ করেছে। কিন্তু ওই ঘটনাটার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না ডবসন সাহেব। একেবারে চমকে উঠেছিলেন তিনি। আর দেবজ্যোতি বাধ্য হয়েই হাতটা ছেড়ে দিয়েছিল বটে, কিন্তু ভেতরের সেই উত্তাল আবেগকে সংযত করতে পারেনি কিছুতেই। তাই অত লোকের মাঝেও হঠাৎ সে কেঁদে ফেলেছিল।

সেদিন সেই উনিশ শো তিরিশ সালে ঘটনার প্রচণ্ডতায় প্রথমে কেঁদে ফেলেছিলেন ডবসন সাহেবও। কিন্তু পরে তাঁর বুকের আগুনে চোখের সে-জল শুকিয়ে গিয়েছিল। আগুনে পুড়ে পুড়ে নতুন মানুষ হয়েছিলেন তিনি। সে-মানুষ কোনো দেশের নয়, কোনো কালের নয়, ব্যক্তি-স্বার্থের কোনো গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা নয়।—সীমার মাঝে থেকেও অসীমের সঙ্গে তার মেশামেশি।

সাত

জলপাইগুড়ির চা-বাগানে প্রথম এসে খুশিতে ভরপুর হয়ে উঠেছিল যুবক আর্থার ডবসন। বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াত, ঘুরত জঙ্গলে জঙ্গলে, প্রকৃতির রাজ্যে ছিল তার আনাগোনা। গ্রীষ্মের দুপুরে কোনো গাছের ছায়ায় আমেজে পা ছড়িয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। ঘাসের ওপর শুয়ে শুয়ে শুনত দোয়েল-শ্যামার গান, একা-একা শিষ দিত তাদের সাথে। ছাতারে পাখীর দল যখন ঝগড়ায় ব্যস্ত হত, আপন মনেই হাসতে সে। শালিক পাখী-মাছরাঙার সাথে একদিন মিতালী হয়ে গিয়েছিল তার। জেলেরা মাছ ধরত দাঁড়িয়ে দেখত সাহেব, শেষে ওরা ভালবেসে ফেললে সাহেবকে। প্রথমে চলত সেই আদিম ভাষায়

কথা। —মুখ আর হাত পা-নেড়ে। পরে ভাঙা বাংলায় কথা বলত সাহেব। জেলেদের উদ্দেশ্য করে বলত, 'টোমরা মাছ ডোরছ, হামার আনন্দ হল।' ওরা বাংলা শুনে হেসে গড়িয়ে পড়ত, ওদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে হো-হো করে হেসে উঠত ডবসন সাহেবও। এমনি করে একদিন তিস্তার কূলের মানুষকে, তার গাছ পালা পশু-পাখীকে ভালবেসে ফেলল ডবসন সাহেব।

এক একদিন মাঠের দিকে চলে যেত আর্থার, গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত ধানের ক্ষেতের ঢেউ, হাঁটতে হাঁটতে শুনত চাষীদের ভাটীয়ালী সুরের গান। কথা বুঝত না, তবু সেই উন্মুক্ত পরিবেশ তার মনে একটা আবেশ ছড়িয়ে দিত।

এমনি করে পথে পথে এলোমেলো ঘুরতে ঘুরতেই একদিন দেখা হয়ে গিয়েছিল শুভময়ের সঙ্গে। সেটা ছিল শরৎকাল। লালমাটির সরু পথ ধরে আপন মনে চলেছিল আর্থার। দু'পাশে ধানের ক্ষেতের সোনালী ধানে শরতের মিঠে রোদের আস্তরণ, তাতে শিশির বিন্দুর ঝিকিমিকি খেলা—ফড়িং প্রজাপতির সমারোহ, মৌমাছির গুঞ্জরণ। সাহেব চেয়ে চেয়ে দেখছিল চারদিক, দেখে দেখে যেন আশ মিটছিল না তার,—নীল আকাশের চাঁদোয়ার নীচে এ যেন এক স্বপ্নের দেশ। সাহেবের মনে একটা দোল লেগেছিল। মিহি হাওয়ায় ধানের ক্ষেতে যে-সুর বেজে উঠেছিল, সে-সুরের আবেশে ভরে উঠেছিল সাহেবের মন। ক্রমশ যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলছিল আর্থার, প্রকৃতির সেই সৌন্দর্যের সাগরে কেমন যেন ডুবে যাচ্ছিল সে। কেমন এক ঘোর-লাগা মানুষের মত ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছিল দীর্ঘকায় সেই বিদেশী মানুষটা।

গ্রামের পথে দেখা হয় দু'একটা মানুষের সঙ্গে, চাষা-ভূষো লোক সাহেব দেখে কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে পথ ছেড়ে দেয়। চাষীবৌরা সাহেব দেখে ঘোমটা টেনে থমকে দাঁড়ায়। এমনি লজ্জা নম্র ভাবটা বেশ লাগে সাহেবের। সরু রাস্তাটার এক পাশে সরে গিয়ে পথ করে দেয় আর্থার। চাষীবৌরা লজ্জায়-ভয়ে কেমন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালায়। ওদের এমনি করে ছুটে পালানোর মধ্যেও কেমন যেন ছন্দ খুঁজে পায় আর্থার ডবসন। ওদের পথের দিকে আবেশময় চোখে চেয়ে থাকে সে, চেয়ে চেয়ে ভাবে এ যেন এক ছন্দময় জগৎ, আনন্দময় পরিবেশ। —মাঠে মাঠে সোনার ধানে, মিঠে রোদের আস্তরণে, শিশির-ভেজা ঘাসের ঝিকমিকিতে, ফড়িং প্রজাপতির পাখার রঙে রঙে ছড়িয়ে আছে সেই-ছন্দ, ছড়িয়ে আছে সেই-আনন্দ। নিজের অজান্তেই দেশটাকে ভালবেশে ফেলে আর্থার ডবসন।

সেদিন সকালেও এমনি উদ্দেশ্যহীন ভাবে একা একা পথ চলছিল আর্থার।

আর তখন উল্টো দিক থেকে আসছিল নীল সাইকেলের সেই আরোহী। বলিষ্ঠ-দেহী এক যুবক। শ্যামলা গায়ের রঙ। পরনে ধুতি, গায়ের ফতুয়া খদ্দরের, পায়ে মোটা চটী। প্রচণ্ড বেগে সাইকেল চালিয়ে ছুটে আসছিল সেই আরোহী। ওর সামনে এসেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল একেবারে মুখোমুখী। দুটো চোখ যেন অঙ্গারের মত জ্বলছিল তার, দৃষ্টি দিয়ে পড়ে নিতে চাইছিল সাহেবের মনটা। সেই-জ্বলন্ত দৃষ্টির সামনে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করেছিল সাহেব, নিজেকে সহজ করবার জন্য একটু হাসবার চেষ্টাও করেছিল সে। কিন্তু তাতেও যুবকের মুখের কোন ভাবান্তর ঘটেনি, সাহেবের চোখের ওপর চোখ রেখেই ইংরেজীতে প্রশ্ন করেছিল, 'কে আপনি ?'

সোজাসুজি এমন প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না সাহেব, একটু অস্বস্তি বোধ করেছিল আর্থার। তবু একটু হাসবার চেষ্টা করে উত্তর দিয়েছিল সে, 'আমি একজন বিদেশী।'

—তা' তো দেখতেই পাচ্ছি। আসল পরিচয়টা কি ?—কেমন যেন অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল নীল সাইকেলের সেই আরোহী।

এবার একটু ভয়ই পেয়েছিল আর্থার। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক, গায়ে খদ্দর,—হঠাৎ টেরোরিষ্টদের কথাটা মনে পড়ে গিয়েছিল তার। কিন্তু পরক্ষণেই ভয়কে জয় করেছিল সে। সহজ কণ্ঠেই উত্তর দিয়েছিল, 'অত্যন্ত সাধারণ একজন মানুষ। পশ্চিম ইংলণ্ডে টেমসের কূলে ছোট্ট এক গ্রামে জন্ম। কলকাতায় বাবার ব্যবসা, তিস্তার ধারে তাঁর একটা চায়ের বাগান আছে, কিছুদিন হল সেখানে আছি। দ্যাট্স অল।' যুবকটী তখনও তাকিয়েছিল সাহেবের দিকে, স্থির দৃষ্টি—ঠিক ঠিক উত্তর যেন পায়নি সে এখনও। আর্থার একটু মুচকি হেসে বলেছিল, 'কলকাতা ভাল লাগেনি, এখানকার সব ভাল লাগছে। তাই ঘুরে বেড়াই, ঘুরে ঘুরে দেখি।' এবার একটু শ্লেষের সঙ্গে বলেছিল সে, 'অন্যায় করছি না নিশ্চয়ই ?'

সেই গম্ভীর থমথমে মুখখানা এবার সহজ হয়ে এসেছিল অনেক খানি। দৃঢ়মুখের পেশী শিথিল হয়েছিল, ঠোঁটের কোণে দেখা দিয়েছিল সরু একফালি হাসির রেখা। সাইকেলের প্যাডেলের ওপর একটা পা রেখে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বলেছিল, 'ভারতবাসীর কাছে বিদেশীরা চিরকালই সম্মানীয় অতিথি, ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ্, সবাইকেই তারা সাদরে দেশের সব কিছু দেখিয়েছে। দেখার মধ্যে কোন অন্যায় নেই। অন্যায় তখনই পরের জিনিস দেখে যখন মনে লোভ জন্মায়, ছলে-বলে-কৌশলে অপরের জিনিষ পেতে ইচ্ছে করে।'

কথাগুলো বড় ভাললেগেছিল আর্থারের, সেই সঙ্গে ভাললেগেছিল কথা বলার ভঙ্গিটা। আর্থারের মনে যেন কেটে বসেছিল ওর কথা গুলো। আস্তে আস্তে বলেছিল, 'বড ভাল কথা বলেছেন তো, ঠিক এমনি ঘটেছিল রবার্ট ক্লাইভের জীবনে। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য দেখে দেখে একদিন তার মনে জন্মাল লোভ,—আর ধীরে ধীরে সেই লোভ একদিন তাঁকে গ্রাস করে ফেলল। পরিণামে আত্মহত্যা করে একদিন তাঁকে শাস্তি খুঁজতে হল।' শেষের দিকটায় কতকটা নিজের মনেই বলেছিল কথা গুলো।

সাহেবের কথার মধ্যে কোথায় ছিল একটা আন্তরিকতার সুর, যুবকটীকে তা' স্পর্শ করেছিল। এবার সে হেসে উঠেছিল। বলেছিল, 'ক্লাইভের নামটা মনে করে কিন্তু কথাটা বলিনি আমি। যাক্, আপনার নামটা কিন্তু জানা হয়নি।'

—ও ইয়েস, আমি আর্থার ডবসন। আপনি?

যুবকটী আর্থারের চোখের দিকে আর একবার তাকিয়েছিল স্থির দৃষ্টিতে। তারপর ধীরে ধীরে বলেছিল, 'আমি শুভময় রায়।' কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সাইকেলে সওয়ার হয়েছিল সে, প্যাডেলে পা চাপিয়ে বলেছিল, 'এখানে যখন আছেন আবার দেখা হবে নিশ্চয়ই।' তারপর আর দাঁড়ায়নি, আগের মতই প্রচণ্ড বেগে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল সে।

আর আর্থার অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়েছিল সেই গমন-পথের দিকে। শুভময়কে হঠাৎ যেন একটা উল্কার মতই মনে হয়েছিল তার, কোথা থেকে এল কোথায় গেল কিছুরই যেন ঠিকানা রেখে গেল না! আর্থার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেবেছিল অনেকক্ষণ। সামান্য আলাপন, কাটা-কাটা কথার উত্তর-প্রত্যুত্তর মাত্র। তবু কেমন একটা রেশ রয়ে গিয়েছিল সাহেবের মনে। সামান্য-দেখা সেই মানুষটিকে ভুলতে পারছিল না কিছুতেই।

এর মাত্র দুদিন পরেই ঘটেছিল সেই অঘটন যার সূত্র ধরে আর্থারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল শিউলীর এবং নতুন করে আলাপ শুরু হয়েছিল শুভময়ের সঙ্গে। আসলে সেই ছোট্ট ঘটনাটাই আর্থারকে জীবনের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল, নতুন জীবন-বোধে উদ্বুদ্ধ করতে সাহায্য করেছিল সেই ঘটনাটাই।

একদিন চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে ডবসন-কাকার কাছে শোনা পুরনো দিনের কথাগুলোই ভাবছি বসে। আর সেই সঙ্গে আমার মনটা তখন

হিমালয়ের কোলের সেই ছোট্ট গ্রাম, তে শিমলা, আর তার পাশে বয়ে যাওয়া ছোট্ট পাহাড়ী নদী—নে-ও-ড়া— ওরই আশে-পাশে ঘুরে ফিরছে। কিন্তু খুট্ করে একটা শব্দ হতেই চিন্তায় ছেদ পড়ল, অতীতটা গেল হারিয়ে। চোখ মেলে দেখি দরজায় দাঁড়িয়ে ললিতা, হাসি-হাসি মুখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

ওর ঐ হাসি-হাসি মুখ খানার দিকে চেয়ে কেমন একটা আনন্দের দোলা লাগল মনে। হঠাৎ এ-ভাবে আসতে দেখে একটু অবাক না হয়েও পারিনি। একটু ব্যস্ত হয়েই বল্লাম, 'আরে আপনি এমন হঠাৎ! অসুন আসুন!' কিন্তু ললিতা কোন উত্তর দেবার আগেই ওর ঠিক পেছনে এসে দাঁড়াল অন্য একটি মেয়ে, যাকে আমি দেখিনি কখনও। ললিতা এগিয়ে এল ঘরের ভেতর। ওর পিছু পিছু এল মেয়েটিও। আমি একটু অপ্রতিভ। ললিতা একটা চেয়ারের পিঠে হাত রেখে একটু হেসে বলল, 'চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটালাম তো?'

—ব্যাঘাত বলছেন কেন, বলুন চিন্তার হাত থেকে মুক্তি দিলেন।—একটা কিছু বলতে পেরে বেঁচে গেলাম আমি।

—তা হোলে তো আর কোন প্রশ্নই ওঠেনা। —হাসল ললিতা। মেয়েটির দিকে তাকয়ে বল্ল, 'যাক, পরিচয় করিয়ে দি, সুতপা সেন। এক সঙ্গে কলেজে ইউনি-ভার্সিটিতে পড়েছি। আর ইনি.........।'

নমস্কার বিনিময় শেষ করে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।'

—হ্যাঁ, বসছি। —একটু হাসবার চেষ্টা করল সে।

দুজনে বসল পাশাপাশি। ওদের দেখে আমার মনে হচ্ছিল ওরা যেন দুই ভিন্ন জাতের মানুষ। —দেহের গঠন থেকে আরম্ভ করে সাজ পোষাক পর্যন্ত— কোথাও দুজনের মিল নেই। ললিতার শ্যামলা ঘেঁষা গায়ের রঙে উপছে পড়ছে কেমন একটা ঔজ্জ্বল্য; মুখের পেশীতে মনের দৃঢ়তার সঙ্গে মিশেছে মানবতায় ভরা কমনীয়তা। দুচোখ যেন কর্মের উদ্দীপনায় জ্বলছে। ওকে দেখে মনে হয় ও যেন পেয়ে গেছে ওর পথের নিশানা, এবার শুধু দৃঢ় পায়ে সেই পথে চলা। হতাশার কোনো চিহ্ন নেই ওর চোখে, আপন জনকে হারাবার ক্ষোভ ফুটে ওঠেনি দেহের কোথাও।

আর ঐ সুতপা সেন—ও যেন দেহ-মনে ললিতার ঠিক উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে আছে। প্রচণ্ড ফর্সা গায়ের রঙ, তাতে একটু লালচে আভা; কটা চোখের তারায় কি ভাষা আছে বোঝা যায় না ঠিক। চুলে একটু ব্রাউন রঙের

ছোঁয়া। বাঁ দিকের গালে একটা বড় কালো তিল। সুন্দর স্বাস্থ্য। পরনে শালোয়ার কামিজ। —পুরুষের মত কনুই পর্যন্ত হাতা গুটোনো। দেহে কোথাও গয়নার বালাই নেই, বাঁ হাতে বড় আকারের একটা ঘড়ি। সুশ্রী। সুন্দরীই বলা যেতে পারে। কিন্তু কোথায় যেন কমনীয়তার অভাব—সব থেকেও কি যেন নেই। সমস্ত অবয়বে কেমন একটা আত্মপ্রত্যয় মেশান গাম্ভীর্যের ছাপ।

ললিতা আর সুতপার মধ্যে বিরাট বৈষম্য,—কিন্তু এই আপাতবৈষম্যের ফাঁকে কোথায় ওদের মধ্যে একটা মিলও ছিল। খুঁজে পাচ্ছিলাম সেটা কি।

আমি তাকিয়ে ছিলাম সুতপার চোখের দিকে। কেবলই মনে হচ্ছিল, কি যেন পায়নি ও, মনে মনে তারই সন্ধান করে ফিরছে, কিন্তু পাচ্ছে না। ওর ঐ সন্ধানে ফেরা-চোখ, আবার আত্মপ্রত্যয়-মেশানো গাম্ভীর্য, পরনের শালোয়ার কামিজ,—সব কিছু মিলিয়ে মেয়েটি আমার মনটাকে টেনে ধরছিল বার-বার। ওকে জানবার কৌতূহল দমন করতে পারছিলাম না কিছুতেই। হয়তো আমার চোখেও প্রকাশ পেয়েছিল সে-কথা। আর তাই ললিতা আমার চোখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'হঠাৎ এ ভাবে আমরা এলাম কেন, জানতে কৌতূহল হচ্ছে তো?'

—তা' একটু হচ্ছে বৈকি!

—কিছু অনুমান করতে পারেন?

—তা' কি করে পারব?

—আপনার সঙ্গে একটা বিষয়ে পরামর্শ করতে।

—পরামর্শ আমার সঙ্গে! সর্বনাশ!

—সর্বনাশ কেন? —ভুরু কুঁচকোল ললিতা।

একটু হাসল সুতপা। বলল, 'দেখুন, বিনয় জিনিসটা ভাল, কিন্তু তার বাড়াবাড়িটা কি ভাল? ওতে নিজেকে জাহির করা হয়না?' আস্তে আস্তে কথা কয়টী বলে তাকাল আমার দিকে। ওর কথা বলার ভঙ্গিটা বেশ লাগল।

—তুই শুরু কর। —বন্ধুকে বলল ললিতা।

—হ্যাঁ বলছি। —আমার দিকে তাকাল সুতপা,—'সব অবস্থাটা বোঝাতে গেলে একটু ডিটেলস্-এ যেতে হবে কিন্তু।'

—বেশ তো, ক্ষতি কি।

আমার কাছে তখনও সব ব্যাপারটাই ধাঁধার মত,—কি বিষয়ে আলোচনা, কিসের পরামর্শ কিছুই ঠাহর করে উঠতে পারছিলাম না।

স্বপা বলতে শুরু করল, 'বুঝলেন, আমার ছেলে বেলাটা কেটেছে দিল্লীতে কাজেই আদব-কায়দায় তার খানিকটা ছাপ রয়ে গেছে।'

—যেমন পোশাক পরিচ্ছদে।

—ও; আই মেণ্ট ইট!—হাসল স্বতপা। তারপর বলল, 'স্কুলের পাঠ শেষ করে কলকাতায় এসে কলেজে ভর্তি হলাম। কলকাতার লাইফটা ঠিক যেন অ্যাডজ্যাস্ট করতে পারছিলাম না। স্পেশালি কলেজের মেয়েদের কিছুতেই সহ্য করতে পারতাম না। ওদের বড্ড বেশী পরের ওপর নির্ভরশীল বলে মনে হত, খানিকটা অস্বস্তিকর ন্যাকামি। কারও সঙ্গে বনিবনা হতনা। একা-একাই থাকতাম। এমন সময় পেয়ে গেলাম ললিতাকে। মনে হল, ও যেন আর সকলের থেকে আলাদা। মিলে গেলাম দুজনে। ক্রমশ বন্ধুত্ব। দুজনে বেশ ছিলাম। কিন্তু কি একটা ভাবনা মাঝে মাঝে মনটাকে ঘিরে ধরত। সব সময় একটা কমপ্লেকস্-এ ভুগতাম। মেয়ে হয়ে জন্মানটাকে মনে হত একটা অভিশাপ। —যেমন তেমন করে চলাফেরা চলে না, যা ইচ্ছে তাই করা যায় না, প্রতি পদে বাধা। পুরুষের সমাজে মেয়েরা যেন আধা-মানুষ। সমাজে আধা-স্বাধীনতা তাদের পাওনা।—অথচ আইনের চোখে সবাই সমান। সব দেখে শুনে মনটা আমার বিদ্রোহ করতে চাইত, স্বাধীনতার জন্য পাগল হয়ে উঠত।'

একটু থেমে ললিতার দিকে তাকাল স্বতপা। ওর দিকে তাকিয়েই বলল, 'ললিতাও তখন মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছিল। কিছু একটা করতে চাইছিল, কিন্তু পথ পাচ্ছিল না।'

আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে আবার বলল, 'অথচ আমার মনের অবস্থাটা ও ঠিক ঠিক বুঝতে পারছিল না। এমনি মানসিক অবস্থায় আমার হাতে এল সেই বিখ্যাত বইটা—এ ভিনডিকেসন অফ দি রাইটস অফ উইম্যান—বইটা পড়ে উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠলাম আমি। দেড়শো বছর আগের সেই লেখিকা মিস মেরী উলস্টোন্ ক্রফট-কে বড় আপন মনে হল আমার। মনে হল, তিনিও যেন সেদিন আমার মতই এমনি উত্তেজনা বোধ করেছিলেন, তাঁর কথার ফাঁকে ফাঁকে সেই উত্তেজনারই প্রকাশ।

একটু থেমে প্রশ্ন করল আমায়, 'পড়েছেন বইটা?'

—না। ঠিক সুযোগ—।

—পড়বেন। দেখবেন, যে-সামাজিক অবস্থায় বইটা লিখেছিলেন, আজও তার পরিবর্তন ঘটেনি।

—সেকি, আমরা এগোইনি ?

—হ্যাঁ, এগিয়েছি। পুরুষও এগিয়েছে, মেয়েরাও এগিয়েছে, কিন্তু দু'জনের দূরত্বটুকু বেড়েছে বৈ কমেনি।

—ও। আচ্ছা তারপর বলুন।

—বইটা Talleyrand-কে উৎসর্গ করা। ফরাসী বিপ্লবের পর তিনি তখন নতুন সংবিধান লিখতে ব্যস্ত। ফ্রান্সের প্রতিটি মানুষকে, এমন কি দরিদ্রতম ব্যক্তিকেও শাসন ব্যাপারে অংশ গ্রহণের সুযোগ দিতে তিনি বদ্ধপরিকর। কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে তিনি বিমুখ। মেয়েদের এ-সুযোগ দেওয়া চলে না। 'বাট হোয়াই নট ?' ইংলিশ চ্যানেলের অপর পারে বসে প্রশ্ন করলেন Miss Wollstone Craft।

—আ পারটিনেণ্ট কোশ্চেন ইনডিড!

—ও, ইয়েস। Miss Mary তাঁর Vindication-এ প্রতিবাদ করে বললেন, পুরুষ এবং নারীর বিচার শক্তি যখন সমান, 'when women pertake with men of the gift of reason,' তখন মানুষ সম্বন্ধে বিচারের সমস্ত অধিকার পুরুষ কোথা থেকে পেল ? 'who made man the exclusive judge ?' সেই এ্যাডাম-এর দিন থেকে পুরুষের কাছে নারীর এই যে অধীনতা এ যেন তাঁকে অস্থির করে তুলেছিল। বইটা পড়ে, সত্যি বলতে কি, আমিও বেশ অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। মিস মেরী বলেছেন, ইঁদুর-আরশোলা বা বুড়ো গরুর ভয়ে সিঁটিয়ে-পড়া মেয়েরা যখন পুরুষের সাহায্য প্রার্থনা করে, এবং পুরুষ এগিয়ে আসে, মেয়েদের সে-ন্যাকামী একেবারে অসহ্য।

সুতপা ললিতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই জানিস না, একবার এমনি একটা অবস্থায় একটা মেয়েকে প্রায় মেরে বসেছিলাম।'

আমার মনে হতে লাগল সুতপা পুরুষকে ঘৃণা করে তাই কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করলাম। কিন্তু সে নিজেই বলল, 'এ-থেকে মনে করবেন না যেন আই হেট মেন। To speak you frankly, একবার একটি ছেলেকে আমি ভালওবেসেছিলাম।'

—সুশোভনের কথা বলছিস্ ? —প্রশ্ন করল ললিতা।

—হ্যাঁ।—ললিতার উত্তর দিয়ে আবার আমার দিকে চাইল সুতপা,—'মেয়েরা যা চায় ছেলেটির সে-সব কিছুই ছিল। সুদর্শন, লেখ-পড়া জানা, ভাল আয় তবু আমি চলতে পারলাম না।'

—কেন ?—প্রশ্ন করলাম আমি।

—বেশ চলছিলাম। মনের দিক থেকে সুশোভন সম্বন্ধে কোনো অসুবিধে বোধ করিনি কখনও। একদিন নানা আলোচনার ফাঁকে সুশোভন বলল, 'যাই বল, মেয়েরা কিন্তু সব কিছুর আগে খোঁজে সিকিউরিটি, তার পর অন্য কথা।'

হঠাৎ যেন একটা চাবুক খেয়েছিলাম, কেন সিকিউরিটি খোঁজে সে-সব নিয়ে তর্ক করিনি আর। কিন্তু সেই মুহূর্তে এইটুকু উপলব্ধি করেছিলাম, ভালবাসা বা বন্ধুত্ব সমানে সমানে ছাড়া হতে পারে না। একজন যদি কেবলই ভাবে তার ভালবাসার পাত্রটি তার দৈনন্দিন জীবনে চলাফেরার একমাত্র অবলম্বন, তা'হলে ভালবাসা বা বন্ধুত্ব কোনটাই গড়ে উঠতে পারে না। তাই নারী-পুরুষের ভালবাসায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই একটা ছলনার আবরণ থেকে যায়। এই উপলব্ধির পর ও-সব নিয়ে আর মাথা ঘামাইনি। পরীক্ষা দিয়ে একটা এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পোস্ট-এ চাকরী পেয়ে চলে গিয়েছিলাম দিল্লী। সেদিন হয়তো ভেবেছিলাম, এমনি ভাবে চাকরী করেই মেয়েরা তাদের সিকিউরিটি পাবে, আর সেই সঙ্গে তাদের সমান অধিকারের দাবীও অর্জন করতে পারবে। কিন্তু অল্পদিনেই আমার সে-ভুল ভাঙল।

—কেন ?—প্রশ্ন করলাম আমি।

—আমার কথাই বলছি। আমার ক্ষমতা বাড়ল, আমার সম্মানও বাড়ল তবু যেন সব পেলাম না। সকলের কাছেই আমি একজন নারী, মানুষ নয়, আধা-মানুষ। দিলাম চাকরী ছেড়ে। চলে এলাম কলকাতা।

—চাকরী ছেড়ে দিলেন ? —আমি অবাক।

—হ্যাঁ। মনে হল, এ-ভাবে সিকিউরিটি খোঁজার কোন অর্থ নেই। একক লড়াই করে কিছু হবে না। সমষ্টি-বদ্ধভাবে লড়াই করে নিজেদের অধিকার আদায় করে নিতে হবে।

—তার মানে ? রিভোলিউসন করতে চান নাকি ?

হঠাৎ একেবারে সোজা হয়ে বসল সুতপা। চোখ সূক্ষ্ম করে আমার দিকে চেয়ে রইল একটুক'ল। আস্তে বলল, 'ঠাট্টা করছেন ?'

আমি একেবারে অপ্রস্তুত। তাড়াতাড়ি বলে উঠি, 'ছিছি সেকি কথা ? ঠাট্টা করব কেন ? কি-ভাবে এগোতে চাইছেন সেটাই জিজ্ঞাসা করছিলাম।'

একটু হেসে ললিতার দিকে তাকাল সুতপা। ললিতা তাকাল আমার

দিকে। বলল, 'ঐ ব্যাপারটা নিয়েই তো ওর সঙ্গে আমার মতভেদ। কিছুতেই যখন ও আমার কথা শুনল না, তখন চলে এলাম আপনার কাছে। আপনার কথা শুনে আপনাকে আরবিট্রেটর হিসেবে মেনে নিতে ও রাজী।'

—আমার সৌভাগ্য বলতে হবে।

স্বতপার দিকে তাকিয়ে আমি হাসলাম, ও-ও হাসল একটু। ধীরে ধীরে বলল, "কলকাতায় এসেই ললিতার খোঁজে গেলাম ওর বাড়ি। এর মধ্যে ওর বাড়ির সঙ্গে যে এত কাণ্ড হয়ে গেছে তাতো আর জানি না। বহুদিন যোগাযোগ নেই। ললিতার মা আমাকে দেখে খুব খুশী হলেন, কিন্তু ললিতার কথা জিজ্ঞাসা করতেই একেবারে রেগে আগুন। আমি তো অবাক, ব্যাপার কি? শেষটায় বল্লেন, ললিতা নাকি একটা ভিখিরীকে বিয়ে করে বাউণ্ডুলে হয়ে গেছে। বুঝুন ব্যাপারটা। অনেক কথা-বার্তার পর পেলাম 'শিউলী'র ঠিকানা। সেখান থেকে দে ছুট।'

ললিতার মুখের দিকে তাকালাম আমি, ওর মুখে একটা অস্বস্তির ছায়া। আমি কি বলব ভেবে না পেয়ে একটু বোকার মতই জিজ্ঞাসা করে বসলাম, 'দেবজ্যোতির ঠিকানাটা ওঁরা জানতেন না?'

—ঠিক বলতে পারছিনা, হয়তো জানেন। —একটু থেমে একটা ঢোক গিলে বলল, 'ও-ঠিকানায় গিয়েও তো কোনো লাভ হতো না।'

— তা'অবশ্য।

ললিতা কথা বলল না আর। কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে জানালা দিয়ে চাইল বাইরের দিকে। স্বতপা ওকে চোখ দিয়ে একটু ছুঁয়েই আমার দিকে চাইল, চোখাচোখি হল আমোদের। ওর চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল। দেবজ্যোতি সম্বন্ধে এই সেন্টিমেণ্টটুকু যেন মেনে নিতে পারছিল না স্বতপা।

একটু কালের জন্য সামান্য স্তব্ধতা। ললিতা মুখ ফিরিয়ে আবার তাকাল আমাদের দিকে। —চোখে-মুখে সেই সহজভাবের ঢেউ। সোজাসুজি কাজের কথায় চলে এল। বলল, 'স্বতপা এখন একটা কাগজ বের করতে চাইছে—প্রথমে মাসিক, পরে পাক্ষিক। কাগজের মাধ্যমে আগে ও জনমত গড়ে তুলতে চায়। কাগজ চালাবার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে তুলবে একটা মহিলা সংগঠন। —এই সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবে মেয়েদের মধ্যে আনবে নবজাগরণ। এই ব্যাপারে ও আমার সাহায্য চাইছে।'

—আইডিয়াটা মন্দ নয়। কিন্তু ঝুঁকি যে অনেক।

টেবিলের ওপর তুটো কনুই-এর ভর রেখে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে সুতপা বলল, 'প্রথম শুরু করার সময় কোন্ কাজে ঝুঁকি নেই ?'

—সে কথা ঠিক .....তা হোলেও... মানে এ-ব্যাপারটায় বড্ড বেশী রিস্ক থেকে যাচ্ছে না ?

—আপনি তা হলে এ-ভাবে এগোতে বারণ করছেন ?

—কতকটা তা-ই।

'আমি বলছিলাম কি,'—ললিতা সোজা হয়ে বসে বলতে লাগল,—'সুতপা যদি শিউলীর হয়ে আমাদের সঙ্গে কাজ করতে থাকে এবং সেই সঙ্গে শিউলীরই একটা মহিলা শাখা গড়ার কাজে লেগে যায়, তা হলে সমস্ত জিনিষটাই সহজ এবং সুষ্ঠু হতে পারে। পরে মেয়েদের জন্য না হয় আর একটা কাগজ বের করা যাবে।'

আমি তাকালাম সুতপার দিকে, ও বল্ল, 'কিন্তু সে-ক্ষেত্রে আবার সেই পর-নির্ভরশীলতার প্রশ্ন এসে যাচ্ছে। এতকাল পুরুষের ওপর নির্ভর করে-করে পর-নির্ভরশীলতা তো মেয়েদের হাড়ে-মজ্জায় প্রবেশ করেছে, তারা তো এখন প্যারাসাইট ছাড়া কিছুই নয়, and I hate this parasitical tenacity। কাজেই ও-ভাবে শুরু করাতে আমার আপত্তি। নিজের পায়ে দাঁড়াতে না শিখলে কিচ্ছু হবে না।'

—কিন্তু যে দাঁড়াতে শেখেনি সে যদি কিছু একটা ধরে দাঁড়াতে চেষ্টা করে তা হলে কি সে ভুল করবে ?

—তা নয়। কিন্তু অবলম্বন ছাড়া চেষ্টা করাতেই-বা অন্যায়টা কোথায় ?

—ন্যায়-অন্যায়ের কথা বলছে কে ?

বুকের ওপর হাত তুটো আড়া-আড়ি করে রেখে বল্ল ললিতা, 'বায়াস না হয়ে এমনি ভেবে দেখ্ তো, কোনটা সহজ এবং সঠিক পথ।'

চুপ করে রইল সুতপা। একটু হেসে বল্লাম আমি, 'বেশ তো, কিছুদিন শিউলীর হয়ে কাজ করেই দেখুন না। শিউলীর ভাবধারা—কর্মপদ্ধতি ভাল লাগলে থাকবেন, ভাল না লাগলে আপনি আপনার পথে এগোবেন। আপনার প্রয়োজনে নিশ্চয়ই আমরা পাশে গিয়ে দাঁড়াব।'

একটুকাল ভাবল সুতপা, তারপর বল্ল, 'কথাটা মন্দ বলেননি। বেশ তাই হবে।'

ওর কথা শেষ না হতেই আনন্দে ছেলেমানুষের মত লাফিয়ে উঠল ললিতা। তু'হাতে সুতপার গলা জড়িয়ে ধরে বল্ল, 'সত্যি তুই আমায় বাঁচালি

স্নুতপা। তোকে এত কাছে পেয়েও আমাদের কাজের মধ্যে পাবনা এ-কথাটা ভাবতেই পারছিলাম না। তোর মত মেয়ে পাশে থাকবে, সত্যি তুই আমায় বাঁচালি।' স্নুতপার মুখ হাসিতে ভরে উঠল, এতক্ষণে যেন সহজভাবে হাসল ও। ভারি স্নুন্দর লাগল ওকে।

দুই বন্ধুর ভাবাবেগ স্পর্শ করল আমাকেও। একটা অনাস্বাদিত আনন্দে ভরে গেল আমার মন। মুগ্ধ চোখে তাকালাম ওদের দিকে। ওরা সহজ হলে জিজ্ঞাসা করলাম স্নুতপাকে, 'ডবসন-কাকার সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

—না। কোথায় বাইরে গেছেন।

—বাসিরহাট সেণ্টারে। —যোগ করল ললিতা।

—ওঁর সঙ্গে দেখা হলে আপনার এত কনফিউসন আর থাকবে না।

—দেখা যাক।

ঠোঁট জোড়া স্নুক্ষ্ম করে একটু হাসল স্নুতপা। ললিতা ঠোঁট টিপে হাসল, হাসলাম আমিও। ডবসন সাহেবের নামে একটা স্নিগ্ধ হাওয়া বইল যেন।

এক সময় উঠে পড়ল ওরা। ওদের সঙ্গে এগিয়ে গেলাম খানিকটা পথ। ওঁরা হেঁটে চলল পাশাপাশি, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। অদ্ভুত স্মার্ট মেয়েটি! —প্রতিটি পদক্ষেপে প্রকাশ পাচ্ছিল ওর মনের দৃঢ়তা। একবার দেখলে ভোলা যায় না মেয়েটিকে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করলাম ওর প্রতি।

ফিরবার পথে আমার চেতনায় স্নুতপার মুখখান ই ভেসে রইল। কিন্তু ওর কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে শিউলী রায়ের কথা ভাবতে শুরু করেছিলাম নিজেরই মনে নেই। এক সময় অবাক হয়ে দেখি মনের সমস্তটা জুড়ে বিরাজ করছে শিউলীর কাহিনী। জানি না, আমার অবচেতন মন শিউলীর সঙ্গে স্নুতপার কোন মিল খুঁজে পেয়েছিল কিনা। হয়তো শিউলীও সেদিন আজকের স্নুতপার মতই পুরুষ-শাসিত সমাজে নারীর অপমানের জ্বালায় এমনি করেই মনে মনে জ্বলছিল। শিউলীর সেদিনের সেই কথাটাই মনে পড়ছিল আমার। ডবসন সাহেবক বলেছিল সে 'মেয়েদের কথা ছেড়ে দাও আর্থার, মেয়েরা আসলে গোটা মানুষ নয়, আধা-মানুষ—মে: মানুষ।' কথ টা বলেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল শিউলী। কে জানে, হয়তো এই কথাটা ভাবতে গিয়েই মনটা ফিরে গিয়েছিল শিউলীর কাহিনীতে। আর সেই কাহিনীতে এলোমেলো ঘুরতে ঘুরতেই আবার সেই ফেলে-আসা ভাবনাতেই ফিরে গিয়েছিলাম। নেওড়ানদীর ধারে আর্থারের পাশে।

আট

ডবসন সাহেবের চা-বাগান থেকে আরও অনেক উত্তরে ছোট্ট সেই পাহাড়ী গ্রাম,—তে শিমলা। ঐ গ্রামের শেষ প্রান্ত থেকে পাহাড়টা হঠাৎ যেন বড় বেশী খাড়াই হয়ে উঠেছে। ঘন জঙ্গল সুরু হয়েছে ঐ গ্রামের সীমানা থেকেই। দূরে দূরে পাহাড়ের চূড়োগুলো মেঘের গায়ে হেলান দিয়ে থাকে। সকালের সোনালী রোদে ঝলমল করে ওঠে তারা। আবার শীতের সকালে কুয়াসার চাদর-মুড়ি দিয়ে আধো ঘুমের ভেতর স্বপ্ন দেখে। এমনি এক স্বপ্নময় পরিবেশে চুপ করে বসে ছিল আর্থার। সেই ছোট নদীর পারে বিরাট এক পাথরের ওপর দুই হাঁটুর ফাঁকে থুত্‌নি ডুবিয়ে বসে ছিল সে। দেখছিল সেই ছোট্ট সরু নদীর প্রবাহ-মানতা। স্বচ্ছ কাঁচের মত জল টলমল করছে। হাঁটুর নীচে জল, কিন্তু স্রোত আছে বেশ। চার পাশে ছড়িয়ে আছে ছোট-বড় অসংখ্য নুড়ি পাথর। সসঙ্কোচে বয়ে-যাওয়া ঐ ছোট্ট নদীটার দিকে চেয়ে চেয়ে বর্ষায় এর ভয়ঙ্করী রূপের কথা ভাবছিল আর্থার। তখন রূপময় এই রূপালী রেখা কোথায় যায় হারিয়ে। পরিবর্তে ময়লা-ঘোলা জল প্রচণ্ড বেগে দুকূল ভাসিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে তিস্তার কোলে, বড় বড় পাথরকে টেনে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দূরে দূরে। অথচ তার আজকের রূপের মধ্যে ভয়ঙ্করী সেই সম্ভাবনার রেখা এতটুকু চোখে পড়েনা। শান্ত রূপের আড়ালে অশান্তের এই অবস্থিতির কথা যতই ভাবছিল আর্থার ততই অবাক হচ্ছিল সে। খেয়ালী প্রকৃতির কথা ভাবতে ভাবতে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখছিল চারধার।

নদীর পারে সাদা কাশ ফুলের রাশি। পাহাড়ের পাশে-পাশে শাল-শিরিষ-দেবদারুর বন। এলো মেলো চারদিক কৃষ্ণচূড়া-শিমুল-পলাশের দল। নাম-না-জানা ছোট ছোট গাছের ঠাস বুনোট। চারিদিক যেন সবুজের এক মহোৎসব।

একটা নিশ্চিদ্র নিস্তব্ধতায় আচ্ছন্ন পরিবেশ। নিস্তব্ধতার মধ্যে যেন বুঁদ হয়ে আছে সমস্ত প্রকৃতি। পাখীর এলোমেলো ডাক, আর পাতার মর্মর ধ্বনি ছাড়া সাড়া নেই আর কিছুর। গোটা পরিবেশটাই যেন এক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন।

এমনি পরিবেশে একা একা বসে থাকতে ভারি ভাল লাগছিল আর্থারের। বসে বসে ভাবছিল সে নিজের কথা,—ইংলণ্ডের সেই দিনগুলোর কথা। ভাবতে

ভাবতে নিজের মধ্যে একেবারে তলিয়ে গিয়েছিল সে। নিজের চৌ[illegible] ভুলে গিয়েছিল একেবারে। কিন্তু হঠাৎ চিন্তায় ছেদ পড়েছিল আর্থারের। কোথা থেকে মহিলা কণ্ঠের এক তীব্র চিৎকার নিস্তব্ধ অরণ্যের বুকের ওপর আছড়ে পড়েছিল। ঘটনার আকস্মিকতায় চমকে উঠে সোজা দাঁড়িয়ে পড়েছিল সে। আর তখনই দেখতে পেয়েছিল সে-দৃশ্যটা।

অদূরে নদীর ধারে একটি পাহাড়ি মেয়ে মাটীর ওপর পড়ে কাতরাচ্ছে, আর তারই পাশে একটা পাহাড়ি যুবক দাঁড়িয়ে তখনও রাগে ফুঁসছে। একটুকাল চুপ করে দাঁড়িয়ে ঘটনাটা বুঝবার চেষ্টা করেছিল আর্থার। তারপরই সোজা ছুটে গিয়েছিল সেখানে। আর্থারকে দেখে কাতরাতে কাতরাতে একটা হাত বাড়িয়ে বলে উঠেছিল মেয়েটি, 'মুঝে বাঁচাও সাব্। উও আদমী মুঝে মারডালা' কথাটা বলেই উঠতে চেষ্টা করেছিল মেয়েটি কিন্তু পারেনি। যন্ত্রনায় একটা অস্ফুট শব্দ করে উঠেছিল। পাথরে লেগে মাথা কেটে গিয়েছিল ওর, রক্তে ভিজে গিয়েছিল কাপড়-জামা। যুবকটীকে এক পলকের জন্য দেখেই মেয়েটির দিকে এবার ছুটে গিয়েছিল আর্থার।

—ছুঁ মৎ সাব্, মাই ওয়াইফ। —রুখে দাঁড়িয়েছিল যুবকটী। কেমন একটু থমকে দাঁড়িয়েছিল আর্থার, পরক্ষণেই জলন্ত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে প্রশ্ন করেছিল, 'হু ডিড ইট? য়ূ?'

—হ্যাঁ। —এক পা সামনে এগিয়ে এসে বলেছিল,—

'ভেরি ব্যাড গার্ল সাব্, লাভ আদার ম্যান, হাম উসকো মার ডালেগা।'

ভুরু কুঁচকে কেমন এক সন্দেহের চোখে আর্থার চেয়েছিল মেয়েটির দিকে।

—ঝুট সাব, ঝুট বাত। —কান্না-জড়ান গলায় কথা ক'টা বলেই যন্ত্রনায় কাতরাতে শুরু করেছিল মেয়েটি!

আর দেরী করেনি আর্থার। সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে গিয়েছিল মেয়েটীর দিকে। কিন্তু সেই সঙ্গে ছুটে এসেছিল পাহাড়ি যুবকটীও। কোমর থেকে ছুরিখানা হাতে নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল সাহেবের দিকে, 'ছুঁ মৎ সাব্, আই কিল ইউ'। থমকে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল আর্থার। সামান্য একটু ভেবেছিল, তারপরই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যুবকটীর ওপর। ওর হাতের কব্জিতে প্রচণ্ড এ[illegible] মোচড় দিয়ে কেড়ে নিয়েছিল ছুরিখানা। যন্ত্রনায় আর্তনাদ করে উঠেছিল সে।

—এ্যাণ্ড নাউ?……য়ূ উইল কিল মি, ইজনট? য়ূ ডার্টি ক্রিচার। রাগে চোয়ালের দু'পাশটা শক্ত হয়ে উঠেছিল সাহেবের।

কথা ক'টা বলেই একটা ধাক্কা দিয়ে ওকে ঠেলে ফেলেছিল আর্থার। টাল

সামলাতে না পেরে ছিটকে গিয়ে বসে পড়েছিল যুবকটা। আর্থারও ফিরে তাকায়নি আর। এগিয়ে গিয়েছিল মেয়েটার দিকে। এতক্ষণে পূর্ণ দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখেছিল ওকে। বছর ষোলা-সতেরো বয়েস। ফর্সা রঙে কেমন শ্যামলা আমেজ, চোখে যেন একটু স্বপ্নের ছোঁয়া, তা'তে ভীতা হরিণীর শঙ্কা মাখানো। কপালের কিছু ওপরে কেটে রক্ত ঝরছে। হাত-পায়ের নানা জায়গায় ছড়ে গেছে। জামা কাপড় ছিড়ে গেছে। ধ্বস্তাধ্বস্তির ছাপ শরীরের সর্বত্র।

আর্থার কাছে যেতেই আকুল কণ্ঠে বলে উঠেছিল মেয়েটা, 'মুঝে বাঁচাও সাব।' স্থির দৃষ্টিতে মেয়েটার করুণ মুখখানার দিকে একটুকাল চেয়ে দেখেছিল সে। তারপর সস্নেহে নিজের রুমাল দিয়ে ওর পায়ের-মাথার রক্ত মুছে দিয়েছিল। সামান্য একটুকাল কি ভেবে মেয়েটাকে একেবারে কাঁধে তুলে নিয়েছিল আর্থার ডবসন।

দূরে অনেক দূরে দেখা যাচ্ছিল মস্ত একটা বিল্ডিং। নিঃশব্দে সেই দিকেই পা বাড়িয়েছিল আর্থার। আর তখনও তেমনি করেই মাটীতে বসেছিল সেই পাহাড়ি যুবক। ভয়ে বিস্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল সাহেবের কাজ। আর্থার কয়েক পা সামনে এগিয়েই ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। তখনও ছুরিখানা তার বাঁ হাতে ধরা। যুবকটাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল 'য়্ বয়! নাউ কাম এ্যালঙ।' আর দাঁড়ায়নি সে, পেছন ফিরেও তাকায়নি আর, হন হন করে সোজা এগিয়ে গিয়েছিল সামনের দিকে।

উঁচু-নীচু দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে সেই বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল আর্থার। বাড়িটার সামনে যে-ফুলের বাগান আসলে তারই সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল সে। বাগানটা পেরিয়ে মস্ত এক বারান্দা। সেই বারান্দার একধারে চোখ বুজে শুয়ে ছিলেন এক বৃদ্ধ। কেমন এক শান্ত-সৌম্য মূর্তি,— মাথায় ঘন সাদা চুল, পাকা দাড়ি-গোঁফে ঢাকা মুখ, পরনে ধুতি, গায়ে সাদা চাদর——সব মিলিয়ে কেমন যেন প্রশান্তির আমেজ। বাগানের বাইরে দাঁড়িয়ে আর্থার তখন হাঁপাচ্ছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটুকাল ভাবল সে। সেই বৃদ্ধকে ভাল করে দেখল, তারপর বাগানের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

কাঁধের ওপর শায়িতা এক পাহাড়ি যুবতী, গায়ে রক্তের দাগ, হাতে ছোরা— এমনি অবস্থায় হঠাৎ সেই বিদেশী মানুষটিকে দেখে প্রায় চমকে উঠেছিলেন বৃদ্ধ গৌরীনাথ রায়। কি করবেন তা' যেন স্থির করতে পারছিলেন না। তাঁর অবস্থাটা উপলব্ধি করেছিল আর্থার, তাই সংক্ষেপে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়েছিল সে। সেই সঙ্গে মেয়েটিও কাতরোক্তি করেছিল' 'জমিন্দারবাবু, এ-সাব্ মুঝে বাঁচায়া।'

ততক্ষণে ছুটে এসেছিল বাগানের মালি, ছুটে এসেছিল অন্যান্য চাকর বাকর। সমস্ত ব্যাপারটা অনুধাবন করে গৌরীনাথও চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। চাকরকে ডাক্তার ডাকতে বলেই তিনি ভেতরের দিকে ছুটেছিলেন মেয়ের খোঁজে। চিৎকার করে ডেকেছিলেন, 'শিউলী, মা, শিগগির একবার বাইরে আয়।'

আর্থার এবার অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে মেয়েটিকে বারান্দায় বসিয়ে দিয়েছিল। এতটা পথ মেয়েটিকে কাঁধে করে বয়ে আনার ফলে সমস্ত শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা হয়েছিল। শরীরের সেই ব্যথাটা মারবার জন্য খানিকটা পায়চারী করল সাহেব, হাত-পা ছুঁড়ল বার কয়েক, কোমরটা বেঁকিয়ে এ-পাশ ও-পাশ করল। সাহেবের ভাব-ভঙ্গি দেখে অত কষ্টেও হেসে ফেলল মেয়েটি, সেই সঙ্গে আর্থারও হাসল। হাসতে হাসতেই বার কয়েক লাফিয়ে কোমরটাকে একবার বেঁকিয়ে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল আর্থার।

আর ঠিক তখনই প্রায় ছুটতে ছুটতে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল শিউলী। আর্থারকে দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল সে, দু'জনে একেবারে মুখোমুখি। চোখাচোখি হতেই আর্থার কেমন একটু লজ্জিত-বিব্রত বোধ করেছিল, আর শিউলী হঠাৎ যেন কেমন অভিভূত হয়ে পড়েছিল।

সেই প্রথম দুজনের দুজনকে দেখা। দেখা তো নয় যেন একটা বিদ্যুৎ চমক। তবু পরস্পরের মনে পরস্পরের ছবি আঁকা হয়ে গিয়েছিল এক পলকেই। দোহারা-চেহারা। বছর বাইশ বয়সের শ্যামলা রঙের সেই মেয়ের পরনে ছিল সাদা শাড়ি, হাতে এক গাছা করে সোনার চুড়ি, আলতো করে বাঁধা খোঁপায় এক গুচ্ছ ফুল, গভীর চোখে কী এক অজানা রাজ্যের বিস্ময়। প্রথম-দেখা শিউলীর এই ছবিটি কোনোদিন ভুলতে পারেনি আর্থার। আর ছিপছিপে চেহারার দীর্ঘদেহী সাহেবটিকে হঠাৎ দেখে শিউলীর মনে হয়েছিল, যেন একটি খাপ-খোলা তলোয়ার।

একটুকাল দাঁড়িয়ে থেকেই নিজেকে সহজ করে নিয়েছিল শিউলী। ধীরে ধীরে গিয়ে বসেছিল সেই পাহাড়ি মেয়েটির পাশে। তার গায়ে-মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল ওর নাম। কেমন অভিভূত হয়ে কেঁদে ফেলেছিল মেয়েটি, নিজের নাম বলেছিল 'গোপা'। ধীরে ধীরে মেয়েটি নিজের জীবনের অনেক কথা বলেছিল, শিউলী মন দিয়ে শুনেছিল সব।

...বছর দুই হল বিয়ে হয়েছে। ওর স্বামী বাউণ্ডুলে, কোনো কাজ করে না, কোনো রোজগার নেই তার। এখানে-সেখানে গান গেয়ে আর বাঁশী

বাজিয়ে বেড়ায়। মাঝে-মধ্যে যা' দু'চারটে টাকা পায় তাই দিয়ে মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে। গোপার বাবা বহুবার বলেছে, সে যদি এমনি করে চলে, তবে মেয়েকে তার কাছে আর পাঠাবে না। কিন্তু কে শোনে তার কথা! গোপাও যে মাঝে মাঝে তাকে কিছু না বলেছে এমন নয়, কিন্তু যখনই সে কিছু বলছে তখনই হেসে সব কথা উড়িয়ে দিয়েছে ওর স্বামী। হেসে বৌকে পাশে বসিয়ে গান গেয়েছে, বাঁশী বাজিয়ে শুনিয়েছে! সেই বাঁশী শুনতে শুনতে কেমন কান্না পেয়েছে গোপার। আপনা হোতেই চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়েছে জল। ওর স্বামীই আবার নিজের হাতে মুছে দিয়েছে সে-জল। কিন্তু এমনি করে দিন চলে না, দানা পানি জোটেনা এমনি করে, ওদেরও চলল না!

ওদের চলার পথে ছেদ পড়ল। গোপার বাবা-কাকা এসে নিয়ে গেল ওদের মেয়েকে।—আর নয়, ওদের মেয়েকে আবার বিয়ে দেবে ওরা। প্রথমে সে যে একটু আপত্তি করেনি তা' নয় কিন্তু পরে সব মেনে নিয়েছিল। মনে হয়েছিল এই ভাল। ওর স্বামীর তরফ থেকেও কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যায়নি। কিন্তু সেই সকালেই ঘটল এক অঘটন। সকালে একা যখন সে ঝর্ণার জল আনতে গিয়েছিল, তখন কোথা থেকে হঠাৎ ছুটে এসেছিল ওর স্বামী, এসেই ওকে কাঁধে তুলে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল। ভয়ে চিৎকারও করতে পারেনি গোপা। একথা যদি একবারও ওর বাবা টের পায় তবে ওর স্বামীকে একেবারে মেরেই ফেলবে। তাই ওর সঙ্গে পালাতেও রাজী হয়নি সে, আর তাইতেই ঘটল বিপত্তি। কিছুটা পথ এসেই যখন বেঁকে বসল গোপা তখনই শুরু হল ধ্বস্তাধ্বস্তি, রেগেগিয়ে ওকে মেরেই বসল ওর স্বামী। এইটুকু বলেই থামল গোপা।

শিউলী তুলো দিয়ে আস্তে আস্তে ওর মাথার রক্ত মুছে দিচ্ছিল। গোপা থামতেই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তোর বর যদি কাজ করে তাহলে তুই ওর কাছে থাকবি?' মেয়েটী প্রথমে কথা বলতে পারল না, অবাক চোখে চেয়ে রইল শিউলীর মুখের দিকে। তারপর হঠাৎ শিউলীর একটা হাত ধরে বলল, 'তু উকে একটা কাম দিবি?' চোখ দুটো কেমন জলে ভরে এসেছিল ওর।

শিউলীর উত্তর দেবার আগেই ডাক্তার বাবু এসে পড়েছিলেন। পায়ের ব্যথা জায়গাটা পরীক্ষা করে দেখেছিলেন তিনি—ভাঙেনি কোথাও, কেটে-ছড়ে গেছে। পায়ে-মাথায় ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েছিলেন। ওষুধ দিয়ে এক সময় চলেও গিয়েছিলেন ডাক্তার বাবু।

আর্থার এতক্ষণ চুপ করে বসে দেখছিল সব। আর মনে মনে চেষ্টা করে দেখছিল, শিউলী আর গোপার মধ্যে যে কথা হচ্ছিল তার কোনো অর্থ উদ্ঘাটন করতে পারে কিনা। কিন্তু মনে মনে অনেক চেষ্টা করেও ওদের কথাবার্তার কোনো অর্থ খুঁজে পায়নি। তবু তার মন যেন কি করে এইটুকু বুঝতে পেরেছিল, ওদের কথাবার্তা সেই লোকটাকে কেন্দ্র করেই ঘুরছে যে লোকটা ঐ মেয়েটাকে খুন করতে চেয়েছিল। তাই ডাক্তার বাবু চলে যেতেই ওর কৌতূহলটা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। ইংরেজীতে প্রশ্ন করেছিল গৌরীনাথকে, বুঝতে চেয়েছিল সমস্ত ব্যাপারটা। গৌরীনাথ ইংরেজীতে তর্জমা করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন সব কিছু। সব শুনে অবাক হয়েছিল আর্থার, চোখ বড় বড় করে দুটো হাত ওপরে তুলে একটা বিশেষ ভঙ্গি করে বলেছিল, 'মাই গুডনেস হি ইজ এ্যান আর্টিস্ট!' একটু থেমে আবার বলেছিল, 'এ্যাণ্ড হি ওয়ান্টেড টু কিল হার? স্ট্রেঞ্জ!' বড় বড় চোখ করে দুহাত নেড়ে ওর কথা বলার ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল শিউলী। হেসেছিলেন গৌরীনাথও।

ওদের কথাবার্তার মাঝে ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত হয়েছিল সেই পাহাড়ি যুবক। কেমন একটা আতঙ্কের ছাপ ওর চোখে-মুখে।

—মুঝে বাঁচাও, সাব! —ছুটে এসে প্রায় কাঁদ-কাঁদ ভাবে সাহেবের হাত দুটো চেপে ধরেছিল সে।

ওর পিছু পিছু ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হয়েছিল আরও চার-পাঁচ জন লোক। ওদের দেখে আঁতকে উঠেছিল মেয়েটি। অস্ফুট স্বরে বলেছিল, 'বাবা'। যুবকটা ভয়ে কেমন বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কেউ কিছু বলবার আগেই বুড়ো গোছের লোকটা, গোপার বাবা, ছুটে এসেছিল সাহেবের সামনে! সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ-ভয়ে আর্থারের পেছনে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল যুবকটি। বুড়ো লোকটার একটা হাত চেপে ধরেছিল আর্থার। বুড়ো মানুষটা তখন রাগে থর থর করে কাঁপছে, সাহেবের হাতে একটা ঝটকা মেরে বলেছিল 'ছোড় দিজিয়ে সাব, উসকো হম মার ডালেগা।' হঠাৎ আর্থারেরও মেজাজটা কেমন চড়ে গিয়েছিল, সে-ও চিৎকার করে উঠেছিল,' হোয়াট! যূ উইল মার্ডার হিম? ননসেন্স!'

আর্থারের সেই চিৎকার শুনে একটু থমকে দাঁড়িয়েছিল সেই বৃদ্ধ। একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল সে, চারদিকটা ভাল করে একবার দেখে নিয়েছিল। এই প্রথম যেন স্থান-কাল-পাত্রের গুরুত্বটা উপলব্ধি করতে পারল। এই প্রথম জমিদার গৌরীনাথকে দেখতে পেল, আর সেই সঙ্গে দেখতে পেয়েছিল তার

মেয়ে গোপাকে। মেয়েকে দেখতে পেয়েই ছুটে গিয়ে প্রায় জড়িয়ে ধরেছিল তাকে। মেয়েকে জড়িয়ে ধরেই বৃদ্ধের সে কি কান্না! গোপার চোখেও তখন জলের বন্যা নেমেছে! গৌরীনাথ বৃদ্ধের কাছে গিয়ে ওর কাঁধের ওপর একটা হাত রেখেছিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধ তাঁর পা দুটো জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, 'তু বিচার কর জমিন্দার বাবু তু বিচার কর।'

—শুনব বৈকি, তোদের সব কথা শুনব। —শান্ত কণ্ঠে বলেছিলেন.গৌরী-নাথ। —'কিন্তু তার আগে তোরা জিরিয়ে নে, রাগের মাথায় তো কিছু করা যায় না।'

তারপর গৌরীনাথকে ঘিরে বসেছিল সবাই। গৌরীনাথের এক পাশে আর্থার। আর্থারকে ঘেঁষে বসেছিল সেই যুবক। গোপার বাবার সমস্ত কথা শুনেছিলেন গৌরীনাথ। শুনে ইংরেজীতে. তর্জমা করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন আর্থারকে। সব শুনে জিজ্ঞাসা করেছিলেন গৌরীনাথ, বৃদ্ধের মত কি, সে এখন কি করতে চায়।

বৃদ্ধের এক উত্তর, তার মেয়েকে সে আবার বিয়ে দেবে, এই-জানোয়ারকে সে জামাই বলে স্বীকার করে না।

—কিন্তু তা'তো হয়না! —শান্ত ভাবে বলেন গৌরীনাথ, 'ছেলে খারাপ হলে তাকে কি অস্বীকার করা যায়? জামাইও ছেলের মত।'

বুড়ো গোঁ ছাড়ে না। 'কিন্তু মেয়ে কি বলে?' —প্রশ্ন তোলেন গৌরীনাথ।

মেয়ে আবার কি বলবে, তার মতামতের কি মূল্য আছে? বাপ-খুড়োর যা মত মেয়েরও তাই মত। বৃদ্ধের মন্তব্য।

তবু তো মেয়ের মতটা জানা উচিত। —কথাটা শেষ করেই গোপাকে প্রশ্ন করেন গৌরীনাথ, 'কি-রে ও-ছেলে যদি ভাল ভাবে কাজ-কর্ম করে থাকবি ওর কাছে?'

গোপা একটুকাল চুপ করে রইল, তারপর আস্তে ঘাড কাৎ করল, থাকবে সে। এমন উত্তরের পর সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সেই যুবকটির ওপর, ওর কিন্তু তখন আর কোনো দিকে দৃষ্টি নেই, আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়েছে সে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে জলে ভরে এসেছে দুটো চোখ, থর থর করে কাঁপছে ঠোঁট। বৃদ্ধ কিন্তু হতবাক। এ উত্তর সে আশাই করেনি, তবু মরিয়া হয়ে বলল 'উটাকে কাম দিবে কে?'

—হোয়াই, আই শ্যাল এ্যারেঞ্জ।—সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করেছিল আর্থার।

কেমন করে কে জানে, ওদের কথা-বার্তার তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিল সে, আর তাই তার অজান্তেই উত্তরটা বেরিয়ে গিয়েছিল ওর মুখ থেকে।

আর্থারের উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে সবাই চোখ ফিরিয়েছিল তার দিকে, চেয়েছিল শিউলীও। কেমন এক তৃপ্তির হাসি শিউলীর চোখে। সেদিন সেই মুহূর্তে ঐ চোখ জোড়া যেন বলতে চেয়েছিল, এমন একটা কিছু আছে এই বিদেশীর মধ্যে যা' মানুষকে কাছে টানে, দূরের মানুষকে আপন করে।

যুবকটি সাহেবের হাত চেপে ধরেছিল, ধরা-গলায় বলেছিল, এবার থেকে সে ভাল হয়ে যাবে। কথা শুনে হা-হা করে হেসে উঠেছিল সাহেব। তারপর ওর হাত দুটো নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে কেমন এক গভীর স্বরে ইংরেজীতেই বলেছিল, 'তুমি হলে আর্টিস্ট, তুমি গান গাইবে, যত খুশী গান গাইবে কেউ তোমায় বারণ করবে না।'

সাহেবের কথা পুরো বোঝেনি ওরা, তবু সবাই কেমন অভিভূত হয়ে পড়েছিল, অভিভূত হয়েছিল সাহেব নিজেও।

এরপর খুশীমনে চলে গিয়েছিল সবাই, বসেছিল কেবল আর্থার, শিউলী আর গৌরীনাথ। নতুন করে আলাপ শুরু হয়েছিল আবার, কিছুক্ষণের মধ্যেই আর্থার ওদের অনেক কাছে এসে গিয়েছিল, কেমন চেনা-চেনা আপনজন বলে মনে হয়েছিল ওদের। আর্থার তার নিজের জীবনের নিঃসঙ্গ-তার ছায়া দেখতে পেয়েছিল ওদের মধ্যেও। ধীরে ধীরে ওদের পরিচয় গাঢ় হল, গভীর থেকে গভীরতর হল ক্রমশ।

আরও দু'একদিন ওদের ওখানে এসেছিল আর্থার, এসে গল্পগুজব করে চলেগেছে। কিন্তু তখনো জানতে পারেনি যে, ঐ বাড়িরই ছেলে শুভময়। সেদিন ওদের ওখানে শুভময়কে দেখে কেমন অবাক হয়ে গিয়েছিল আর্থার, একটু যেন চমকেও উঠেছিল সে।

ক'দিন পর কোথা থেকে যেন ফিরছিল শুভময়,—মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, উস্কোখুস্কো চুল, পরনের জামা কাপড়ে ময়লার ছোপ, সঙ্গে সেই একান্ত সঙ্গী সাইকেলখানা। আর্থার, গৌরীনাথ আর শিউলী বারান্দায় বসে গল্প করছিল তখন। এমন সময় শুভময়কে আসতে দেখে আনন্দে শিশুর মত চঞ্চল হয়ে উঠেছিল শিউলী, বাগানের গেট পর্যন্ত ছুটে গিয়েছিল সে। আনন্দের আমেজ দেখা গিয়েছিল শুভময়ের মুখেও। একগাল হেসেছিল সে। কিন্তু পরক্ষণেই ওর চোখ পড়েছিল আর্থারের ওপর, সঙ্গে সঙ্গেই গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। এক মুহূর্তে ওর চোখ থেকে যেন আগুনের হল্কা বেরিয়ে

এসেছিল। শুভময়ের পরিবর্তনটা স্পর্শ করেছিল শিউলীকেও। একটু গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল সেও। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে দুজনে কথা হয়েছিল একটুকাল। তারপর শুভময় সোজা গিয়ে বসেছিল আর্থারের পাশে। কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করেছিল আর্থার।

—চিনতে পারছেন ?—আর্থারকে প্রশ্ন করেছিল শুভময়।

—নিশ্চয়ই পারছি। —সহজ সুরেই উত্তর দিয়েছিল সে।

- কিন্তু আপনি হঠাং এখানে ?—শুভময়ের স্বরে সন্দেহের কশাঘাত।

—ভবিতব্য বলতে পারেন।—মুচকি হেসেছিল আর্থার।

—তার মানে ?

—সে এক মজার ব্যাপার। বৃদ্ধ গৌরীনাথ হেসে কথা কটা বলে সোজা হয়ে বসেছিলেন এবার। তারপর ধীরে ধীরে সেদিনের ঘটনার বিবরণ দিয়েছিলেন তিনি। সব কথা শুনে অনেকটা সহজ হয়েছিল শুভময়। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল সে। স্বস্তি বোধ করেছিল আর্থারও।

এর অনেক দিন পর। দু'জনে চলেছিল দুই সাইকেলে—আর্থার আর শুভময়। পাশাপাশি। এর আগেও এমনি করে গ্রামের নানা জায়গায় গেছে ওরা, গ্রামের সাধারণ মানুষের দুর্দিনে শুভময়দের সঙ্ঘের আর পাঁচজনের সঙ্গে আর্থারও কাজ করেছে। সেবার ওদিকটায় যখন বসন্তের মহামারী দেখা দিয়েছিল, শুভময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সেবার কাজে সে-ও থাকত সারাক্ষণ। প্রতিদিন পাশাপাশি সাইকেলে দশ-বারো মাইল পথ অতিক্রম করত, তবু ক্লান্তি আসেনি কখনও। শরতের সেই সকালে এমনি করেই পথ চলেছিল ওরা। প্রথমদিন যেখানে ওদের দেখা হয়েছিল সেখানটায় আসতেই শুভময় হঠাং হাসতে হাসতে বলেছিল, 'আর্থার, সেদিন তোকে কি মনে হয়েছিল জানিস ?'

—কি আর, একটা বোম্বেটে ইংরেজ। একটু হেসে জবাব দিয়েছিল আর্থার। ওর মুখে তখন স্পষ্ট বাংলা। নির্ভুল উচ্চারণ।

— মোটেই না। মনে হয়েছিল ঝানু স্পাই।

—আর এখন কি মনে হচ্ছে, হাঁদা-গবেট ?

—উঁ-হু। মনে হচ্ছে, তুই দৈত্য-কুলে প্রহ্লাদ।

—থ্যাটস রঙ্। — কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়েছিল আর্থার।

একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই বলল, 'দৈত্যকুলে বলছিস কেন ? আমার ঠাকুরদার মত ইংরেজ দেখিসনি, তাই এ কথা বলতে পারলি।'

—সে-তো গেল এক্সসেপসন। এবং এক্সসেপসন সব সময়ই থাকে। কিন্তু সাধারণ অবস্থাটা কি এই? সবচেয়ে বড় কথা, জেনারেল ডায়ারের মত কুখ্যাত লোকের সমর্থক কি এখনও ও-দেশে নেই?

—কে বলেছে তোকে? লণ্ডনের কিছু উগ্র লোকের সমর্থন মানেই কি গোটা বৃটেনের সমর্থন? আসলে কি জানিস, ভালো-মন্দ সব দেশেই আছে। ডেভিড হেয়ার ও-দেশেই জন্মে ছিলেন, বেথুন-এ্যানড্রুজ ওখানকারই লোক।

'আর'—ঠোঁট সূক্ষ্ম করে এবার একটু হেসেছিল শুভময়—'আর আর্থার ডবসনের মত লোক টেমসের কূলেই জন্মায় সেটাই বা ভুলি কি করে?'

এবার হো হো করে হেসে উঠেছিল আর্থার, সেই সঙ্গে সুভময়।

গৌরীনাথের কাছে আর্থার ছিল তার ছেলের মত। প্রতিদিন আসত সে, গৌরীনাথের পাশে বসে শুনত তাঁর অতীত দিনের কাহিনী। কথায় কথায় একদিন বলেছিলেন তিনি, 'বুঝলে আর্থার, আমি তো কলকাতায় বসে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা নিলাম, ব্যস্, বাবাও পত্রপাঠ সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। বুঝলে, প্রথমে বড় অভিমান হল, পরে জেদ চেপে বসল—কখনও আর এ-মুখো হইনি তাই।'

বৃদ্ধের গলাটা কেমন ধরে এসেছিল, একটু থেমে বলেছিলেন তিনি, 'কিন্তু শেষ বয়েসে, বাবা যেন কেমন হয়ে গেলেন।' কথা বলতে বলতে হঠাৎ একেবারে চুপ করে গিয়েছিলেন গৌরীনাথ। অতীত দিনগুলোতে ডুবে গিয়েছিলেন তিনি।

পুরনো সেই সব-দিন। কলকাতায় কলেজে পড়তে গিয়েছিলেন গৌরীনাথ। পড়া শেষ করে আইনের ডিগ্রী কাঁধে নিয়ে ঢুকলেন গিয়ে কোর্টে। ধীরে ধীরে পসার জমে উঠল বেশ। আর তখনই তাঁর জীবনে এক বিপ্লব ঘটে গেল। ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত শুরু করলেন তিনি। ব্রাহ্ম সমাজে তখন দুই ভাগ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব তখন ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসছে। এমন সময় আনন্দমোহন বসু এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে পরিচিত হলেন গৌরীনাথ। পাণ্ডিত্যের এক নতুন জগৎ খুলে গেল তাঁর সামনে। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন পাণ্ডিত্যের দুই জ্যোতিষ্কের দিকে, বিস্ময়-বিমুগ্ধ গৌরীনাথ তাঁদের অনুসৃত পথই নিজের পথ বলে মনে করলেন। পুরাতনের খোলস ঝেড়ে ফেল্লেন, নতুন ধর্মে দীক্ষা নিলেন তিনি।

কথাটা পিতা মহাদেব রায়ের কানে গিয়েও পৌছল। প্রথমে তিনি বিশ্বাসই করতে পারলেন না কথাটা। ভাবলেন, তাঁর মত গোঁড়া হিন্দুর ছেলে এ-কাজ করতেই পারেনা, কিন্তু পুত্রের চিঠি পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। দোর্দণ্ড-প্রতাপ জমিদার মহাদেব রায়। দোর-গোড়ায় হাতি বাঁধা, দেহে অপরিমিত শক্তি,—এই বুড়ো বয়েসেও লাঠি খেলেন, কুস্তি করেন। এ-হেন ব্যক্তি চিঠিটা পেয়ে যেন সব শক্তি হারিয়ে ফেললেন। কিন্তু না. মচকালেন না তিনি। পুত্রকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলেন,—বিধর্মী-পুত্রের সঙ্গে তাঁর আর কোন সম্পর্ক নেই। ব্যস্। পিতার কাছ থেকে আর কোনো সাড়া নেই। এরপর গৌরীনাথও ও-মুখো হননি কখনও। কলকাতাতেই রয়ে গেলেন, বিয়ে করলেন ব্রাহ্ম সমাজের এক শিক্ষিতা মেয়েকে। যথা সময়ে একটি ছেলে আর একটি মেয়েও হল, কিন্তু সংসার জীবনে সুখী হতে পারলেন না তিনি। অল্প কালের মধ্যেই স্ত্রী মারা গেলেন, চারদিকটা কেমন অন্ধকার হয়ে গেল। কিছুই আর ভাল লাগতনা। একা-একা বসে ব্রহ্ম-সঙ্গীত গাইতেন, আর দু' চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ত।

একদিন এমনি করে বসে আছেন, তিন-বছরের মেয়ে শিউলী কোথা থেকে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল তাঁকে, মেয়ের চোখে তখন জল টলটল করছে। এক লহমায় সব যেন কেমন ওলট-পালট হয়ে গেল তাঁর, মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। ভাবলেন, তাইতো, ছেলে-মেয়েকে এমন করে অবহেলা করছি কোন প্রাণে? এদের অবহেলা করে কি সেই পরম-পিতাকে পাওয়া যায়? এরপর থেকেই সমস্ত প্রাণ-মন ঢেলে দিলেন ঐ দুটি শিশুর মধ্যে। ওদের মধ্যেই যেন খুঁজে পেলেন পরমেশ্বরের অস্তিত্ব।

ছেলে-মেয়ে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠল। ছেলে পাস করল প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে, আর মেয়ে বেথুন কলেজ। এই দীর্ঘদিনের মধ্যে পিতার কাছ থেকে আর কোনো সাড়া পাননি। এতদিন নিজের জেদে বেশ অটল ছিলেন মহাদেব রায়, কিন্তু শেষ বয়েসে তিনি যেন আর পারলেন না, কেমন ভেঙে পড়লেন।

এইটুকু বলে চুপ করে গিয়েছিলেন গৌরীনাথ। অনেকক্ষণ পর আস্তে আস্তে বলেছিলেন, বুঝলে আর্থার, ধর্ম জিনিসটা বড়ই গোলমেলে। মাঝে মঝে ধর্ম অর্থাৎ রিলিজিয়ন মানুষের মনকে বিকল করে দেয়, মানুষকে একটা ঘোরের মধ্যে টেনে আনে, মানুষকে মানুষের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।'

একটু ইতস্তত করে বলল আর্থার, 'ধর্ম মানুষকে একটা ঘোরের মধ্যে টেনে আনে মানে? ধর্ম কি মানুষের কাছে একটা নেশার মত?'

কেমন যেন ম্লান হাসি হাসলেন গৌরীনাথ। একটু থেমে বল্লেন, 'ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানে এই যে লড়াই দেখছো, এর মধ্যে ঈশ্বরকে নিয়ে ক'জন মাথা ঘামাচ্ছে ? এরা তো ঘোর-লাগা মানুষের মত একদল আর একদলের দিকে ছুটে চলেছে। এর পরিণতি কি কখনও ভাল হতে পারে ? নেশা-গ্রস্ত মানুষের পক্ষে কোনো কিছু করাই অসম্ভব নয়।'

গৌরীনাথ অনেকক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে ছিলেন গাছ গাছালির ফাঁকে দেখা দূরে পাহাড়ের দিকে, আর আর্থার তাকিয়েছিল তাঁর মুখের দিকে। ধীরে ধীরে বৃদ্ধের মুখ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছিল, অন্তরের কি এক আলো যেন প্রকাশ হয়ে পড়ছিল তাঁর চোখে, কেমন যেন নিজের মধ্যে ডুবে গিয়েছিলেন তিনি। আর্থার তার সামনে যেন এক জ্যোতির্ময় রূপকে বসে থাকতে দেখছিল।

আর্থারের দিকে চোখ ফিরিয়ে এক সময় বলেছিলেন তিনি, 'ঈশ্বর মানুষের অন্তরের বস্তু, এই উপলব্ধি একান্ত ব্যক্তিগত। ধর্মের অনুশাসন এই ব্যক্তিগত অনুভূতিতে কেমন এক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। আবার এই বিভ্রান্তি থেকেই শেষ পর্যন্ত আসে সামাজিক বিপর্যয়। মাঝে মাঝে কি মনে হয় জান ? মনে হয়, এই ধর্মই মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

আর্থার একটু ইতস্ততঃ করে বলল 'কিন্তু যে কোনো রিলিজিয়ন তো আসলে সাধনার এক বিশেষ পথের সন্ধান দেয়।'

—ঠিক তাই। আর তাই আমার ধারণা, যে কোনো মানুষ তার সুবিধে মত যে কোন পথ গ্রহণ করতে পারে, এর মধ্যে বংশগত কোনো ধারা আসতে পারে না। হিন্দুর ছেলে মুসলমান হতে পারে মুসলমানের ছেলে খ্রীশ্চিয়ান এবং এই তিন জন একই সঙ্গে একই পরিবারে বাস করতে পারে, তাতে কোনো বাধা আসা উচিত নয়। যতদিন সমাজে ধর্ম সম্বন্ধে উদারতা প্রকাশ না পাবে ততদিন রিলিজিয়ন মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশে বাধা হয়েই থাকবে, স্বার্থান্বেষী মানুষের হাতে সে হবে স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্র।'

আরও কত কথা বলতেন গৌরীনাথ। কাজের ফাঁকে ফাঁকে এক একদিন সেই সব কথা বলেন ডবসন কাকা। বলেন শুভময়ের কথা।

শিউলী, শুভময় আর আর্থার—তিনজন গোল হয়ে বসে গল্প করছিল।' অন্যদিনের মত চা খেতে খেতেই গল্প চলছিল। কথায় কথায় কেমন তন্ময় হয়ে এক সময় বলেছিল শুভময়, 'স্বা-ধী-ন-তা! কি সুন্দর কথাটা!' শব্দটা বার বার উচ্চারণ করেছিল। যেন এমনি করেই স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ

করছিল। তারপর হঠাতই যেন একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। আর্থারের দিকে সোজা চেয়ে বলেছিল, 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ইজ আওয়ার বার্থ রাইট, বাট দি ইংলিশ দি স্কাউণ্ড্রেলস ডিপ্রাইভ আস। এ্যাণ্ড উই মাস্ট হ্যাভ ইট্। স্বাধীনতা আমাদের চাই-ই চাই।'

ওর কথায় আর্থার একটু মুচকি হেসেছিল, হেসে বলেছিল, 'ইংরেজের কথায় এত উত্তেজিত হয়ে পড়িস যে মনে হয়, ইংরেজ মাত্রই অমানুষ।'

একটু সহজ হয়ে বলেছিল শুভময়, 'আমার জায়গায় তুই থাকলে তুই-ও এই কথাই বলতিস। পরাধীনতার যে কি জ্বালা, তুই তা কিছুতেই বুঝবিনা, হাজার চেষ্টা করলেও না। পরাধীন দেশে না জন্মালে এ-জ্বালা বোঝা যায় না। সব সময় আমার কি মনে হয় জানিস? মনে হয়, বুট শুদ্ধ একটা পা যেন সারাক্ষণ আমার মাথায় চেপে রয়েছে! এ অসহ্য।'

এই প্রসঙ্গে কলেজ জীবনের একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করেছিল শুভময়। সেটা উনিশ-শো-চৌদ্দ সাল। শুভময় পড়ছে প্রেসিডেন্সীতে। উড়িষ্যা থেকে এক প্রবাসী বাঙালী ছেলে নতুন ভরতি হয়েছে ঐ কলেজে, অল্প দিনেই বেশ নাম করেছে সে। একটা দলও গড়ে তুলেছে। শুভময়ের জুনিয়র, নাম সুভাষ বোস। একটু একটু করে শুভময়ও ঐ দলে ভিড়ে গেল। ছুটির পর গোল হয়ে বসত সবাই। নানা বিষয়েই আলোচনা চলত। তা' হলেও মূল বিষয় ছিল আধ্যাত্মিকতা। ওদের তখন দৃঢ় বিশ্বাস, শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন সংগঠন গড়তে পারলেই দেশের উন্নতি হবে। জীবনে আধ্যাত্মিকতা বোধ না এলে কিছুই হবেনা। শুভময় যেন কেমন ঝিমিয়ে পড়তে লাগল।

এ-সব নিয়ে মাতামাতি তার মোটেও ভাল লাগছিল না, তবু ঐ রোগাটে ছেলেটির আকর্ষণ কিছুতেই এড়াতে পারত না। কি একটা ছিল ওর চোখে, শুভময়ের মনে হতো অনেক বড় হবে, অনেক কিছু করবে সে। স্বাধীনতার লড়াইয়ে কিছু একটা না করতে পারলে শুভময়ের চলছিল না, ওর রক্ত যেন টগবগ করে ফুটত সারাক্ষণ। কিন্তু কি করবে তা' ভেবেও পাচ্ছিল না, এমন সময় ঘটল সেই অঘটন।

রোজকার মত সেদিনও ট্রামেই চলেছিল সে। ওর ঠিক পেছনের সীটে বসে ছিল এক ইংরেজ যুবক, কথা সেই বার্তা নেই হঠাৎ সে বুটসহ একটা পা তুলে দিল সামনের সীটের ওপর। এক মুহূর্তে শুভময়ের সমস্ত রক্ত মাথায় গিয়ে উঠল, চোখ দিয়ে আগুনের ফুলকি ছুটে এল ওর। বিদ্যুৎবেগে উঠে চেপে ধরল সাহেবের জামার কলার, আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুষির পর ঘুষি সাহেবের মুখে। ট্রামশুদ্ধ

লোক অবাক, ভয়ে সাহেবও কেঁচো, ক্ষমা চাইতে পথ পায়না। সেই দিনই সুভাষের দল ছেড়ে দিয়েছিল শুভময়, সুভাষকে বলেছিল, 'সুভাষ এ-ভাবে কিছু হবে না, নতুন দল গড়ে তোল, এমন দল যা শাসক গোষ্ঠীর মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারে।'

ভারতের রাজনীতির 'ছোটদাদা'র প্রভাবে তখন প্রভাবিত শুভময়। বড়দা হলেন লোকমান্য তিলক আর ছোড়দা অরবিন্দ ঘোষ। অরবিন্দর 'আর্য' পত্রিকা তখন তার মনের মুকুর, তার চিঠিপত্র ও শক্তির উৎস। ওর মনের ভেতর ধ্বনিত হত অরবিন্দের বাণী, 'আমি চাই, তোমরা বড় হয়ে ওঠো, তোমাদের নিজেদের স্বার্থের জন্য নয়, স্বদেশের জন্য। তোমাদের কাজের মধ্যে দিয়েই দেশের উন্নতি, তোমাদের বেদনাতেই দেশের মুক্তি।' ওর মনে বারবার একটা কথাই ঘুরে ফিরে আসতো, 'তোমাদের বেদনাতেই দেশের মুক্তি।'

একদিন হঠাৎ শুভময়ের সঙ্গে একটি ছেলের পরিচয়, আসলে সেই ছেলেটিই ওর সঙ্গে যেচে আলাপ করেছিল। সে-ই একদিন নিয়ে গিয়েছিল নতুন এক আড্ডায়, সেখানে যেতেই ওর সামনে নতুন এক জগত খুলে গিয়েছিল! রোজ যেতে যেতে একদিন বুঝেছিল, এমনি একটা দলের সন্ধানই এতদিন সে করেছে। ঐ দলে একদিন নতুন ব্রতে দীক্ষা নিয়েছে সে—ওখানেই ধীরে ধীরে গুলি ছুঁড়তে শিখেছে, হাত বোমা তৈরী করতে শিখেছে—ঐ দলে গিয়ে তার যেন জন্মান্তর ঘটে গিয়েছিল।

এসব কথা কিন্তু আর্থারকে কোনদিন বলেনি শুভময়, অনেকদিন পর শিউলীর কাছে আর্থার শুনেছে এসব কথা। সে যাই হোক, বাইরের সব কিছু বেশ স্বাভাবিক ভাবেই চলছিল। হঠাৎ কেমন যেন ছন্দপতন ঘটল। একদিন সকালে পুলিশ এসে গৌরীনাথের বাড়ি খানাতল্লাসী করল, কিছু পেল না, কিন্তু ধরে নিয়ে গেল শুভময়কে। প্রমানের অভাবে সে যাত্রা ছাড়াও পেল শুভময়। গৌরীনাথ কিন্তু চঞ্চল হলেন। ছেলের গতিবিধি সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠলেন তিনি। এক লহমায় যেন অনেক কিছু বুঝে ফেল্লেন, ছেলের জন্য যেমন একটু গর্ব বোধ করলেন, সেই সঙ্গে ভয়ে বুকটাও কেঁপে উঠল তাঁর।—এর পরিণতি তো ভাল নয়, ভাবলেন তিনি। ছেলেকে কলকাতা থেকে সরাতে চাইলেন। ঠিক সেই সময় সুযোগও মিলে গেল।

বৃদ্ধ জমিদার মহাদেব রায় তখন শয্যাশায়ী—চিঠির পর চিঠি দিয়ে ডাকছেন অভিমানী পুত্রকে। শেষের একখানা চিঠিতে লিখলেন মহাদেব রায়, 'ওরে, এই বুড়ো বাপের ওপর আর কতকাল রাগ করে থাকবি? আমি আমার ভুল বুঝতে

পেরেছি। আজ আমার জীবনের সূর্য অস্তাচলে ঢলে পড়েছে, কিন্তু এক নতুন সূর্যের উদয় দেখতে পাচ্ছি আমি, জীবনের নতুন অর্থ প্রকাশ হয়ে পড়েছে আমার সামনে, - সৌন্দর্যের শান্তির এই নতুন জগৎ যে এক অখণ্ড শক্তির প্রকাশ এ-কথা আজ উপলব্ধি করতে পেরেছি। সেদিন ধর্মকে মানুষের উর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলাম, তাই ঠকেছি। ধর্মের খোলসটা আজ আমি ছেড়ে ফেলেছি, এখন আমি কেবল হিন্দু নয়, একজন মানুষ। পিতা-পুত্রে মিলতে তাই আজ আর কোনো বাধা নেই। ওরে বোকা ছেলে, আর অভিনান করে থাকিস না।'

চিঠি পড়ে গৌরীনাথের চোখে জলের বন্যা নেমে এসেছিল। বাবার কাছে ছুটে যাবার জন্য মনটা তার ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। আর দেরী সইছিল না তাঁর। তিনি ছুটেছিলেন নেওড়া নদীর ধারের সেই ছোট্ট গ্রামের দিকে, পুত্র-কন্যাকেও নিলেন সঙ্গে। প্রথমে ভেবে ছিলেন শুভময় হয়তো রাজী হবে না, কিন্তু না, এক কথাতেই রাজী হয়ে গেল শুভময়। তার কারণও ছিল একটা, সে কারণটা অবশ্য জানতেন না গৌরীনাথ।

শুভময়দের দল কিছুদিন ধরে উত্তরবঙ্গে একটা ঘাঁটি রচনার কথা ভাবছিল, কিন্তু ঠিক সুযোগ সুবিধে যেন হয়ে উঠছিল না। সেই সুযোগ মিলে গেল এবার, শুভময়ের ওপরেই পড়ল সে কাজের ভার। তার কর্মজগৎ ছড়িয়ে পড়ল সারা উত্তর বাংলায়।

শিউলীর ছিল উভয় সংকট,—দাদার কাজের অনেক কিছুই জানে সে ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে সারাক্ষণ। অথচ মুখ ফুটে বাবাকেও বলতে পারে না কিছু, বাবার অনেক প্রশ্নেরই মিথ্যে উত্তর দিতে হয় তাই। অথচ দাদাকে কিছু বলতে গেলে হেসে উত্তর করে, দূর বোকা ভাবছিস্ কেন অতো? মরতে তো একদিন সবাইকেই হবে, যে ক'টা দিন বেঁচে আছি তার মধ্যে বহুর স্বার্থে কিছু একটা করতে পারলেই না বাঁচার আনন্দ। নিজের স্বার্থের গণ্ডীর মধ্যে পাক খেতে খেতে বেঁচে থাকা তো মরার সামিল।' দাদার কথায় শিউলীর চোখ দুটো হঠাৎ কেমন জলে ভরে উঠত, সেই সঙ্গে ঠোঁটের কোলে দেখা দিত গর্ব-ভরা স্নিগ্ধ হাসি।

একদিন শুভময়কে বলেছিল শিউলী, 'শুনেছি তোমাদের দু'একটা কেন্দ্রে মেয়ে কর্মীও আছে, তা হলে আমাকে তোমার সঙ্গী করে নিতে বাধা কি? ঘরে বসে থাকতে আর ভাল লাগে না দাদা।'

বোনের একটা কাঁধে হাত রেখে সস্নেহে বলেছিল শুভময়, 'কি জানিস বোন

কাজের জন্য প্রস্তুত থাকাও কাজ। কখন কাজের ডাক আসবে কেউ বলতে পারে না। ডাক যদি কখনও আসে তখন যেন সাড়া দিতে পারিস তেমনি করেই নিজেকে প্রস্তুত রাখ্। কে জানে, হয়তো তোকে এমন কাজ করতে হতে পারে যার ফল হবে সুদূর প্রসারী।' কথা বলতে বলতে কেমন যেন স্বপ্নালু হয়ে উঠেছিল শুভময়ের চোখ দুটো। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলেছিল একসময়, 'আরও অনেকদিন লড়াই করতে হবে, সামনে আরও শক্ত লড়াই। কতদিন এ-লড়াই চলবে কে জানে!' আর কোনো কথা বলেনি শিউলী, ভাই-বোন পাশাপাশি অনেকক্ষণ বসেছিল চুপচাপ।

এরপর কোনোদিনই দাদাকে আর সে কিছু বলেনি, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে নিজেকে কেমন যেন নিঃসঙ্গ মনে করত। প্রতিদিন কি একটা অভাব তাকে পীড়া দিত। এমনি এক নিঃসঙ্গ মুহূর্তে আর্থার এসে উপস্থিত হয়েছিল। ওর কাছে আর্থার ছিল এক নতুন বিস্ময়। যতই তাকে দেখত ততই যেন অবাক হত ও। এই ভাবপ্রবণ বিদেশী মানুষটি সর্বক্ষণ নিজেকে যেন বিলিয়ে দিতে চায়, সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চায় নিজেকে। শিউলী একা বসে ঐ বিদেশীর কথা ভাবতে ভাবতে একদিন নিজের ভাবনার মধ্যে নিজেই হারিয়ে গেল। ওর মনের সমস্ত আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল—আর্থার ডবসন। হঠাৎ একদিন, নিজের মনকে যখন আবিষ্কার করল সে, তখন ভয়ে কেমন কাঁটা হয়ে পড়ল। ওর মনে হল চলতে চলতে সে যেন এমন এক জায়গায় এসে উপস্থিত হয়েছে যেখানে সামনে আর কোনো পথ নেই, অথচ পেছনে ফিরবার পথটাও লোপ পেয়েছে। এরপর কি করবে ভেবে পেল না শিউলী।

আর্থার কিন্তু নিরুদ্বিগ্ন। আপন খেয়ালে ভরপুর হয়ে ছুটে চলেছিল সে। শিউলীকে সঙ্গে নিয়ে এক-একদিকে বেরিয়ে পড়ত, যেন তার নিরুদ্দেশের যাত্রা। কোনোদিন হয়তো চলে যেত তিস্তার ধারে, গিয়ে নদীর কূলে ঘাসের ওপর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকত অনেকক্ষণ, শুয়ে শুয়ে নিজের দেশের গল্প করত, শিউলী নিঃশব্দে বসে বসে শুনত সেই গল্প। ঘুরতে ঘুরতে কোনো দিন চলে যেত সাঁওতালদের ডেরায়। গিয়ে ওদের সঙ্গে নাচ-গানে মেতে উঠত। সেই কালো-কুলো লোকগুলো ভারি মজা পেত আর্থারকে নিয়ে। ওদের সঙ্গে ভারি ভাব জমে গিয়েছিল আর্থারের। ওরা বাজাত মাদল,—ডিম-ডিম, ডিম-ডিম—সেই সঙ্গে দুই সারি মেয়ে-পুরুষ মুখোমুখি নাচত হেলে দুলে। তাদের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে দাঁড়াত সেই বিরাট লম্বা বিদেশী মানুষটি। মাদলের তালে তালে পা ফেলে হেলে-দুলে সে-ও নাচত, ওদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইত গান—

এতোয়ার কে মেহ্‌মান বাবু সোমবারি হাট
ছোরিমন মোর বাবু রে-এ-এ ॥

ওর গানের ভঙ্গি, নাচের তাল দেখে মনে হত, ও যেন ওদেরই একজন, গায়ের রঙটাতেই যা ফারাক। সাঁওতালদের মন জয় করে নিয়েছিল আর্থার, সে ছিল ওদের মিতা, ওদের আপনজন।

শুভময়ও শুনেছিল আর্থারের সঙ্গে সাঁওতালদের এই ভাব বিনিময়ের কথা। আর্থারকে একদিন প্রশ্ন করেছিল সে, 'আর্থার, একটা কাজ করতে পারবি?'

ভুরু কঁচকে শুভময়ের দিকে চোখ তুলেছিল আর্থার, 'কি?'

—সাঁওতালদের সাথে তোর এই যে ভালবাসা একে একটা ভাল কাজে লাগাতে পারবি?

—কি রকম?—কথাটা বুঝতে চেষ্টা করেছিল সে।

—প্রাথমিক ভাবে ওদের নিয়ে একটা দল গঠন করতে পারবি?

—তাতে লাভ?—কেমন উদাসীন ভাবে কথাটা বলেছিল আর্থার।

শুভময় আর্থারের কাছে সরে এসেছিল এবার, গভীর স্বরে বলেছিল, 'আছে অনেক লাভ আছে। প্রপার ট্রেনিং পেলে ওরা অনেক বড় কাজ করতে পারবে। তোকে ওরা ভালবাসে তুই চেষ্টা করে দেখ। প্রাথমিক ভাবে একটা দল গঠন কর, তারপর ট্রেনিং-এর দায় আমাদের। দেখবি ওদের দিয়ে মস্ত কাজ করাতে পারব।'

আর্থার একটুকাল চুপ করে থেকে বলেছিল, 'আচ্ছা চেষ্টা করে দেখি।'

কিন্তু সে চেষ্টা করা আর সম্ভব হয়নি, তার আগেই সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। হয়তো এইটেই জাগতিক নিয়ম, যা' হয় তা ভাবা যায় না, যা' ভাবা যায় তা' হয় না।

ভাবনাটা হঠাৎ হোচট খেয়ে একটা মোড় নিয়ে একেবারে বর্তমানের চৌহদ্দিতে চলে এসেছিল। মনে পড়েছিল ললিতার কথা। ললিতাও একদিন এরকম একটা কথাই বলেছিল। আমার ঘরে একাই এসেছিল সেদিন, পরনে ছিল আসমানি রঙের একখানা শাড়ি, আলতো করে চুল বাঁধা, তাতে কেমন যত্নের অভাব, শ্লথ-মন্থর গতি। কেমন যেন অন্যমনস্ক ভাবে আমার সামনের চেয়ারটায় বসে ছিল ও, খানিকটা সময় চুপ করেই বসে ছিল। তারপর একটা বই টেনে নিয়ে একটার পর একটা বই-এর পাতা উল্টে যাচ্ছিল। আর আমি

চেয়েছিলাম ওর দিকে, কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না ওকে। এ যেন সে ললিতাই নয়, এ যেন আর একজন। সেই উচ্ছলতা, সেই প্রাণের আবেগ— সবই যেন হারিয়ে গেছে।

বুঝতে পারছিলাম, একটা কিছু ভাবছে। তাই চুপ করেই ছিলাম, ভাবনায় আঘাত করতে চাইনি। এক সময় মুখ তুলে তাকিয়েছিল ললিতা, সোজা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'পৃথিবীটা কি অদ্ভুত তাই না ?,

—হঠাৎ এই ফিলজফি ? - ভুরু তুলে প্রশ্ন করেছিলাম আমি।

আলতো করে হাসল ললিতা, বল্ল, 'এক-এক সময় নিতান্ত পুরোন ভাবনাটাই একেবারে নতুন বলে মনে হয় না ? মনে হয়, হঠাৎ যেন একটা নতুন জিনিষ আবিষ্কার করে বসলাম। আমার ঠিক তেমনি মনে হচ্ছে।'

ওর কথার উত্তর না দিয়ে ওর দিকে চেয়ে হাসলাম। একটু চুপ করে ললিতা নিজেই আবার বল্ল, 'যেমনটি ভাবা যায় এই সংসারে তেমনটি যেন কিছুতেই হতে চায় না। কোথাও একটা ফাঁক থেকে যাবেই, তাই না ?'

—হ্যাঁ তাই। আর হয়তো ঐ ফাকটুকু ঘিরেই রয়েছে আনন্দের নির্যাস।

—তার মানে ?—চোখ সূক্ষ্ম করল ললিতা।

—আমার কি মনে হয় জানেন ? মনে হয়, যেমনটি ভাবি তেমনটি হয় না বলেই এই এক ঘেয়ে সংসারে রহস্যময় আনন্দের একটা আবেশ রয়ে গেছে। প্রতিদিন হবে-কি-হবে-না-র যে উৎকণ্ঠা তাই যেন চলার পথে গতি এনে দিয়েছে।

—বাস্‌রে, এ-যে রীতিমত দার্শনিক তত্ত্ব।—এবার জোরেই হেসে ফেলল ললিতা। নিজেকে একটু হাল্কা করতে চাইল ও।

হাসলাম আমিও, বল্লাম, 'কিন্তু ব্যাপারটা কি বলুন তো ? হঠাৎ ও কথাটা বল্লেন কেন ?'

—কোন কথাটা ?

—ঐ যে বল্লেন, যেমন ভাবা যায় তেমনি হয় না।

—তেমন কিছু না। এমনি বল্লাম আর কি।—নিজেকে আড়াল করতে চাইল ললিতা।

আমি আর কোনো কথা না বলে চুপ করেই রইলাম। ললিতা আবার একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। তারপর এক সময় নিজের অজান্তেই ওর মনের জানালাটা খুলে দিয়েছিল আমার সামনে

নয়

সেটা ছিল আলো ঝলমল শরতের এক সকাল। ললিতার মনটাও অকারণেই শরতের হাল্কা মেঘের মত আনন্দে ভাসছিল। সব কিছুই সেদিন ভাল লাগছিল। একটা খুশির আমেজ যেন ঘিরে রেখেছিল ওকে। মানুষের জীবনে হয়তো এমন এক একটি ক্ষণ আসে যখন তাকে একটা আনন্দের বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে যায়, সে হারিয়ে ফেলে নিজেকে, পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ-তাপের উর্ধ্বে চলে যায় সে। সেই আনন্দের বন্যা হয়তো আসে অকারণেই, বাস্তবের কার্য-কারণের সঙ্গে কোনো যোগাযোগই হয়তো থাকে না তার। শরতের সেই সকালটা ছিল ললিতার জীবনে এমনই একটা ক্ষণ। নিজের মধ্যে নিজেকে যেন ধরে রাখতে পারছিল না সে। গুছোন ঘরটাকেই গুছিয়েছিল বারবার করে, আলমারি থেকে বইগুলোকে নামিয়ে ঝাড়-পোছ করে আবার সাজিয়ে রেখেছিল একটা একটা করে। পরিষ্কার জিনিষগুলোর ওপর আর একবার করে ঝাড়ন বুলিয়েছিল। আসলে কি করবে নিজেই যেন ভেবে পাচ্ছিল না।

দেবজ্যোতি চেয়ে চেয়ে দেখছিল ওর ভাব-ভঙ্গি, এক সময় ওর দিকে মিষ্টি করে হেসে বলেছিল, 'ব্যাপার কি বলো তো?'

—কিসের ব্যাপার?

ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করেছিল ললিতা, ওর সামনে তখন এক গাদা বই স্তুপীকৃত হয়ে আছে। বাঁধন হীন চুল হাওয়ায় উড়ছে, জামা কাপড় রীতিমত বিপর্যস্ত, আঁচলটা শক্ত করে কোমড়ে জড়ান। ওর দিকে একটু কাল তাকিয়ে, ঠোঁটের ফাঁকে হেসে দেবজ্যোতি বল্ল, জীবনের পালে আজ যেন নতুন করে হাওয়া লেগেছে?'

—তা একটু।—মিষ্টি হেসে আবার নিজের কাজে মন দিল ললিতা।

—দমকা হাওয়া নয় তো?—একটু কাছে সরে এসে প্রশ্ন করেছিল দেবজ্যোতি।

—ভয় হচ্ছে?

—তা একটু হয় বৈকি।

—তা হলে ঐটুকু ভয় থাক।

—কেন?

—সবটুকু ভয় জয় করলে জীবন থেকে আনন্দের খানিকটা ঘাটতি পড়তে পারে।

দু'জনে দুজনের দিকে মুখ তুলেছিল এবার, চোখাচোখি হতেই হেসে ফেলেছিল। ঠিক সেই সময়েই জানালা দিয়ে ললিতার দৃষ্টি পড়েছিল সামনের ছাদের ওপর। কোথা থেকে উড়ে এসে বসেছে এক ঝাঁক সাদা পায়রা। গলা ফুলিয়ে পেখম মেলে নিজেদের মধ্যে মশগুল হয়ে আছে তারা। পায়রাগুলোকে দেখে হঠাৎ কেমন যেন ছেলে মানুষের মত হয়ে উঠেছিল ললিতা। একটা আঙুল তুলে ঐ দিকে দেবজ্যোতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে এক রকম কলকলিয়ে উঠেছিল, 'ছাখো, ছাখো কি সুন্দর পায়রাগুলো।' জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ললিতা, ওর পাশে দেবজ্যোতিও এসে দাঁড়িয়েছিল। দেবজ্যোতির একটা হাতের ওপর নিজের একটা হাত রেখে বলেছিল সে, 'ওদিককার পায়রা-টাকে দেখেছো, কি দারুন গলা ফুলিয়েছে? সত্যি, কি সুন্দর লাগছে।'

দেবজ্যোতি তাকিয়েইছিল ললিতার চোখের দিকে. ললিতা দেবজ্যোতির মুখের দিকে চোখ ফেরাতেই বলেছিল, 'তোমার যেন আজ কি একটা হয়েছে।'

—কি?—কেমন আদুরে চোখে তাকিয়েছিল সে।

—সেটাই তো ভাবছি।

—ভেবে লাভ নেই খুঁজে পাবে না।

—না পাই ক্ষতি নেই। আমার নিজের কাছে তোমার ঐ উপছে পড়া মনের সান্নিধ্য তো পাব।

একটু থেমে আবার বলেছিল দেবজ্যোতি, 'আজ যদি অফিস যেতে না হত তাহলে বাঁচতাম।'

—কেন?

—আজ সারাক্ষণ তোমার কাছাকাছি থাকতে ইচ্ছে করছে।

—যাঃ, কি যে বলো।

—কেন বলবো না, সারাদিনে তোমায় কতটুকু কাছে পাই, বলো? সকাল অ.টটা থেকে রাত আটটা, এর মধ্যে তোমার স্থান কোথায়?

—আর আমার কাটে কি করে?

তোমার তো অশ্রম আছে।

ললিতা চুপ করে থাকে এবার, দেবজ্যোতিও চুপ। এরপর দুজন দুজনার কাজে লেগে যায়। দেবজ্যোতি অফিস যাবার জন্ত প্রস্তুত হয়। এক সময় বেরিয়েও যায় অফিসে।

পথ চলতে চলতে নিজের অজান্তেই ললিতা সেদিন জীবনের এক সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছে গিয়েছিল। তার সামনে তখন দুটো পথ খোলা,—হয় পুরোপুরি সংসারী হওয়া, না হয় সম্পূর্ণভাবে আশ্রমের কাজে নিজেকে নিয়োগ করা। প্রথমে আশ্রমের আকর্ষণই তার কাছে ছিল চরম, কিন্তু ধীরে ধীরে একদিন দেবজ্যোতির সংসারও তার কাছে সমান আকর্ষণীয় হয়ে উঠল। সেদিনের সেই আলো ঝলমল সকালে ললিতার কাছে সংসারী জীবনের আনন্দটা যেন বড় লোভনীয় বলে মনে হয়েছিল। হয়তো সংসার জীবনটাকেই সে বেছে নিত, কিন্তু একটা দমকা হাওয়াতে সব কেমন ওলট পালট হয়ে গেল। হঠাৎ যেন সংসারী জীবনের লোভটা বড় বিশ্রী-ভাবে প্রকট হয়ে পড়ল তার সামনে।

অন্য দিনের মত দেবজ্যোতির অফিস থেকে ফিরবার আগেই আশ্রম থেকে ফিরে এসেছিল ললিতা। দেবজ্যোতির অফিস থেকে ফিরতে সেদিন অনেক দেরী হয়ে গিয়েছিল। খাবার তৈরীর পাট শেষ করে একটা বিশ্রী অস্বস্তি বুকে নিয়ে জানালার ধারে চুপ করে বসেছিল ললিতা। কোনো কিছুতেই মন দিতে পারছিল না সে, এমনকি বইএও মন বসছিল না।

রাত দশটায় ফিরেছিল দেবজ্যোতি। দরজা খুলেই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত স্বরে প্রশ্ন করেছিল ললিতা, 'কি ব্যাপার, হঠাৎ এত দেরী যে!'

দেবজ্যোতিকে দেখে মনে হচ্ছিল, এই দেরীটা যেন বিশেষ কোনো ব্যাপারই নয়। একটা খুশির আমেজ ছড়িয়ে ছিল ওর সমস্ত চোখে-মুখে। ললিতার প্রশ্নের উত্তরে জিব দিয়ে এক অদ্ভুত আওয়াজ তুলে বল্ল, 'আছে আছে ব্যাপার একটা আছে।' দেবজ্যোতির এমন হাল্কাভাব কখনও দেখেনি ললিতা, তাই একটু অবাকই হয়েছিল সে।

—ব্যাপার তো আছে এদিকে আমি চিন্তায় মরি।—কথাটা না বলে পারেনি ললিতা।

— এই ত্যাখো, এত অল্পে চিন্তায় মরলে চলবে কেন?

কথাটা বলে ললিতার থুতনি ছুঁয়ে একটু আদর করেছিল দেবজ্যোতি। ললিতা আর কোনো কথা বলেনি।

খাওয়ার টেবিলে বসে দেবজ্যোতি খুলে বলেছিল সব। ললিতা নিঃশব্দে শুনে গিয়েছিল।

দেবজ্যোতির জীবনে এক নতুন সুযোগ এসেছে, এ সুযোগ সে ছাড়বে না, ছাড়তে পারে না। যোগাযোগটা ঘটেছিল কিছুদিন আগেই, তবে পাকাপাকি

রূপ নেয়নি এতদিন, পাকাপাকি রূপ নিয়েছে আজই। পুরোপুরি বোঝাবুঝির পালা সারতে সারতে দেরী হয়ে গেছে।

দেবজ্যোতি যে ফার্মে চাকরি করে সেই ফার্মে এ্যাপোলো ট্রেডিং এজেন্সি নামে একটা অর্ডার সাপ্লায়ার দীর্ঘদিন ধরে মেশিনারি টুলস্ সাপ্লাই করে আসছিল। দীর্ঘদিন যাতায়াতের ফলে দেবজ্যোতির সঙ্গেও এই সাপ্লায়ারটার জানাশোনা। বেশ ভালই চলছিল, রেগুলার অর্ডার পেয়ে আসছিল ওরা। হঠাৎ এদের স্টাণ্ডার্ড ফল করতে শুরু করে, ফলে ইনসপেকসন থেকে অনবরত রিজেকসন হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত এদের অর্ডার দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হল। যেহেতু দেবজ্যোতি পার্জেসিং ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনীয়ার, সাপ্লায়ারের লোক এসে ধরল ওকে। অনেক ধরাধরি করে শেষ পর্যন্ত অর্ডারটা আবার পাইয়ে দিয়েছে দেবজ্যোতি, কিন্তু একটা শর্তে সে এই কাজে রাজী হয়েছিল।

খুশী হয়েই ওর এই শর্ত মেনে নিয়েছে ঐ সাপ্লায়ার। শর্তটা এই যে, জিনিসের স্টাণ্ডার্ড যাতে ফল না করে তার জন্য দেবজ্যোতি ড্রইং অনুযায়ী কাজ বুঝে নেবে, এবং শুধু ওদের নিজেদের ফার্মেই নয়, ওদের ফার্মের সঙ্গে যুক্ত অন্য ফার্মেও অর্ডার পাবার ব্যবস্থা করবে এবং টোটাল অর্ডারের ওপর তার পাওনা ফাইভ পারসেণ্ট। কেবল দেবজ্যোতিদের ফার্মের অর্ডার থেকেই তার পাওনা হবে মাসে পনেরো হাজার টাকা।

ললিতা কোন উত্তর করতে পারল না। প্রথমটা সে বিশ্বাসই করতে পারল না, দেবজ্যোতি সত্যি সত্যি টাকা আয়ের জন্য নিজেকে এমনভাবে নিয়োগ করেছে। তাই খানিকটা বিস্ময়ের ঘোরে দেবজ্যোতির মুখের দিকে তাকিয়েছিল সে। কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল তার সব। ওর মনে হয়েছিল, তার এতদিনের সমস্ত বিচার বিবেচনা আজ যেন মিথ্যে প্রমাণিত হয়ে গেছে। বড় ছোট মনে হচ্ছিল নিজেকে।

—কি তুমি যে কোনো কথা বলছো না?—খেতে খেতে মুখ তুলে প্রশ্ন করেছিল দেবজ্যোতি।

—কি বলবো?

ললিতা খেতে পারছিল না, খাবারগুলো নিয়ে নিঃশব্দে নাড়াচাড়া করছিল কেবল। দেবজ্যোতির প্রশ্নে মুখ না তুলেই উত্তর করেছিল সে।

—বাঃ, এতবড় একটা এ্যাচিভমেণ্ট, আর সে সম্পর্কে তোমার কিছুই বলার নেই? বুঝতে পারছো না তুমি, এটা আসলে একটা সোনার খনি আবিষ্কার।

—কিন্তু সে খনিতে আমাদের কি প্রয়োজন?

এবার হো হো করে হেসে উঠেছিল দেবজ্যোতি। হাসতে হাসতেই বলেছিল, 'সত্যিই তুমি ছেলেমানুষ ললিতা। নইলে টাকার কি প্রয়োজন এ-প্রশ্ন তুলতে পার?'

ললিতা দেবজ্যোতির চোখের দিকে তাকিয়েছিল একটুকাল, তারপর বলেছিল, 'টাকার প্রয়োজন নেই এ-কথা তো বলছি না। বলছি, কেবল টাকার পেছনে ছোটাই জীবন নয়।'

—টাকার পেছনে ছোটা!—কেমন যেন স্বগতোক্তি করেছিল দেবজ্যোতি। তারপর খানিকটা সময় চুপ করে বসেছিল।

—তুমি কিন্তু খাচ্ছ না।

ললিতার কথায় একটু হেসে আবার খাওয়ায় মন দিয়েছিল দেবজ্যোতি। নিঃশব্দেই খেয়ে চলেছিল ওরা।

খাওয়া শেষ করে এক সময় বলেছিল দেবজ্যোতি, 'জান, ললিতা, সে সব দিনের কথা কিছুতেই ভুলতে পারি না। সে-জ্বালা তুমি বুঝবে না, হয়তো আমি বোঝাতেও পারব না। সেদিন সেই আধ-পাগলা মাকে নিয়ে মামা বাড়ি যখন এলাম, তখন দু'মুঠো ভাতের জন্য কি-না করতে হয়েছে। ঐসব দিনের একটা ছায়া সারাক্ষণ আমায় তাড়া করে বেড়ায়। অনেক দেখে শিখেছি, টাকা অর্জনের পথ সামনে এগিয়ে এলে তাকে অবহেলা করতে নেই, ফল তার ভাল হয় না।'

—ড্রইং দেখার ব্যাপার রয়েছে তাছাড়া আরো কত কিছু দেখাশোনার ব্যাপার রয়েছে এত সময় তুমি পাবে কোথায়?

—সময় করে নিতে হবে। তাছাড়া ছুটীর দিনগুলোও কাজে লাগাতে হবে।

—তার মানে শিউলীর কাজ আর করছো না?

চমক-লাগা মানুষের মত প্রশ্ন করেছিল ললিতা।

—আপাতত নয়। কিন্তু তার জন্য ভেবো না, ডবসন কাকার আশ্রমে একটা মোটা এমাউণ্ট কনট্রিবিউট করবো।

দেবজ্যোতির কথার উত্তরে হঠাৎ কোনো কথা যোগায়নি ললিতার মুখে। কেমন বিস্ময়ে সে তাকিয়েছিল দেবজ্যোতির মুখের দিকে। দেবজ্যোতির এতখানি পরিবর্তন যেন ভাবতেই পারছিল না। সেই মুহূর্তে ললিতা ভাবছিল, নতুন করে আবার সব হিসেব নিকেশ করতে হবে, আবার নতুন করে বোঝা-বুঝির পালা। ওর মনে হচ্ছিল, হঠাৎ যেন একটা যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে,

কিছুতেই জোড়া লাগাতে পারছে না। বুঝতে পারছিল, কোথায় যেন ভাঙন ধরতে শুরু করেছে।

ললিতার কথা শেষ হয়েছিল এক সময়। শেষ হবার পরও অনেকক্ষণ বসেছিল চুপচাপ। তারপর কেমন অন্যমনস্ক ভাবে উঠে গিয়েছিল আমার ঘর থেকে। ওর মনে তখন চলছিল পালা বদলের পালা, তারই আভাস উঁকি দিচ্ছিল ওর চলনে-বলনে।

তারপর আর একদিন। ললিতা এসেছিল একা, সেদিন অনেক সহজ সে, নতুন অবস্থাকে স্বাভাবিক ভাবেই মেনে নিয়েছে। ওর চোখে মুখে ক্ষোভ বা দুঃখের কোনে চিহ্ন নেই, যেন কোথাও কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি, একই সুরে বেজে চলেছে জীবন সঙ্গীত। সেদিন ললিতা ওর ডায়েরীটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বল্ল, 'এটা আপনার কাছেই থাক।'

ওর সহজভাবটাই যেন বড় বেশী করে নাড়া দিচ্ছিল আমাকে। নতুন অবস্থাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না আমি। তবু ডায়েরীটা ওর হাত থেকে নেবায় সময় বল্লাম, 'এটা পড়বার অধিকার রইল কি?'

আমার মুখের দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইল ললিতা, তারপর বল্ল, 'হ্যাঁ রইল. একটা শর্তে।'

—কি ?

—পড়ে যা' জানবেন তা' আপনার মধ্যেই রাখবেন, ঘটনার ওপর কখনও হস্তক্ষেপ করবেন না।

—এ আর বেশী কি ?

—হ্যাঁ ঐটুকু হলেই চলবে।—মিষ্টি করে হাসল ললিতা।

ওর সামনেই ডায়েরীর শেষ পাতাটা উল্টেছিলাম আমি। শেষের কটা লাইনে লেখা ছিল, 'ওঁকে এখন ঠিক চিনতে পারি না। টাকা নিয়ে বড় ব্যস্ত ও। এ যেন অন্য দেবজ্যোতি--আমার অচেনা। অচেনা মানুষের সঙ্গে ঘর করা চলে না, তাই চল্লাম। প্রথমটা নিজেকে যেমন অসহায় মনে করেছিলাম আজ আর তা হচ্ছে না। ভালই লাগছে। আশ্রমে থেকে আশ্রমের কাজ করার এক বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করছি। সব চেয়ে বড কথা ডবসন কাকাকে খুব কাছাকাছি পাব—কথাটা ভাবতেও ভাল লাগছে।'

ডায়েরী থেকে মুখ তুলে ওর দিকে তাকালাম। ওর চোখে কৌতুক মেশানো হাসি। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে ওকে বুঝবার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু কিছুই যেন বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ললিতা যেন আমার ধরা-ছোঁয়ার

বাইরেই থেকে যাচ্ছিল। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'সত্যি চল্লেন তাহলে?'

—সত্যি মিথ্যে জানিনে, তবে যাচ্ছি।—

হাল্কা ভাবে হেসে উত্তর করল ললিতা। হাসলাম আমিও।

এরপর আর কোনো কথা হয়নি, চলে গিয়েছিল ললিতা।

আমার বুকে কিন্তু উঠেছিল প্রচণ্ড তুফান। মনে পড়েছিল বালক দেবজ্যোতিকে। মনে পড়ছিল সেই অসহায় বালককে, মায়ের হাত ধরে যেদিন সে সম্পূর্ণ অনিশ্চিতের মধ্যে পদ্মার এপারে এসে পৌঁছেছিল। সামান্য গুটিকয়েক টাকা ছাড়া সঙ্গে আনতে পারেনি কিছুই, অথচ এই বিরাট পৃথিবীর কিছুই জানে না সে। পরম অবলম্বনের মত যার হাতটা ধরে আছে সর্বক্ষণ সে-ও আধ পাগলী। ওর পায়ের নীচের মাটিটুকু যেন প্রতি মুহূর্তে সরে যাচ্ছিল। অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা এক মুহূর্তের জন্যও ভাবতে পারছিল না সে। হঠাৎ এক এক সময় কান্নায় বুকটা ভরে উঠতে চাইছিল।

বর্ধমান মামাবাড়ি, দূর সম্পর্কের মামা—কি ভাবে তাদের নেবে কে জানে। পিতৃ পুরুষের ভিটেতেও আপন খুড়ো-জ্যাঠা কেউই নেই, বাকী যারা আছে তারা যে এতদিন পর ওদের এই দুর্দ্দিনে ওদের পাশে এসে দাঁড়াবে না তাতে কোনো সন্দেহই নেই।

সেই অনিশ্চিতের যাত্রায় সব কিছু ছাপিয়ে বাবার কথাই বারবার মনে পড়ছিল দেবজ্যোতির। সেই সঙ্গে মনে পড়ছিল দিদির কথা। দিদির কথা মনে পড়লেই সব যেন কেমন গুলিয়ে যায় ওর, সমস্ত পৃথিবীর ওপর বিষিয়ে ওঠে মনটা। দিদির কথা ভাবতে গেলেই সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা ওকে তাড়া করতে থাকে। মন থেকে কিছুতেই সরাতে পারে না সেই দৃশ্য। নিজেকে কেমন যেন অসহায় মনে হতে থাকে তখন। হয়তো দেবজ্যোতির বাবারও এমনি একটা অবস্থাই হয়েছিল, একটা ভয়ঙ্কর কিছু তাঁকে হয়তো গ্রাস করে ফেলেছিল একেবারে। ধীরে ধীরে কেমন যেন অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছিলেন তিনি। সেদিন বর্ধমানের পথে বাবার কথাই ভাবছিল দেবজ্যোতি।

শেষের দিকটা দেবজ্যোতির বাবা কাজকর্ম একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। কেমন শুকিয়ে যাচ্ছিলেন ধীরে ধীরে। প্রায় একা একাই বসে থাকতেন চুপচাপ। এক এক সময় দেবজ্যোতির মা ওর বাবার পাশে এসে বসতেন, গায়ে হাতবুলিয়ে দিয়ে বলতেনা 'কি ভাবছ?'

—কি ভাবছি?—গম্ভীর হয়ে চুপ করে থাকতেন কিছুকাল, তারপর

বলতেন, 'কি ভাবি জান। ভাবি ঐ সাহেবেদের কথা। কী সংঘাতিক একটা জাত!'

—কেন?—মা হয়তো জিজ্ঞাসা করতেন।

মার ঐ সহজ প্রশ্নেও কেমন অস্বাভাবিক উত্তেজিত হয়ে উঠতেন দেবজ্যোতির বাবা। বলতেন, 'এত কিছুর পরেও এই প্রশ্ন করছ তুমি? দেখতে পাচ্ছ না, সেই মিরজাফরের আমল থেকে এই জাতটা গোটা দেশটাকে কেমন করে শুষছে? শুষে শুষে ছোবড়া ক'রে দিয়েছে দেশটাকে। তারপর আজ এই ছোবড়াটা নিয়ে হিন্দু-মুসলমানে লড়াই বাধিয়ে দিয়েছে এই জাতটা।' কথা বলতে বলতে হঠাৎ কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে পড়তেন, কান্নায় বুজে আসত তার গলা, বলতেন, 'ওরাই তো আমার মেয়েটাকে চিবিয়ে চিবিয়ে গিলে ফেলল। একেবারে খেয়ে ফেলল ওরা।'

এমনি করে শুকিয়ে যেতে লাগলেন তিনি। তারপর হঠাৎ একদিন হার্টফেল করলেন—লোকে বলল সন্ন্যাস রোগ। দেবজ্যোতি সেদিন সেই মুহূর্তে কিছুই যেন বুঝতে পারছিল না, আসলে সমস্ত অনুভূতিই তার লোপ পেয়েছিল। ভোজবাজির মত পরপর কয়েকটি ঘটনা তার সমস্ত চেতনাকে একেবারে অবশ করে দিয়েছিল। বাবার মৃত্যুতে যে-অপূরণীয় ক্ষতিটা হয়েছিল তা' বুঝবার মত মানসিক শক্তিটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিল। দেবজ্যোতির মাকে দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি যেন পার্থিব সমস্ত ঘটনার উর্ধে রয়েছেন, কোনো কিছুই তাঁকে স্পর্শ করছে না। হাসি নয়, কান্না নয়, শোক-তাপের কোনো অভিব্যক্তিই প্রকাশ পাচ্ছিল না তাঁর ব্যবহারে। পাড়া প্রতিবেশীরা যখন তাঁকে সমবেদনা জানাতে এল, তখন তিনি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন তাদের দিকে। তাদের কথার এক বর্ণও বুঝে উঠতে পারলেন না তিনি। কারও কোনো কথারও জবাব দিলেন না। আসলে সেই থেকেই একেবারে নীরব হয়ে গেলেন দেবজ্যোতির মা। যতদিন যেতে লাগল ততই অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পেতে লাগল তাঁর মধ্যে। কী সব বিড় বিড় করে বকতেন আর গোবর জল ছিটোতেন চারদিক। কখনও কখনও নিজে করতেন এবং দেবজ্যোতিকেও স্নান করাতেন গোবর জলে। কেবলই তাঁর মনে হত, সমস্ত কিছু অশুচি হয়ে গেছে। মারকাণ্ড দেখে এক এক সময় কেঁদে ফেলত দেবজ্যোতি, মা তখন অনেকটা সহজ হতেন। দেবজ্যোতি-কে জড়িয়ে ধরে তিনিও কাঁদতেন তখন। এমনি সহজভাব হয়তো কয়েকদিন থাকত, তারপর আবার যে-কে সেই।

দেবজ্যোতির মা তখন একটানা কয়েকদিন বেশ সহজ। সেই সময় ঠিক

করলেন ও-দেশে আর থাকবেন না, চলে যাবেন ও-দেশ ছেড়ে। আসলে ওটা তো তাদের দেশ নয়; বলতে গেলে বিদেশ। শ্বশুর কুল, পিতৃকুলের ভিটে—মাটি সেই বর্দ্ধমানে। আত্মীয়-স্বজন বলতে যা কিছু সবাই থাকে সেখানে। কাজেই ও-শহরে থাকা আর চলে না, তাছাড়া চলবেই বা কি করে। আয়ের কোনো পথ নেই, জমানো টাকায় আর কটা দিন চলে। অতএব বর্দ্ধমানে যাওয়াই স্থির হল। রোকেয়াদির মা-বাবাও সেই পরামর্শ ই দিলেন।

এই সময়ে ভারত ছেড়ে চলে গেল ইংরেজ, ভারত পাকিস্তানে ভাগ হয়ে স্বাধীন হল দেশ। এক এক করে বগুড়া ছেড়ে চলে যেতে লাগল হিন্দুরা। চলে গেল বন্ধুরাও! যাবার আগে দেবজ্যোতির হাতটা ধরে কেঁদে ফেলেছিল বন্ধু। কেঁদেছিল দেবজ্যোতিও। দুজনে দুজনার মুখের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ বসে কেঁদেছিল সেদিন, কেউ কোনো কথা বলতে পারেনি। আবার কখনও দেখা হবে কি না কে জানে।—এ প্রশ্নটাও হয়তো সেই অপরিণত মনে উঁকি দিয়েছিল তখন।

বর্দ্ধমানে নেমেই মার পাগলামিটা বেড়ে গিয়েছিল অনেক, কোনো সময়েই যেন আর সহজ হতেন না। মামারা কিছুদিন ওদের আদর যত্ন করলেন, তারপর ওদের ক্যাশ টাকাটা ফুরিয়ে যেতেই শুরু হল রূঢ় ব্যবহার। তাঁদেরও যে খুব একটা দোষ ছিল তা নয়, স্বচ্ছল অবস্থা তাদেরও ছিল না। পড়াশুনো বন্ধ, মামারা দেবজ্যোতিকে কোথাও একটা কাজে লাগিয়ে দিতে চাইছেন। সুযোগও জুটে গেল একটা। মামাদের চেনা জানা এক ভদ্রলোক একদিন এসেছিল ওদের বাড়ি। কলকাতায় তার দোকান, দেবজ্যোতিকে দেখে তাঁর পছন্দ, দোকানের কাজে অমনি একটা ছেলে তার প্রয়োজন। অতএব তার সঙ্গে কলকাতায় চলে এল দেবজ্যোতি। প্রথম দিন থেকেই দোকানের কাজ শুরু করল সে। দোকান মানে রেষ্টুরেণ্ট। দোকানের কাজ বলতে বয়ের কাজ। এক নতুন জীবন শুরু হল দেবজ্যোতির।

প্রথম দিন যখন খাবার ডিসটা খদ্দেরের সামনে এগিয়ে দিয়েছিল তখন হঠাৎ দু'চোখ জলে ভরে এসেছিল তার। কিন্তু তারপর মনে মনে কেমন যেন শক্ত হয়ে গিয়েছিল সে।

দুঃখ হতনা, সমস্ত মানুষের ওপর রাগে ফুঁসত কেবল। কাপ ডিস ভাঙলে, কিম্বা তাড়াতাড়ি কাজ করতে না পারলে রেষ্টুরেণ্টের মালিক কখনও কখনও মেরেছে তাকে, কিন্তু কখনও কাঁদেনি দেবজ্যোতি। কান্নাটা তার কাছে অপমান বলে মনে হয়েছে। যত মার খেয়েছে তত মানুষের ওপর প্রতিহিংসায় মনটা শক্ত হয়ে উঠেছে। কান্না যেন ভুলেই গিয়েছিল সে।

সেদিনও কাঁদেনি যেদিন মার মৃত্যুর খবরটা এসেছিল। মৃত্যুর দুদিন পর খবর পেয়েছিল সে। খবর পেয়ে বর্দ্ধমানেও গিয়েছিল কিন্তু কাঁদেনি। শ্রাদ্ধ-শান্তি করে চলে এসেছিল আবার। ফিরে এসে শুনল তার কাজ নেই। কিছুদিন পথে পথে ঘুরল, তারপর আর এক দোকানে কাজ পেল একটা। সেখানে কয়েকমাস কাজের পর সে কাজটাও গেল। তখন আবার পথ। পথে ঘুরে বেড়াল কিছুদিন। একা একা পথে ঘুরত আর মনে পড়ত বাবার কথা। শেষের দিকটা বাবা প্রায়ই বলতেন, কার্জন-মিণ্টো-লিনলিথগো-ওয়াভেল সব ব্যাটা মানুষ খেকো। বলতেন, 'সাহেব জাতটাই হল মানুষ খেকো। এশিয়া-আফ্রিকার সবাইকে খেয়ে ফেলছে ওরা।'

সেদিন যখন ডবসন কাকার সাইকেলে ধাক্কা লেগে পড়ে গিয়েছিল দেবজ্যোতি তখন হঠাৎ বাবার কথাটাই ওর মনে পড়ে গিয়েছিল। বাবার কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছিল নিজের মধ্যে। বার বার মনে হয়েছিল, এই সাহেবদের জন্যই আজ তার এই পরিণতি। —বাবা মাকে হারিয়েছে, দিদিকে হারিয়েছে, আজ সে চায়ের দোকানের একটা বয় এই সাহেবদের জন্যই। ভাবতে ভাবতে এক লহমায় শরীরের সমস্ত রক্ত মাথায় গিয়ে টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছিল, প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠেছিল ওর দুটো চোখ। সাইকেলের ধাক্কায় রাস্তায় পড়ে গিয়ে ওর হাত পা ছড়ে গিয়েছিল, কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য করবার মত মানসিক অবস্থা তখন ওর নয়। একলাফে উঠে সজোরে কামড়ে ধরেছিল সাহেবের ডান হাতের কব্জিটা। কেমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল ডবসন সাহেব। দেবজ্যোতির চোখে তখন জল, গায়ে মাথায় ধূলো। কনুই বেয়ে রক্ত ঝরছে, ডান হাঁটুর কাছে কেটে গেছে অনেকটা। রাগে-ভয়ে-যন্ত্রণায় সমস্ত শরীরটা কাঁপছিল থরথর করে। তবু সজোরে সাহেবের হাতটা ধরে রেখেছিল সে।

ততক্ষণে ভিড় জমে গেছে বেশ। অনেকে মিলে দেবজ্যোতিকে টেনে সরিয়ে দিল। তখনও কিন্তু রাগে ফুঁসছে সে।—এই সাহেবই যেন সমস্ত সাহেব জাতের প্রতিনিধি। আর তাই এর কাছ থেকেই বুঝে নেবে মানুষের ওপর অত্যাচারের সমস্ত হিসেব নিকেশ।—দেহের যন্ত্রণা, মনের জ্বালা, মা-বাবার শোক সব যেন ঐ কিশোর মনটাকে একেবারে তালগোল পাকিয়ে তুলেছিল। কেমন একটা বোবা কান্না ওর বুক থেকে ঠেলে উঠছিল বারবার। দিশেহারা হয়ে কেঁদে ফেলেছিল সে। কাঁদতে কাঁদতেই বলেছিল, এই সাহেবরাই তো আমার বাবা-মাকে মেরেছে, দিদিকে চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়েছে, হিন্দুস্থান-পাকিস্তান করে দিয়েছে।' বলতে বলতে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিল

দেবজ্যোতি,—'বাবা নেই, মা নেই, কেউ নেই, আমার কেউ নেই।' এতদিনের ওর সমস্ত কান্না যেন হঠাৎ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল।

কেমন হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন ডবসন সাহেব। ঐ কিশোরের প্রলাপ তাকে প্রচণ্ড বেগে নাড়া দিয়েছিল। কেমন এক আবেগে ভরে উঠছিল তাঁর বুকটা। সেই অনাথ বালকের নিঃসঙ্গ জীবন তাঁর নিঃসঙ্গতাকেও স্পর্শ করেছিল। হঠাৎ ঐ বালকটিকে বড় আপন মনে হয়েছিল তাঁর, নিজের মনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছিলেন ঐ বালকটির মধ্যে। তাই এক অব্যক্ত ব্যথায় তাঁরও চোখে জল দেখা দিয়েছিল। তিনি ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরেছিলেন ধূলিধূসরিত ঐ বালকটিকে। বার বার হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন ওর গায়ে মাথায়। দুজনেরই চোখে তখন জল। চার পাশের লোক অবাক-বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখেছিল ভিন্ন দেশীয় দুই অসম বয়সী মানুষের কান্না।

অবাক হয়েছিল দেবজ্যোতিও। এমনি একটা ঘটনার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না একেবারেই। সবচেয়ে অবাক হয়েছিল ধুতি পাঞ্জাবী পরা সেই সাহেবটি যখন পরিষ্কার বাঙলায় বলেছিল, 'কে বললে তোমার কেউ নেই? তোমার সব আছে, আজ থেকে তুমি আমার কাছে থাকবে।' সেই মুহূর্তে কান্না ভুলে গিয়েছিল দেবজ্যোতি, অবাক হয়ে সেই দীর্ঘকায় মানুষটির মুখের দিকে চেয়েছিল নিঃশব্দে।

কথা প্রসঙ্গে এই ঘটনার উল্লেখ করে একদিন বলেছিল দেবজ্যোতি, 'আসলে আমার জন্যই সেই এ্যাকসিডেণ্টটা হয়েছিল। একদিকে গাড়ি আর এদিকে সাইকেল। গাড়িটাকে এড়াতে গিয়েই একেবারে হুড়মুড় করে গিয়ে পড়লাম সাইকেলের ওপর।' একটু চুপ করে তারপর বলেছিল, 'মাঝে মাঝে ভাবি, সেদিন যদি ঐ এ্যাকসিডেণ্টটা না হত, তবে কোথায় যে ভেসে যেতাম কে জানে!'

কথাটা শেষ করে অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিল দেবজ্যোতি। তারপর একসময় বলেছিল, 'দুই ভাই বোনে দাদুর কাছে বসে যখন গল্প শুনতাম তখন কি একবারের জন্যও ভেবেছি, এমন দিন হঠাতই একদিন শেষ হয়ে যাবে। ভালভাবে বুঝবার আগেই একটা ঘূর্ণি ঝড় যেন সব কিছু উড়িয়ে নিয়ে গেল। সে সব দিনের এতটুকু রেশ রইল না কোথাও।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার চুপ করে গিয়েছিল সে। তারপর কথায় কথায় এক সময় ফিরে গিয়েছিল সেই ছেলে বেলার জীবনে।

শহরের এক প্রান্তে ছোট একতলা পাকা বাড়ি। বাড়ির সামনে সাজানো ছোট ফুলের বাগান। বাগানের গায়ে লম্বা বারান্দা। ঐ বারান্দায় একটা ইজি চেয়ারে দেবজ্যোতির ঠাকুর্দা প্রায় সারাক্ষণ বসে থাকতেন। আর প্রায় সর্বক্ষণই গুড়ুক গুড়ুক করে তামাক টানতেন। সন্ধ্যে বেলা পড়াশুনো শেষ করে দুই ভাই বোন এসে বসত দাদুর পাশে। বাগান থেকে ভেসে আসত ফুলের মিষ্টি গন্ধ, ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক শোনা যেত এখানে সেখানে, ঝাঁক ঝাঁক জোনাকী পোকা অন্ধকারের বুকে আলো জ্বালত। আর সেই সময় তামাক টানার সঙ্গে সঙ্গে নাতি-নাতনীকে রাজপুত্র কোটাল পুত্রের গল্প শোনাতেন ঠাকুর্দা। অন্ধকারের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে ঠাকুর্দার গা ঘেঁষে বসে রাক্ষস-রাক্ষসীর গল্পও শুনত ওরা। ঠাকুর্দা কখনও কখনও তাঁর পুলিশী জীবনের গল্প বলতেন। দুই ভাই বোন অবাক হয়ে শুনত সে সব কাহিনী।

একদিন কাবেজ ডাকাতের গল্প বলেছিলেন ঠাকুর্দা। এটাও তাঁর পুলিশী জীবনের একটা ঘটনা। বেশ জাঁকিয়ে গল্প শুরু করেছিলেন ঠাকুর্দা, 'বুঝলি ভাই, সে ছিল এক মস্ত ডাকাত। লোকে তাকে বলত কাবেজ ডাকাত। আসল নাম তার সোলেমান। ইয়া, মস্ত জোয়ান, তার ভয়ে লোকে কাঁটা হয়ে থাকত।' ঠাকুর্দার মুখের দিকে চেয়ে শুনছিল দুই ভাই-বোন। ঠাকুর্দা এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে বল্লেন, 'সেই ডাকাতটাকে একদিন ধরে ফেল্লাম।'

—তুমি একা! —দেবজ্যোতির চোখ দুটো বিস্ময়ে ঠিকরে বেরোতে চাইল।

—না-রে, একা কেন? আরও অনেক লোকজন ছিল।

তারপর ধীরে ধীরে সেই ডাকাত ধরার কাহিনীটা বলেছিলেন তিনি। কিন্তু কে সেদিন জানত, এই কাহিনীর শেষে এক ভয়ঙ্কর পরিণতি অপেক্ষা করছে! বৃদ্ধ ঠাকুর্দা সেদিন ঐ কাহিনীর পরিণতির কথা না জেনেই তাঁর কাহিনী শেষ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরই বংশধরকে দেখতে হয়েছিল সেই পরিণতি। তখন তিনি বেঁচে নেই।

দেবজ্যোতির ঠাকুর্দা তখন থানার বড়বাবু। হঠাৎ খবর এল জহিরুল হকের বাড়িতে কাবেজ ডাকাত আক্রমণ চালাতে আসছে। হক সাহেব মস্ত পয়সাওয়ালা লোক। তিনি তো ভয়ে অস্থির। বড়বাবু নিজেই গেলেন কাবেজ ডাকাতের সন্ধানে। রাত্রের অন্ধকারে গ্রামে ঢোকার পথে জঙ্গলের মধ্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন তিনি। সঙ্গে রইল কিছু সেপাই, আর কিছু গ্রামের সাহসী লোক। কিন্তু কোথায় কি। সাতদিন কেটে গেল ডাকাতের দেখা নেই।

অথচ খবর যেটা রটেছিল সেটাও একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়। বড়বাবুর মনে হল, নিশ্চয়ই তাঁদের অপেক্ষা করার সংবাদটা ডাকাতদের কেউ দিচ্ছে! অতএব একটা চাল চাললেন। দলবল নিয়ে তিনি ফিরে গেলেন থানায়। ভাবটা এই, আর ফিরবেন না সেখানে। কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারে ভিন্ন পথে আবার এসে বসলেন সেখানে। সঙ্গে সেপাই এবং খুব চেনা ও বিশ্বাসী স্থানীয় লোক। এই চালে বাজীমাৎ হল, জালে পড়ল কাবেজের দল।

ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত, নিঃঝুম, কেবল ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা আওয়াজ। তারই মধ্যে জনা তিরিশেক লোক বসে আছে গাছের আড়ালে। থমথম করছে চারপাশটা, পাশের লোকের নিঃশ্বাস ফেলার শব্দও যেন শুনতে পাওয়া যায়। এক একটী মিনটও যেন কাটতে চায় না, তবু বসে থাকে সবাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা। হঠাৎ সচকিত হয়ে ওঠে সবাই। দূরে শোনা যায় ঘোড়ার খুরের শব্দ। সে শব্দ ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে। পুলিশের দল প্রস্তুত হয়ে বসে! গ্রামে ঢোকার মুখে থমকে পড়ে ওরা, থেমে যায় ঘোড়ার খুরের শব্দ। অনেকক্ষণ সাড়া নেই আর। চারিদিকেই ঘন অন্ধকার, দূরের কিছুই ঠাহর হয় না। পুলিশের দলের করার নেই কিছু, তারা প্রস্তুত হয়ে বসে থাকে চুপ চাপ। খানিকটা পরে ভারি ভারি পায়ের আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়, ওরা এগিয়ে আসছে সামনের দিকে। ঘোড়াগুলোকে গ্রামের সীমানায় বেঁধে রেখে ওরা আসছে পায়ে হেঁটে।

পুলিশের দলের প্রত্যেকে এক একটী গাছের আড়ালে বসে প্রস্তুত হয়ে থাকে, কারও মুখে কথা নেই। মাত্র তিরিশ পঁয়ত্রিশ হাত দূরে এসে দাঁড়িয়ে যায় ডাকাতের দল। আবার সব চুপ চাপ। বোঝা যায় কিছু একটা সন্দেহ হয়েছে ওদের। কয়েকটা মিনিট মাত্র, তারপর তিনটী মশাল জ্বেলে নেয় ওরা, সে-মশালের আলো ঠিকরে পড়ে গাছের ওপর। লাল হয়ে যায় চারপাশটা। এতক্ষণে গোটা ডাকাত দলটা স্পষ্ট হয়ে 'ওঠে,—বারো জন ইয়া চেহারার পালোয়ান। বল্লম, সড়কি, ছোরা, তলোয়ার ওদের হাতে। সঙ্গে তিনটে বন্দুক! দলের সামনে কাবেজ ডাকাত, পরনে চাপা প্যাণ্ট, লম্বা ছুঁচলো গোঁফ, ফর্সা চেহারা, চোখ দুটো বাঘের মত জলছে, জঙ্গলের চারদিকটায় ঘুরছে সে চোখ। হাতে ভীষণ আকারের উদ্যত রিভলবার। হয়তো সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না, তাই অনেকটা নিশ্চিন্ত হল ওরা।

মশাল নিভিয়ে আবার এগিয়ে চলল ডাকাত দল, পুলিশের দলকে পেছনে রেখে এগিয়ে গেল সামনে। বড়বাবুর দল তখনও চুপ চাপ। বেশ খানিকটা

এগিয়ে যেতেই পুলিশের দলের সবগুলো টর্চের আলো গিয়ে পড়ল ডাকাতদলের ওপর, সঙ্গে সঙ্গে গুলির একটা ফাঁকা আওয়াজ করলেন বড়বাবু। আর তাঁর বজ্রগম্ভীর স্বর শোনা গেল, 'সবাই অস্ত্র ফেলে দাও নইলে গুলি করব।' কাবেজ ডাকাত সে কথার উত্তরে গলার স্বর লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বড়বাবুর একটা গুলি এসে লাগল তার হাতে, আরও একজন গুলি ছুঁড়তে উদ্যত হচ্ছিল, তারও পায়ে গিয়ে লাগল গুলি। বাকী সবাই ভয়ে নিজেদের অস্ত্র ফেলে দিল। গোটা দলটা ধরা পড়ল পুলিশের হাতে।

—তারপর কি হল, দাদু?

এতক্ষণ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে গল্প শুনছিল দেবজ্যোতি। ঠাকুর্দা একটু থামতেই অসহিষ্ণু হয়ে প্রশ্ন করেছিল সে।

—তারপর আর কি?—একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলেছিলেন ঠাকুর্দা, 'ধরা পড়ে কাবেজ ডাকাতের সে কী রাগ! আমাকে শাসিয়ে বল্ল, 'দারোগাবাবু এবার খুব জোর বেঁচে গেলে, তবে হ্যাঁ এর শোধ আমি তুলবই, বিচারে আমার তো ফাঁসি হচ্ছে না।'

—তুমি কি বল্লে?—বড় বড় চোখ করে প্রশ্ন করেছিল দেবজ্যোতি।

—আমি আর কি বলবো, হাসলাম।

—ডাকাতটার ফাঁসি হয়েছে?—রাণীর প্রশ্ন।

—নাঃ। চোদ্দ বছরের জেল হয়েছে।

—ফিরে এসে তোমায় যদি কিছু করে?—ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে দেবজ্যোতি।

—তাহলে আমার দাদু তার সঙ্গে লড়াই করবে।

দেবজ্যোতিকে জড়িয়ে ধরে গুড়ুক গুড়ুক করে তামাক টানতে থাকেন ঠাকুর্দা। আর ঐ তামাকের মিঠেকড়া গন্ধ, ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা ডাক, বাতাসে ভেসে আসা ফুলের সুবাস, অন্ধকারের বুকে জোনাকীর আমেজময় আলো, তার সঙ্গে দাদুর মুখে-শোনা ডাকাতদলের কাহিনী দেবজ্যোতির মনে কেমন এক স্বপ্নের মায়া এঁকে দেয়।

বাস্তবের রূঢ় সংঘাতে সে স্বপ্ন একদিন গুঁড়িয়েও গিয়েছিল।

সেটা উনিশশো ছেচল্লিশ। ভারতের রাজনৈতিক আকাশে তখন এক নিদারুণ সংকট। কংগ্রেস-মুসলিম লীগকে কেন্দ্র করে বৃটিশ সরকার এক মজার খেলায় মেতে উঠেছে। বৃটিশ সরকারের তরফ থেকে আলোচনার জন্য এসেছে ক্যাবিনেট মিশন। ভারতের ভাগ্য নির্ধারণ হবে এবার। দিল্লীতে তাড়াহুড়োর শেষ নেই। একদিকে রয়েছে লর্ড পেথিক লরেন্স, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস আর

অন্যদিকে গান্ধী-আজাদ এবং জিন্না সাহেব। চল্লিশ কোটি মানুষের জীবন নিয়ে তখন চলছে টানা পোড়েন। আলোচনার তুলাদণ্ডে কখনও এদিক ভারি হয় কখনও ওদিক। সমতা আর আসে না।

এদিকে ভারত তথা বাংলা দেশের আবহাওয়া ক্রমশ বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। চাচা-কাকার সম্পর্কে ঘুন ধরেছে। কোন এক অদৃশ্য শক্তির চক্রান্তে নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে মেতে উঠেছে গোটা জাতটা—আত্ম-হননে তখন মশগুল সে!

বাইরের হাওয়ায় যখন এমনি বিষের নেশা তখন হঠাৎ একদিন সোলেমান তথা কাবেজ ডাকাত দেবজ্যোতিদের বাড়ি এসে হাজির। কদিন আগে মুক্তি পেয়েছে সে। ঠাকুর্দা তার অনেক আগেই গত হয়েছেন। দেবজ্যোতির বাবা তখন কোর্টের কাগজ নিয়ে ব্যস্ত। সোলেমান তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'উকিলবাবু, আমায় চিনতে পারছেন?'

উকিলবাবু মুখ তুলে তাকিয়েছিলেন, দাড়ি গোঁফ কামানো, প্যাণ্ট সার্ট পরা একজন প্রৌঢ় মানুষ। চিনতে পারলেন না উকিলবাবু।

—চিনতে পারলেন না তো?—হাসল সে—'আমি সোলেমান, কাবেজ ডাকাত, আপনার বাবা আমায় ধরে ছিলেন। শুনলাম তিনি নাকি—।'

—হ্যাঁ, মারা গেছেন। বসুন আপনি।

—বড় আশা নিয়ে এসেছিলাম,দেখা হল না।

সোলেমান সেদিন বসে দেবজ্যোতির বাবার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প গুজব করেছিল। তারপর চলে গিয়েছিল এক সময়।

সোলেমানের সেদিন দেখা করতে আসার মধ্যে কোনো অভিসন্ধিই প্রকাশ পায় নি। হয়তো কোনো অভিসন্ধিও ছিল না তার। রমজান আলির সঙ্গে দেখা না হলে হয়ত ঘটতও না কিছু। কিন্তু সমাজে রমজান আলিরা চিরকাল থাকে, সুযোগের অপেক্ষায় ওঁৎপেতে থাকে এখানে সেখানে। কামনাসক্ত রমজান আলির সামনে সেই সুযোগ এসেছিল। সাম্প্রদায়িকতার ভয়াল তরঙ্গ তখন উত্তাল হয়ে উঠেছিল সমগ্র দেশে, আর তারই পরিপূর্ণ সুযোগ নিয়েছিল রমজান আলি ও সোলেমান।

কাবেজের কথা শুনে দেবজ্যোতির মা কেমন ভয়ার্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'হ্যাঁগা ঐ ডাকাতটা কেন এসেছিল?'

দেবজ্যোতির বাবা হেসে বলেছিলেন, 'এখন আর ডাকাত বলছো কেন? ও ভাল হয়ে গেছে, কি একটা ব্যবসা করবে বলছে।'

—কি জানি বাপু, ওদের কথার কোনো বিশ্বাস নেই। আমার কেমন ভয় করছে।

—কেন?

—মনে আছে তো, বারবার বাবাকে শাসিয়েছিল—এর প্রতিশোধ সে নেবেই।

হো হো করে হেসে উঠেছিলেন দেবজ্যোতির বাবা, বলেছিলেন, 'কথাটা ভারি রোমান্টিক। কিন্তু কি জান, যা ভাবা যায় তা-ই করা যায় না। সমাজ বলে একটা জিনিস আছে তো।'

—কি জানি বাপু—।

মা কথাটাকে মনে প্রাণে মানতে পারেন নি। দেবজ্যোতির বাবা হেসে বলেছিলেন, 'তোমার জেনে কাজও নেই, তুমি বরং এক কাপ চা খাওয়াও।' তারপর দুজনেই হেসেছিলেন ওঁরা।

ব্যাপারটা ওখানেই থেমে থাকেনি। আবার একদিন এসেছিল সোলেমান, সঙ্গে এক সুদর্শন যুবক আর রমজান আলি। সোলেমানের সঙ্গে আলি সাহেবকে দেখে বেশ অবাক হয়েছিলেন দেবজ্যোতির বাবা। কেমন একটু খটকা লেগেছিল তাঁর, কথাটা না বলেও পারেননি। কাবেজকে দেখিয়ে বলেছিলেন, 'আলিসাহেব, এঁকে চেনেন নাকি?'

—কন কিঁ উকিলবাবু? অনেকদিনের আলাপ যে।—হেঁ হেঁ করে হেসেছিল রমজান আলি। বলেছিলেন, 'সোলেমান সাহেব হল্য কারবারি লোক, মাঝে একটুক গণ্ডগোল হছিল। আমার সঙ্গে অনেক দিনের আলাপ।'

—বেশ ভাল। তা' হঠাৎ আপনার মত বড়লোক আমার মত গরীবের ঘরে?

—আরে কি-যে কন উকিলবাবু, গরীব বড় লোক কি আর ট্যাকায় হয়, গরীব বড় লোক মনে। ছাড়ান গ্যান সে কথা। আসলে আপনার সঙ্গে দ্যাশের কথা নিয়া একটুক আলোচনা করতে আলাম। আপনারা তো অনেক খবর রাখেন। দ্যাশের এখন কি হাল কন?

দেবজ্যোতির বাবার তখন পুরনো কথাটাই মনে পড়ছিল। ওঁর বাবা কাবেজ সম্বন্ধে বলেছিলেন, এদের পেছনে কিছু প্রভাবশালী লোক রয়েছে তারাই এদের চালায়। আলিসাহেবকে দেখে সেই কথাটাই আবার মনে পড়েছিল তাঁর। অবশ্য সে-সম্বন্ধে কোনো কথা না বলে আলিসাহেবের প্রশ্নের উত্তরই দিয়েছিলেন তিনি। একটু হেসে বলেছিলেন, 'দেশের খবর আর কি বলব বলুন?'

—আরে আপনারা বলবেন না তো বলবে কে ?—একটু থেমে আবার বলেছিলেন,—'এবার পাকিস্তান না হয়্যে আর যায় না, নাকি কন উকিলবাবু ?'

—ওসব বড় বড় ব্যাপার।

—তা যাই কন উকিলবাবু, আমার কি মনে হয় জানেন ? মনে হয় হিন্দু আর মুসলমানের কোনো কাইজা কোনো ঝগড়াই থাকবি না যদি আমরা একটুক বুঝদার হই।

—কি রকম ?

—হিন্দু বিটি ছাওয়ালের সঙ্গে যদি মুসলমান ছাওয়ালের বিয়া হয় তাইলে -।

—তার চাইতে বলুন না হিন্দুরা যদি মুসলমান হয়।

—আরে না না আমার কথাটাই আপনি বুঝলেন না। ধরেন না ক্যান আপনার যে মেয়া আছে তার সঙ্গে যদি আমাগেরে ঘরের কোনো ছাওয়ালের বিয়া হয়, তা হল্যে কি আপনার জাত গেল ? অথচ দ্যাখেন তাইলে আপনার সঙ্গে আমাগেরে ভালবাসা বাড়ল। আকবর বাদশার আমলে এমন তো হত, নাকি কন ?

—কিন্তু ব্যাপারটা কি জানেন, আপনার মত মহান তো সবাই নয়, গণ্ডগোলটা সেখানেই।

হো হো করে হেসে উঠলেন আলি সাহেব, 'কি-যে কন, আমি আবার মহান !' তারপর বল্লেন, 'তা, এক কাজ করেন না, উকিলবাবু, আপনি শিক্ষিত, বিচক্ষণ আপনিই প্রথম শুরু করেন না। আমার জানাশোনা খুব ভাল ছাওয়াল আছে, আপনার মেয়াকে তারও খুব পছন্দ, তাক আমারও খুব মনে ধরেছে। দিয়া দ্যান।'

দেবজ্যোতির বাবার গালে যেন কেউ একটা চড় মেরেছিল। তিনি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন আলিসাহেবের দিকে, এমন কথা কেউ তাঁকে বলতে পারে এ যেন তিনি ভাবতেই পারছিলেন না। আলি সাহেব আবার বলেছিলেন, 'কথাটা তা হল্যে খুলেই বলি।' পাশের ছেলেটিকে দেখিয়ে বল্লেন আলি সাহেব, 'এ হল্য সোলেমানের ফুফুর ছাওয়াল। খুব ভাল ছাওয়াল, মেট্রিক পাশ, শহরে বড় ওষুধের দোকান, অনেক পয়সা। আপনার মেয়াটাকে এর খুব পছন্দ —তা সত্যি আপনার মেয়াটা খুব সোন্দর। দিয়া দ্যান।'

চকিতে একবার ছেলেটির দিকে তাকিয়েছিলেন দেবজ্যোতির বাবা। ছেলেটি মুখ তুলে চাইতে পারছিল না কিছুতেই। বেশ বুঝতে পারছিলেন দেবজ্যোতির বাবা, ছেলেটিকে জোর করেই আনা হয়েছে। সব কিছুর মূলে কে রয়েছে তাও

বুঝতে পারছিলেন তিনি। মনে মনে উত্তেজিত হলেও বাইরে এতটুকু প্রকাশ না করে খুব সহজ কণ্ঠেই বলেছিলেন. 'আলি সাহেব, এমন একটা প্রস্তাব আপনি করতে পারলেন দেখে আমি খুবই অবাক হচ্ছি। যাক, কথাটা যখন বলেই ফেলেছেন তখন তো আর কিছু বলার নেই। আপনাকে আমি যথেষ্ট সম্মান করি তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি, এ জাতীয় কথা আর কখনও বলবেন না, শুধু আমাকে নয়, কাউকেই বলবেন না।'

তাঁর কথার ঝাঁঝে ছেলেটি কেমন অপ্রতিভ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, আসলে সে পালাতে চাইছিল। আলি সাহেব কিন্তু সহজ। হেঁ হেঁ করে হেসেছিলেন তিনি। হাসতে হাসতেই বলেছিলেন, 'আরে চটেন ক্যান, একটা কথার কথা ছাড়া কিছু লয়। সোলেমান আমাকে আইসা ধরল তাই একবার আলাম। আপনি না দিল্যে আর জোর কি। তা' আজ উঠি উকিলবাবু।'

ওরা উঠে গিয়েছিল সবাই। কিন্তু অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন দেবজ্যোতির বাবা। এলোমেলো নানা ভাবনা এসে জট পাকাচ্ছিল ওঁর মাথায়। সেই মুহূর্তে একটা কথা তাঁর কাছে খুব পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, হিন্দু-মুসলমানে বেশী দিন আর এক সঙ্গে থাকা চলবে না। আলি সাহেবের মত প্রভাবশালী লোকের কথায় এটাই স্পষ্ট হয়েছিল যে, ভেতরে ভেতরে বেশ একটা অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে উঠেছে, দেশ ভাগ হতে আর খুব বেশী দেরী নেই। এতদিনে অন্তত একটা বিষয়ে বৃটীশ সরকার কৃতকার্য হয়েছে, হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কে বড় রকমের ফাটল ধরাতে সক্ষম হয়েছে। ভারত হয়তো তাদের ছেড়ে যেতে হবে, তবে তাদের পায়ের চিহ্ন রেখে যাবে ভারতের বুকের ওপর। সে চিহ্ন আর কোনো দিন মুছবে কিনা কে জানে।

এইসব নানা কথাই ভাবছিলেন দেবজ্যোতির বাবা। সব কিছু ছাপিয়ে ব্যক্তিগত অপমানটাই বড় বেশী করে লেগেছিল তাঁর। কিন্তু প্রতিকারের কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তাঁর বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না, এ নিয়ে চৈ চৈ করলে সুফল কিছুই হবে না, বরং উল্টোটাই হওয়া সম্ভব। কাজেই কিল খেয়ে কিল চুরি করা ছাড়া আর কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না তিনি। জিন্না সাহেবের টু-নেশন থিওরিটা যেন তাঁর মাথায় তখন হাতুড়ি পিটছিল।

সেদিন থেকেই কেমন গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন দেবজ্যোতির বাবা। খুব কম কথা বলতেন, কি যেন ভাবতেন সব সময়। মা একদিন বল্লেন, 'আজকাল সব সময় কি এত ভাবো বলো তো?'

—কিছু না। ঐ আইনের কথাই ভাবি আর কি!

তারপর খানিকটা সময় চুপ করে থেকে বলেছিলেন দেবজ্যোতির বাবা, 'বুঝলে, দেশের ভাবগতিক বড় ভাল নয়। কখন কি হয় কিছুই বলা যায় না। হিন্দু-মুসলমানে কবে লড়াই বেধে যাবে কেউ বলতে পারে না। আমাদের হয়তো এদেশের সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে পিতৃপুরুষের ভিটেতেই একদিন আশ্রয় নিতে হবে।'

—সে কি কথা? স্বাধীনতার জন্য এত কাণ্ড চলছে তার মধ্যে হিন্দু-মুসলমানে লড়াই?—ভারি অবাক হয়েছিলেন দেবজ্যোতির মা। তারপর আবার বলেছিলেন তিনি, 'কেন দেশে কি নেতা নেই?'

—আছে শুধু নয়, বড় বেশী আছে। আর তাই ভয়, নিজেদের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে কখন তারা কি করবে কে জানে।

—বাঃ নিজেদের নিয়ে যারা অত বেশী মাতামাতি করে তারা কিসের নেতা?

এ কথায় হো হো করে হেসে উঠেছিলেন দেবজ্যোতির বাবা। অনেকদিন পর এমন প্রাণখোলা হাসি হেসেছিলেন তিনি। তারপর বলেছিলেন, 'তুমি যত সহজে কথাটা বুঝতে পারলে সবাই কিন্তু অত সহজে বুঝতে পারেনি কথাটা। তা যদি তারা বুঝতে পারত তবে কি নেতাদের খামখেয়ালী চলত?'

আর বেশী দূর কথা এগোয়নি, থেমে গিয়েছিলেন দু'জনেই। বলব বলব করেও আলিসাহেবের কথাটা কিছুতেই বলতে পারেননি দেবজ্যোতির বাবা। পাছে মা চঞ্চল হয়ে পড়েন তাই নিজেকে তিনি আড়াল করে রেখেছিলেন। কিন্তু ঘটনা যা ঘটবার তা ঘটেই ছিল।

সেটা ছিল বর্ষাকাল। সকাল থেকেই আকাশে কালো মেঘ জমেছিল। হয়তো মেঘ দেখেই রোকেয়া আসেনি সেদিন। দুই ভাই বোন গিয়েছিল স্কুলে। দেবজ্যোতির ছুটি হয় আগে, রোজকার মত সে ফিরেছিল একা। তখনও নামেনি বৃষ্টি, রাণীর ফেরবার পথেই বৃষ্টি নেমেছিল, মুসলধারে বৃষ্টি। আর সেই হয়েছিল কাল।

বৃষ্টি থেমেছিল একসময় কিন্তু রাণীর দেখা নেই তখনও। ঘণ্টা দুই কেটে গেছে তখনও ফিরল না সে। মা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, চঞ্চল হলেন দেবজ্যোতির বাবা। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে নিজেই বেরোলেন স্কুলে খোঁজ করতে। কেউ নেই সেখানে। এখানে সেখানে খোঁজ করলেন, খোঁজ করলেন দু'একটা মেয়ের বাড়িতে—কোথাও নেই রাণী। অস্থির হয়ে উঠলেন দেবজ্যোতির বাবা, ছুটলেন থানায়। থানায় খবর দিয়ে নিজেও খুঁজতে বেরোলেন চারদিক।

শেষ পর্যন্ত খোঁজ পাওয়া গেল এক পোড়ো বাড়ীর ভেতর। আসলে পাওয়া

গেল রাণীর সংজ্ঞাহীন দেহটা—হাত-পা ছড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ করে পড়েছিল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেহের কোথাও একটুকরো কাপড় নেই, জামা কাপড় জড়ো হয়ে পড়ে আছে এক ধারে। পাশবিকতার চিহ্ন সর্বত্র, বুকের ওপর নখের আঁচর স্পষ্ট, দু'খানা উরুতে রক্ত জমে আছে তখনও। মনে হচ্ছিল, একটা ফুলকে কেউ যেন থেঁৎলে রেখে গেছে। বাবার সঙ্গে দেবজ্যোতিও এসেছিল সেখানে। দিদির বিবস্ত্র, বিবর্ণ, পিষ্ট দেহের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠে কেঁদে মুখ ঢেকে ফেলেছিল দেবজ্যোতি। সেই দৃশ্যের দিকে দ্বিতীয়বার আর চোখ ফেরাতে পারেনি সে। আর দেবজ্যোতির বাবা? রাণীর দেহের ওপর অচেতন অবস্থায় ঢলে পড়েছিলেন তিনি।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়েছিল দেবজ্যোতি। একটা হাত দিয়ে মুখটা ঢেকেছিল একটুকাল, ভেতরের আবেগটাকে সংযত করে নিতে চাইছিল সে। দেবজ্যোতির পাশেই বসেছিল ললিতা, কেমন অন্যমনস্কভাবে বাইরের দিকে চেয়ে বসেছিল সে। আমি কৌতূহলটা দমন করতে পারছিলাম না, জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'তারপর?'

—তারপর?—মুখ থেকে হাতটা সরিয়ে নিয়েছিল দেবজ্যোতি।

তারপর আর কি! দিদিকে হাসপাতালে দেওয়া হল, জ্ঞান আর ফিরল না। পুলিশ তদন্ত করল, কোনো ফল হল না।

—সেই আলিসাহেব, সোলেমান তাদের সন্দেহ করা হল না?

—হল বৈকি! কিন্তু প্রমাণ হল, এই ঘটনার সাতদিন আগে থেকেই তারা শহরের বাইরে ছিল।

—ব্যস্ সব চুপ হয়ে গেল?

—তাছাড়া আর কি হবে? নানা আরও একটু বাকী ছিল—আলিসাহেব আর কাবেজ কিছুদিন পর বাবাকে সান্ত্বনা দিতে এসেছিল।

—আশ্চর্য তো!

আমাদের কথাবার্তার মাঝে ললিতার চোখে মুখে কেমন যেন একটা উত্তেজনার ছাপ প্রকাশ হয়ে পড়ছিল। ওর নাকের ডগায় ঘাম, কান দুটো ঈষৎ লাল, এলোমেলো চুলগুলো গাল ছুঁয়ে ছিল। বাইরে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে আমার চোখে চোখ রেখে বলেছিল, 'এই ঘটনা প্রসঙ্গে একটা কথা আমার বার বার মনে হয়।'

—কি?

—মনে হয় এই পুরুষ শাসিত সমাজে মেয়েরা বেঁচে নেই।

—বেঁচে নেই ?

আমি অবাক হই। দেবজ্যোতিও ভুরু কুঁচকে তাকায় ওর দিকে।

—আসলে এই সমাজে মেয়েরা পণ্যসামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়,—তারা পুরুষের ভোগ্যবস্তু।

—তার মানে ?

—ইতিহাস তাই বলে। পৃথিবীতে একটা জাতির সঙ্গে আর একটা জাতির লড়াই হয়েছে বারবার, লড়াই হয়েছে একটা দলের সঙ্গে আর একটা দলের। এই লড়াই মেয়েরা বাধায়নি, বাধিয়েছে পুরুষই—অথচ সেই সব লড়াইয়ে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে মেয়েদের। ইতিহাসে পদ্মিনীরা বারবার বলি হয়েছে। আজকের পৃথিবীতেও তার ব্যতিক্রম নেই, সময়ে সুযোগে সেটা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

—এর কারণ ?

—প্রধান কারণ বলে আমার যেটা মনে হয়, তা' হল, দৈহিক শক্তির তারতম্য।

—সেটা তো প্রাকৃতিক, তার ওপর তো কোনো কথা চলে না।

—হ্যাঁ, সমাজ পত্তনের গোড়ায় এই শক্তির তারতম্যই ছিল শেষ কথা। স্ত্রী-পুরুষ সকলের ক্ষেত্রেই সেটা প্রযোজ্য ছিল, শক্তিমানের পায়ের নীচেই পৃথিবী দলিত হয়েছে। তারপর ধীরে ধীরে সভ্যতা এগোতে লাগল, প্রশ্ন উঠল সমতার। পুরুষ তুলে ধরল গণতন্ত্রের ধ্বজা।

—পুরুষ তুলে ধরল মানে ?

—তাছাড়া আর কি ! গণতন্ত্র মানে তো পুরুষের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা।

—তাই কি ?

—একটা উদাহরণ দি।—একটু সোজা হয়ে বসল ললিতা।

তারপর বল্ল, 'ইংলণ্ডের মত দেশেও ভেদাভেদটা দেখুন। ওখানে উনিশশো আটাশ সাল পর্যন্ত ভোটের ব্যাপারে মেয়েদের বয়স-সীমা ছিল পঁয়ত্রিশ আর ছেলেদের ক্ষেত্রে একুশ। জানি, শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে অনেক যুক্তি দেবেন, তবু বলুন তো এটাতে কি মেয়েদের সোজাসুজি অপমান করা হয়নি ? আসলে কি জানেন, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই পার্থক্য, কখনও প্রকাশ্যে, কখনও আড়ালে।'

—কিন্তু এই সামাজিক সেট আপে মেয়েরা যে খুব একটা অসুখী তা তো মনে হয় না। তারা তো দেখি, রঙ চঙ মেখে দিব্যি আছে।

—উপায় কি ? যৌথভাবে লড়াই করে বাঁচার পথ জানা নেই, এককভাবে

বাঁচতে হলে এই সমাজে পুরুষের শরণ নিতেই হবে। তাই যেমন করে হোক পুরুষের মন জয় করতে হয় তাকে,—রঙ চঙ মেখে নিজেকে পণ্য-সামগ্রী করে সাজিয়ে তোলে সে। একটু গভীর ভাবে ভাবলেই দেখতে পাবেন এই রঙ চঙ মাখার পেছনে কত ব্যথা লুকিয়ে আছে।

—আর একটু পরিষ্কার করুন।—বললাম আমি।

ললিতাও বলল, 'মেয়েদের মধ্যে যে slave-mentality দেখা যায় সেটা একদিনেই আসেনি। বহুদিন তাদের দাসী করে রাখা হয়েছে বলেই তারা আজ নিজেদের ওপর আর বিশ্বাস রাখতে পারছে না। আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে বলেই অপরের কাছে নিজের security খুঁজতে যায়।'

—আপনি কিন্তু আর একটা দিক একেবারেই দেখছেন না।

আমাদের সমাজে মা-মাসিদের যে স্থান রয়েছে সেটা কি একেবারে ফেলে দেবার মত?

—কেন দেখবো না? তাঁরাও কিন্তু বেঁচে থাকেন পরের ওপর নির্ভর করে, পরগাছার মত।

—সমাজে পরের ওপর নির্ভরশীল কে নয়? সকলেই সকলের ওপর নির্ভরশীল।

—প্রশ্নট তো সেখানেই। এই সমাজ যে মেয়েদের ওপরও নির্ভরশীল সেটা যেন সে কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না। মেয়েদের কাছ থেকে পুরুষ তার দাবীটা জোর করেই আদায় করতে চায়।

—জোর করে?

-হ্যাঁ, জোর করে স্রেফ গায়ের জোর। আগে স্ত্রী ছিল স্বামীর সম্পত্তি, আজও কি তার কোনো পরিবর্তন হয়েছে? ব্যবহারে হয়তো একটু সুগারকোটিং পড়েছে, এই যা।

—নাঃ আপনি দেখছি একেবারে সিনিক হয়ে উঠেছেন। আপনার কথা মানলে, বলতে হয়, স্ত্রী পুরুষের মধ্যে ভালবাসার কোনো অর্থই নেই।

—কে বল্ল সে কথা? আসলে ভালবাসাই তো স্ত্রী-পুরুষের মিলনের একমাত্র সেতু হওয়া উচিত। আর আজ যেটা চালু আছে তার অনেকখানিই তো মেকী। আসল জিনিষটা নানাভাবে comouflaged হয়ে আছে। মেয়েরা যেদিন সত্যিকারের security খুঁজে পাবে সেদিন জীবন অনেক সহজ, অনেক সুন্দর হয়ে উঠবে।

—কি ভাবে আসবে সেই security?

—এই মুহূর্তে তা বলতে পারছি না। তবে এটুকু বলতে পারি, পুরুষের কাছে আত্ম-সমর্পণের মধ্যে সেই securi·y নেই। সেই security আসবে—।

ঠিক এমনি সময়ে বাধা দিয়েছিল দেবজ্যোতি। কখন একসময় উঠে গিয়ে তিন কাপ চা এনে রেখেছিল আমাদের সামনে। নিজে এক কাপ চা তুলে নিয়ে হাসতে হাসতে বলেছিল, 'বন্ধুবর, তিষ্ঠ ক্ষণকাল, অনেক ঝড় তুলেছো এবার একটু চা খেয়ে নাও।' আমিও হেসে বলেছিলাম, 'সেই ভাল।' ললিতা আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে হেসে বলেছিল, 'তাহলে আপাতত চায়ের কাপেই security পাওয়া যেতে পারে।'

সেদিনও এমনি করে আমাদের কথার মাঝে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল দেবজ্যোতি। তিন জনে ব্যাণ্ডেল চার্চে গিয়েছিলাম সেদিন। দেবজ্যোতি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল সব কিছু, আমি আর ললিতা এসে বসেছিলাম গঙ্গার ধারে। পেছনে চার্চ প্রাচীন দিনের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সামনে সবুজ গালিচায় মোড়া মাঠ আর তারই গা ঘেঁসে বয়ে চলেছে গঙ্গা। গঙ্গার দিকে মুখ করেই বসেছিলাম আমরা। গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা প্রশ্ন আমার মনে কেমন যেন দানা বেঁধে উঠেছিল। এক সময় ললিতাকে প্রশ্নটা করেও ফেলেছিলাম। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম, 'একটা প্রশ্ন করব?'

—একটা কেন হাজারটা করুন না।—হেসে উত্তর করেছিল ললিতা।

—প্রশ্নের সঙ্গে উত্তরটাও যে চাই।

—আমার জানার মধ্যে হলে উত্তর পাবেন নিশ্চয়ই।

উত্তর দিয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিল ললিতা। একটু চুপ করে প্রশ্ন করেছিলাম আমি, 'আচ্ছা দেবজ্যোতির সঙ্গে আপনার এই যে মেলামেশা, এ খবর কি আপনার বাড়ির সবাই জানেন?'

—জানেন বৈকি! লুকিয়ে কোনো কাজ তো আমি করি না!

—তাঁরা কোনো আপত্তি তোলেন নি?

—না।

—তাহলে হয়তো তাঁরা এটাকে সহজভাবেই মেনে নিয়েছেন, আপনার কি মনে হয়?

—আমার মনে হয়,—একটু থামল ললিতা, তারপর বলল,—'আমার মনে হয়, বাবা-মা এ ব্যাপারটাকে একেবারেই সিরিয়াসলি নেন নি। ওঁদের হয়তো ধারণা, এটা আমার একটা সাময়িক খেয়াল, দুদিনেই চলে যাবে।'

—তার মানে, আপনি বলতে চাইছেন এ বিয়েতে ওঁরা মত দেবেন না?

—আমার তো তাই মনে হয়।

—তাহলে?

—তাহলে আর কি! তাঁদের অমতে কাজ করলে চৌধুরী বাড়িতে আমার আর স্থান হবে না—বেশ সহজ ভাবেই বললে ললিতা।

—কষ্ট হবে না আপনার?

—হবে বৈকি!

ওর কণ্ঠে কোনো উদ্বেগ নেই। গঙ্গার দিকে একটুকাল দৃষ্টি রেখে বললে, 'বেশী কষ্ট কি জন্য হবে জানেন?'

—কি?

—এই ভেবে যে, স্নেহ-মায়া-মমতা জিনিষগুলো কত ঠুনকো। ওসব জিনিষ নিজেকে ভালবেসে নিজেকে ঘিরেই আবর্তিত হয়, যার প্রতি মায়া তাকে ঘিরে নয়।

—আপনার আমার সকলের ক্ষেত্রেই সে কথা প্রযোজ্য।

—অস্বীকার করি না। এর জন্য দোষ দিচ্ছি না কাউকে, সামাজিক কাঠামোটাই এর জন্য দায়ী। তাই দেখা যায় পরিবেশ ভেদে এই অবস্থার তারতম্য ঘটে।

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলোর পূর্ণ বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ থাকা প্রয়োজন, আর অর্থের ভারসাম্য বজায় না থাকলে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী হতে পারে না। কাজেই অর্থের বৈষম্য সমাজে যতদিন থাকছে ততদিন সুকুমার বৃত্তিগুলোর বিকাশ হওয়া অসম্ভব।

একটু থামল ললিতা, তারপর বলল, 'তাই দুঃখ হবে, কিন্তু রাগ হবে না। আর সে দুঃখও একদিন ঘুচবে যেদিন বুঝবো আমি এগিয়ে চলেছি এমন এক সামাজিক পরিবেশ গঠন করতে যেখানে মানুষ বিকৃত হয়ে বেড়ে উঠবে না,—এমন এক সমাজ যেখানে সমস্ত মানুষ সহজ সুন্দর হয়ে বেড়ে উঠবে।'

—তাহলে পুরনোকে বিসর্জন দেবার জন্য মনে মনে আপনি প্রস্তুত?

—বিসর্জন!

একটু চুপ করল ললিতা, কেমন স্বপ্নালু চোখে চাইল দূরে, গঙ্গার ওপারে। আমি ওর দিকে চেয়েই ছিলাম, ও দৃষ্টি ফিরিয়ে আমার চোখের ওপরে চোখ রেখে বলল 'আসলে আবাহন আর বিসর্জন উভয়ের জন্যই মানুষকে প্রস্তুত থাকতে হয় সর্বক্ষণ। মেসোমশাই বলতেন, আবাহন আর বিসর্জন এই দুই নিয়েই

জীবন, এর একটার বাদ দিলেই জীবন অর্থশূন্য হয়ে যায়। কাজেই জীবনকে জানতে গেলে এই দুই-এর জন্যই প্রস্তুত থাকতে হয় বৈকি।

—কি ব্যাপার, হাওয়ায় কেমন যেন দর্শনের গন্ধ পাচ্ছি?

ললিতার কথার মাঝে দেবজ্যোতি এসে উপস্থিত হয়েছিল। আর ঐ কথাটা বলেই ঝুপ করে বসে পড়েছিল আমাদের সামনে। আমার দিকে চেয়ে ঘাড় নেড়ে বলেছিল, 'উঁহু, এই পরিবেশে দর্শন একেবারে অচল।' গলায় একটু হাল্কা সুর ঢেলে বেশ কাব্য করে বলেছিল, 'এই যে কুলকুল গঙ্গা, শিরশিরে হাওয়া, ঝিরঝিরে রোদ মারানো বিকেল—এই পরিবেশে কি দর্শন জমে? তার চেয়ে—'

ললিতার চোখে চোখ রেখে আস্তে করে বলেছিল, 'একটা গান শোনাও না।'

ললিতা মিষ্টি করে হেসে আলার দিকে চেয়ে বলেছিল, 'দেখলেন মজাটা, এতক্ষণ নিজে কাটিয়ে এল চার্চে, এসে কোথায় একটু দোষ স্বীকার করবে তা' নয় এসেই গানের হুকুম।'

—হুঁ, কথাটার ভেতর যথেষ্ট যুক্তি আছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি জানেন, লোভটা আমিও সম্বরণ করতে পারছি না। কাজেই গেয়েই ফেলুন।

ললিতা হাসল। একটুকাল চুপ করে ধীরে ধীরে সুরু করল রবীন্দ্র সঙ্গীত।

সেদিন অনেকগুলো গান গেয়েছিল ও। ভারি ভাল লাগছিল, একটা মিষ্টি হাওয়ার বন্যা বয়ে গিয়েছিল যেন।

সূর্য একসময় পশ্চিমে ঢলে পড়েছিল, দীর্ঘ হয়েছিল গাছের ছায়া। সেদিনের মত গানের পালা শেষ করে আমরাও উঠে পড়েছিলাম। গীর্জার ঘণ্টার উদাস করা ধ্বনি তখন ছড়িয়ে পড়ছিল বাতাসে। খানিকটা পথ চুপ চাপ হাঁটার পর এক সময় বলেছিল ললিতা, চলো, জ্যোতি আজই বাবাকে গিয়ে সব বলি।'

—আজই?

—ক্ষতি কি? আজ হোক কাল হোক বলতে তো, হবেই।

—তা হবে, তবু—।

একটু ইতস্তত করল দেবজ্যোতি, তারপর বলল, 'তোমার নিজের দিকটা ভাল করে ভেবে দেখেছো তো?'

—নিজের দিকটা মানে?

—মানে, যে পরিবেশ থেকে তুমি আসছো সেই পরিবেশের সঙ্গে নতুন পরিবেশের তো কোনই মিল নেই। বলতে গেলে সবটাই অমিল। তাই

বলছিলাম, সমস্ত অবস্থাটা ভাল করে ভেবে দেখছো তো?

খানিকটা সময় চুপ করে রইল ললিতা, তারপর আস্তে আস্তে বললে, 'ভেবোনা ঝোঁকের মাথায় কিছু করছি। ভালভাবে ভেবেচিন্তেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি।' কথাটা শেষ করে নিঃশব্দে হাঁটল একটুকাল, তারপর পূর্বের জের টানল, 'তবে এ-কথা ঠিক যে, ডবসন কাকার স্নেহের স্পর্শ যদি না পেতাম, যদি শিউলীর আদর্শ সামনে না থাকত তবে হয়তো এমন করে ছুটে আসতে পারতাম না।' কথাটায় হয়তো একটু আহত হয়েছিল দেবজ্যোতি, ভুরু কুঁচকে ললিতার দিকে একবারের জন্য চেয়েই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল সে। হয়তো দেবজ্যোতির মনের অবস্থাটা বুঝতে পেরেছিল ললিতা, তাই বলেছিল আবার, 'তাই বলে যেন মনে করনা তোমার ভালবাসাকে আমি ছোট করে দেখছি। আমি বলতে চাইছি, তোমার ভালবাসা যেমন আছে, তেমনি আছে ডবসন কাকার স্নেহের ছায়া, আছে শিউলীর কর্মধারা, আছে তার মানুষ জন,—এই সব কিছু মিলিয়েই একটা পরিবেশ। পুরনো পরিবেশের চেয়ে এই পরিবেশটা আমার কাছে অনেক বেশী আকর্ষণীয়।'

ওরা দুজনে যখন গভীর আলোচনায় রত আমি তখন ইচ্ছে করেই একটু পেছিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু ওদের কথাবার্তা সবই কানে আসছিল আমার। ললিতার কথা শুনতে শুনতে ওর ওপর শ্রদ্ধায় মনটা ভরে উঠেছিল।

ব্যাণ্ডেল চার্চ থেকে ফিরে আমি গিয়েছিলাম আমার ডেরায় আর ওরা সোজা চলে গিয়েছিল শশাঙ্ক শেখর চৌধুরীর সামনে।

চৌধুরী সাহেব তখন তাঁর নিজের ঘরে কাজের মধ্যে ডুবে ছিলেন। দরজার ভারি পর্দাটা সরিয়ে ভেতরে ঢুকেছিল ওরা। মুখে পাইপ, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, মাথা জোড়া টাক, দাড়ি-গোঁফ কামানো,—গোলমাল মানুষটি নিবিষ্ট মনে একটা ফাইল দেখছিলেন। ঘরে ঢুকে প্রথমটা কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করেছিল দেবজ্যোতি। ঘরের চারদিকটায় একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়েছিল। সমস্ত মেজে দামী কার্পেটে মোড়া। ঘরের একপাশে দুটো সুশ্রী কাঁচের আলমারি, মোটা মোটা ইংরেজী বইয়ে ঠাসা। সামনের দেওয়ালে গান্ধীজীর বিরাট এক ছবি, তার ঠিক উল্টো দিকের দেওয়ালে রাণী ভিক্টোরিয়ার মস্ত এক অয়েল পেইনটিং। ঘরের প্রায় মাঝখানে বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিল। টেবিলটার এক পাশে গদি আঁটা খান কয়েক চেয়ার, আর এক পাশে স্বয়ং চৌধুরী সাহেব বসে রয়েছেন। চৌধুরী সাহেবের ডান পাশে একটা বড় আকারের বুককেস।

ওরা সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই মুখ তুলে চাইলেন শশাঙ্ক শেখর চৌধুরী। মেয়ের পাশে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক যুবককে দেখে ভুরু জোড়া একটু কুঁচকে উঠল তাঁর। পরক্ষণেই সহজভাবে হেসে বললেন, 'কি ব্যাপার তোমারা হঠাৎ ?'

ললিতাও সহজভাবেই বললে, 'তোমার কাছেই একটু প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তুমি তো দেখছি কাজে ব্যস্ত।'

—না-না ব্যস্ত কোথায় ? বলনা কি প্রয়োজন। বসো তোমরা।

ফাইলটা সরিয়ে রাখলেন চৌধুরী সাহেব। ওরা বসল পাশাপাশি। ওদের দুজনকে এক সঙ্গে দেখে ললিতাকে বললেন চৌধুরী সাহেব, 'তোমার সঙ্গীটিকে কিন্তু চিনতে পারলাম না, মা।'

—হ্যাঁ বাবা এঁর কথাই তোমায় বলেছিলাম। সেই যে দার্জিলিং গিয়ে পরিচয় হয়েছিল, ইনি সেই দেবজ্যোতি মুখার্জী—ভাল ইঞ্জিনীয়ার এবং শিউলী আশ্রমের বিশিষ্ট কর্মী।

—বেশ ভাল। যে কোন একটা অর্গানাইজেসনে যুক্ত থাকা মন্দ নয়।

পাইপটা মুখে নিয়ে এক গাল ধোয়া ছেড়ে দেবজ্যোতির দিকে চেয়ে বললেন তিনি, 'তোমাদের নিজেদের কোনো ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্ম আছে ?

—নিজেদের মানে ?—অস্বস্তি বোধ করল দেবজ্যোতি।

—আই মিন তোমাদের ফ্যামিলীর ?

—নানা আমাদের অবস্থা তো তেমন নয়, কেন ললিতা আমার অবস্থার কথা বলেনি ?

—হয়তো বলে থাকবে,—হাসলেন তিনি, - আমার মনে নেই।

আবার একগাল ধোঁয়া ছাড়লেন, তারপর দাঁত দিয়ে পাইপটা চেপেই ধীরে ধীরে বললেন, 'তা' ঐ অবস্থা নিয়ে তোমার সঙ্কোচের কোনো কারণ নেই। বাই দি বাই, তুমি বলছি বলে কিছু মনে করছো না তো ?'

—নানা মনে করব কেন ?

—যাক, ঐ অবস্থার কথা যা বলছিলাম, উদ্যোগীনম পুরুষো সিংহম।—আজ খারাপ অবস্থা আছে কাল ভাল হবে। আমার বাবার কথা বলি, তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাধারণ ঘরের মানুষ, বাট হি হ্যাড হাই এ্যামবিশন, আর ছিল প্রচণ্ড অধ্যবসায়। ফলে গ্যাখো, তিনি একটা সাম্রাজ্য তৈরী করে গেছেন। কাজেই আসল ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে, তুমি চেষ্টা করছো কিনা, তোমার এ্যামবিশন আছে কিনা।

দেবজ্যোতি চুপ করে ললিতার বাবার কথা শুনছিল সেই সঙ্গে তাঁকে বুঝবার

চেষ্টাও করছিল সে, ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারছিল না। ললিতা খানিকটা অন্য-মনস্কর মত আঙুল দিয়ে টেবিলের উপর আঁকিবুকি কাটছিল, হয়তো কিছু বলবার সুযোগ খুঁজছিল। ইতিমধ্যে চাকরটাকে ডেকে তিনকাপ কফির কথাও বলে দিয়েছিল সে।

ললিতার বাবা দেবজ্যোতির দিকে চেয়ে আবার বললেন, 'তবে কি জান, অনেকে আবার দারিদ্র্যের মধ্যে মহত্ব খুঁজে বেড়ান। তাঁরা মনে করেন, দরিদ্র না হলে মহান হওয়া যায় না। তাঁদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র, তাঁরা হলেন অসাধারণ। কিন্তু তোমার আমার মত সাধারণ মানুষ এ কথা তো বলতে পারে না। আমাদের জীবনে টাকা তো আর বাহুল্য নয় একান্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের তাই সাবধানে চলতে হয়, তাই না?'

দেবজ্যোতি একটু হাসবার চেষ্টা করল। আবার এক গাল ধোঁয়া ছাড়লেন চৌধুরী সাহেব, একটু হেসে বললেন, 'এসব বলছি বলে কিছু মনে করছো না-তো?'

—নানা মনে করব কেন?

—গুড।

এমন সময় কফি এসে পৌঁছেছিল ওদের সামনে। নিঃশব্দে তিন কাপ কফি ঢেলেছিল ললিতা। কফিতে একটা চুমুক দিয়ে ললিতার বাবা বলেছিলেন, 'হ্যাঁ যা বলছিলাম, কোনো অর্গানাইজেসনের সঙ্গে কানেকসন রাখা কিছু অন্যায় নয়, কিন্তু তা রাখতে গিয়ে একটা ইলিউসনের পেছনে ছোটাও তো ঠিক নয়।'

বাবার ইঙ্গিতটা বুঝতে এতটুকু কষ্ট হয়নি ললিতার। বাবার কথাটা তাই লুফে নিয়ে বলেছিল, 'ইলিউসন তো না-ও হতে পারে?'

—তবে কি?—ভুরু কুঁচকে চেয়েছিলেন চৌধুরী সাহেব।

—একটা আদর্শ নিয়েও তো মানুষ বাঁচতে পারে?

—আদর্শ? কিসের আদর্শ?

—বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন নীতিকে অবলম্বন করে বাঁচে, সেই কথাটাই বল-ছিলাম। তোমার যেমন একটা নীতি আছে, অন্যেরও তেমনি আর একটা নীতি থাকতে পারে।

—পারে, অস্বীকার করছি না। তবে সে-নীতি বাস্তবকে ভিত্তি করেই হওয়া উচিত এইটুকুই বলছি।

আর একটু সহজ হল ললিতা, সোজাসুজি আলোচনায় নামতে চাইল সে। বাবার মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'আমরা যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত তার

আদর্শেই আমরা অনুপ্রাণিত।'

—কি সে আদর্শ?—কেমন একটু হাল্কা স্বরে প্রশ্ন করলেন তিনি।

—অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই।

—অন্যায়ের বিরুদ্ধে? তা' কত অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করবে?

—মানুষে-মানুষে যে সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে মুখ্যত তারই বিরুদ্ধে।

— আর তোমরা কি পাবে?

—অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার না-করার আনন্দ। একটা নতুন সমাজ গঠন করতে এগিয়ে আসার আনন্দ।

—হুঁ। আজকাল তা'হলে বেশ বড় বড় জিনিষ নিয়ে ভাবছো। ভাল।

গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি। খানিকটা সময় সবাই চুপচাপ করেই রইল। নিঃশব্দেই কফি শেষ হল তিনজনের। একসময় দেবজ্যোতির দিকে চেয়ে বললেন চৌধুরী সাহেব 'তুমি এই প্রতিষ্ঠানে কতদিন আছ?'

—ছেলেবেলা থেকেই।

—ছেলেবেলা থেকে কি রকম?

—'মানে'—একটু অস্বস্তি বোধ করল দেবজ্যোতি—'মানে ছেলেবেলাতেই আমি মা-বাবাকে হারাই। ঘটনাচক্রে ভবসনকাকার সঙ্গে আমার পরিচয়, আমার লেখাপড়া ইত্যাদি সব তাঁরই সাহায্যে।'

—দ্যাটস্ সামথিঙ্ক। কেরিয়ারটা তৈরী করে নিয়েছো, এটা একটা বলবার মত কথা।

সোজা হয়ে বসলেন শশাঙ্কশেখর চৌধুরী। দাঁতে পাইপটা চেপে বললেন, 'কি জান ইয়ংম্যান, তোমার যদি টাকা না থাকে তাহলে সমাজে তুমি কেউ না। ললিতার কথা বাদ দাও, সে হল মেয়ে—বড় ঘরের মেয়ে, জীবনে ওর আঁচ লাগেনি এতটুকু, লাগবেও না কোনোদিন। কিন্তু তুমি তো তা নও, তোমার জীবনটাকে তৈরী করে নিতে হবে। এই ওল্ডম্যানের রিকোয়েষ্ট, ডোণ্ট রুইন ইওর সেলফ—আলেয়ার পেছনে ছুটে জীবনটাকে নষ্ট করে ফেলোনা।'

চশমাটা চোখ থেকে খুললেন শশাঙ্কশেখর, আবার চোখে দিলেন। একটু যেন উত্তেজিত মনে হচ্ছিল তাঁকে। ললিতার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন, তারপর বললেন, এম. এ. টা পাশ করার পর অনেকগুলো দিনতো কেটে গেল, যাও এবার বিলেতটা ঘুরে এসো। তোমার দাদাও তোমাকে বার বার যেতে লিখছে, আর দেরি করে লাভ কি? ফিরে এসে দুই ভাই-বোন নৌকোর

হাল ধরবে, আর আমি তখন রিটায়ার্ড লাইফ এনজয় করবো।'

ললিতা মাথা নীচু করে চুপ করে রইল। চৌধুরী সাহেব মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, 'কি চুপ করে রইলে যে?'

—আমার একটা কথা ছিল বাবা।

—বেশ তো বলবে, সময় কি পালিয়ে যাচ্ছে? হ্যাঁ যা বলছিলাম, এবার তাহলে সব ব্যবস্থা করে ফেলি, বিলেতটা ঘুরে এসো, কেমন?

—তার আগে আমার কথাটা শুনবে না?

—বলো।—ভুরু কুঁচকোলেন চৌধুরী সাহেব।

একটু অস্বস্তি বোধ করল ললিতা, ওর কপালে একটু একটু ঘাম দেখা দিল। খানিকটা সময় কারো মুখে কথা নেই, দেবজ্যোতির বুকে তখন হাতুড়ি পড়ছে।

—আমাদের দুজনের মধ্যে আণ্ডারস্টাণ্ডিং পরিষ্কার। আমরা তোমার অনুমতি চাইছিলাম।—মাথা নীচু করেই কথা ক'টা বললে ললিতা।

—অনুমতি! কিসের অনুমতি?

কথাটা বুঝেও বুঝতে চাইলেন না ললিতার বাবা। ললিতা সোজা মুখ তুলে চাইল, স্পষ্ট গলায় বললে, 'আমাদের বিয়ের।'

—হোয়াট! কি বললে?

চৌধুরীসাহেবের মুখ থেকে একটা চাপা হুঙ্কার যেন ফেটে পড়তে চাইল, হাতের মুঠিটা একটু দৃঢ় হল। এতটা তিনি যেন একেবারেই আশা করেননি।

—আমাদের বিয়েতে তোমার অনুমতি চাইছিলাম।—স্থির ললিতার কণ্ঠস্বর।

ললিতার দিকে একটুকাল স্থির চোখে চেয়ে রইলেন চৌধুরীসাহেব। নিজেকে একটু সহজ করে বললেন, 'আশা করি, এর কনসিকোয়েন্স কি হতে পারে, সেটা ভাল করে ভেবে দেখেছো?'

—ভেবেছি।—শান্ত ভাবেই উত্তর দিলে ললিতা।

—তবু আর একবার ভেবে দেখতে বলছি। সাতদিন সময় দিলাম, ক'টা দিন ভেবে ভাখো।

এবার দেবজ্যোতির দিকে মুখ ফিরিয়েছিলেন চৌধুরীসাহেব। গম্ভীরভাবে বলেছিলেন, 'এ্যাণ্ড ইউ, ইয়ং ম্যান, তোমাকেও আর একবার ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি। কি জান, দুই বিপরীত ধর্মী জিনিসের মধ্যে কিছুতেই মিল হতে পারে না, ইট ক্যানট বি। ললিতা মানুষ হয়েছে একভাবে, আর তুমি আর এক ভাবে, ভিন্ন পরিবেশে। তোমাদের মধ্যে মিল হওয়া অসম্ভব।

তোমাদের এ-বিয়ে কিছুতেই সুখের হতে পারে না। তাই বলছি, 'শান্তভাবে আর একবার ভেবে দেখো। থিঙ্ক টোয়াইস।'

শশাঙ্কশেখর চৌধুরীর সেদিনের কথাটা মনে হতেই কেমন যেন চমকে উঠেছিলাম আমি। মনে হয়েছিল, সত্যিই তো সুখী হল না ওরা। চৌধুরী-সাহেবের কথাটা ভাবতে ভাবতেই মনে পড়েছিল, ডবসনকাকার কাছে-শোনা তিরিশ বছর আগের একটা ঘটনা।

দশ

সেটা ছিল শীতের এক সকাল। ডিসেম্বরের শেষ। কনকনে উত্তুরে হাওয়া বইছে সদর স্ট্রীটের দোতলা বাড়িটার ওপর দিয়ে। উত্তরের কাঁচের জানালাগুলো বন্ধ। বন্ধ জানালায় আছড়ে পড়ছে সেই উত্তুরে হাওয়া। পূবের জানালা দিয়ে মস্ত একফালি রোদ এসে পড়েছে ঘরের মেজেতে। ঘরের ঠিক মাঝে বিরাট একটা টেবিল। টেবিলের ওপরে ফুলদানি। ফুলদানিতে লাল রঙের একগুচ্ছ গোলাপ। সেই গোলাপের ওপর এক জোড়া মৌমাছি। টেবিলের একটা কোণে হাতের ওপর ভর রেখে সেইদিকে চেয়েছিল আর্থার। ফুল আর মৌমাছির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনের উত্তেজনা অনেকখানি প্রশমিত হয়েছিল।

এ্যালফ্রেড ডবসন কিন্তু তখনও ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত উত্তেজিত ভাবে পারচারী করে বেড়াচ্ছিলেন। পায়চারী করতে করতে একসময় থামলেন। দেওয়ালে টাঙানো ক্লাইভের বিরাট ছবিটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। ছবিটার নীচেই বাঙালাদেশের একটা ম্যাপ। ম্যাপটার কাছে সরে এলেন এ্যালফ্রেড ডবসন। জলপাইগুড়ি জেলার ওপর একটা আঙুল রাখলেন। তাঁর আঙুল ম্যাপের ওপর ঘুরতে ঘুরতে এসে থামল জলপাইগুড়ি শহরের গায়ে তিস্তা নদীর নীল রেখার ওপর। আঙুল ওখানে রেখেই ঘুরে দাঁড়ালেন এ্যালফ্রেড। আর্থার তখনও একই জায়গায় একইভাবে দাঁড়িয়ে, দৃষ্টি তার পিতার মুখের ওপর নিবদ্ধ। এ্যালফ্রেড ঘুরে দাঁড়াতেই পিতাপুত্রে চোখাচোখি হল। পিতা এবার যেন একটু হাসবার চেষ্টা করলেন, তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'মাই ডিয়ার বয়, আমার কথা শোনো, টেমস-এর কূলে যে দেহ একদিন ভূমিষ্ঠ হয়েছিল তিস্তার জলে এমন অবহেলায় তাকে ভাসিয়ে দিও না। ভুলে যেওনা, টেমস আর তিস্তা এক নয়, এক হতে পারে না।

পৃথিবীর বুকে দুটির পরিচয় ভিন্ন। একটি বহন করে শাসকের গরিমা, আর একটি শাসিতের গ্লানি। দুটি কি কখনও এক হতে পারে? এক খাতে বইতে পারে কখনও? ফরগেট দ্যাট গার্ল, মাই বয়, ফরগেট দ্যাট গার্ল। একটা হিদেন মেয়েকে বিয়ে করে নিজের সর্বনাশ ডেকে এনোনা।'

কোনো উত্তর করেনি আর্থার। পিতার মুখের দিকে চেয়ে তাঁর আলঙ্কারিক কথাগুলোর অর্থ অনুধাবন করতে চেষ্টা করছিস সে। এবার পুত্রের কাছে এগিয়ে এসেছিলেন এ্যাডফ্রেড ডবসন। কোটের পকেটে দুটো হাত রেখে বসেছিলেন, 'ভেবোনা আমি তোমার কথা বুঝতে পারি না। যৌবনের সেন্টি-মেন্টের দাম দিতে আমি প্রস্তুত। তিস্তার যে মেয়েটি তার সমস্ত দেহ দিয়ে তোমাকে আকর্ষণ করছে তাকে পেতে চাও এতে আমার কোন আপত্তি নেই। পুরুষ মানুষ নিঃসঙ্গ থাকতে পারে না, পাঁচটা মেয়ের সাথে তার মেলামেশা থাকবে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু একজন নেটিভ মেয়েকে বিয়ে করা! দ্যাটস সামথিঙ্ক আনন্যাচারাল!' একটু থেমে আবার বলেছিলেন এ্যালফ্রেড, "ইংরেজ সোসাইটীর কেউ এতে সম্মতি দেবে না, দিতে পারে না। মেয়েটিকে কাছে রাখতে চাও আমার কোনো আপত্তি নেই, বাট নো ম্যারেজ।"

কথাগুলো শুনতে শুনতে আর্থারের কান দুটো ক্রমশ গরম হয়ে উঠেছিল, উত্তেজনায় ফুলে ফুলে উঠছিল নাকের পাটা। শেষের কথাটায় ঘাড়ের কাছে, কেমন যেন টন টন করে উঠল ওর। চোখে একটা তীব্র ঝাঁক অনুভব করল আর্থার।

এ্যালফ্রেড ডবসন পুত্রের কাঁধে একটা হাত রেখে প্রায় মন্ত্রোচ্চারনের মত বলেছিলেন, "আমার বাবা ছিলেন সত্যিকারের ক্রিশ্চিয়ান, তুমি তাঁর কাছেই মানুষ। আমি জানি, আমি বিশ্বাস করি, তুমি খৃষ্টধর্মের অপমান করতে পার না, আমার বাবার শিক্ষা তুমি বিফল হতে দেবে না।"

বাবার কথায় ঠাকুর্দাকে মনে পড়েছিল আর্থারের, মনে পড়েছিল হাসি খুশি সেই বুড়ো মানুষটিকে। ঠাকুর্দাকে মনে পড়তেই মনটা কেমন ভারি হয়ে উঠেছিল, দু'চোখ জলে ভরে উঠেছিল। দৃষ্টি সরিয়ে দিয়ে পাশের দেওয়ালের দিকে চেয়েছিল সে। দেওয়ালে টাঙানো একটা ছবির ওপর দৃষ্টি আটকে গিয়েছিল ওর। প্রভু যিশুর ছবি।—প্রভু যিশু কাঁধে বয়ে চলেছেন ক্রস, পরিশ্রমে তৃষ্ণায় নুয়ে পড়েছে তাঁর দেহ, তবু পথ বেয়ে চলেছেন তিনি। ঐ পথ কালভেরী পাহাড়ের পথ, ঐ পথ বিশ্বের করুণতম পথ—The street of Sorrow।

ছবিটার দিকে নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইল আর্থার। এতক্ষণ ওর মনটা যেন ভার শূন্য অবস্থায় ভাবছিল, এবার যেন একটা অবলম্বন খুঁজে পেল সে। দু'হাজার বছর আগের সেই করুণতম ঘটনার সাথে এক হয়ে গেল আর্থার। ভাবের দোলায় দুলতে লাগল সে, চিন্তার সাগরে তলিয়ে যেতে লাগল।— দু'হাজার বছর আগে বেথেলহেমের ছুতোর মিস্ত্রীর সেই সুপুরুষ মানুষটি জেরুজালেমের পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে কি চেয়েছিলেন সেদিন? তিনি চেয়েছিলেন, দুর্বলের ওপর থেকে সবলের অত্যাচার দূর হোক, মানুষে মানুষে সমতা আসুক, অসাম্যের অবসান হোক। কিন্তু কোথায়! আজও তো অসাম্যের অবসান হল না। কেন হল না?—চিন্তার ঘূর্ণিপাকে ঘুরতে লাগল আর্থার।

এ্যালফ্রেড ডবসন আর্থারের অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করেছিলেন। হয়তো ভেবেছিলেন তাঁর কথাটা পুত্রের মনে ধরেছে, এবার থেকে তাঁর মনোমত পথেই চলবে সে। তাই বেশ খানিকটা খুশি মনেই আর্থারের পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন তিনি, 'যাও এবার একটু ঘুরে এসো। মনকে অশান্ত রেখোনা, ফুর্তি করো।'

আর্থার দেরি করেনি আর। ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। বেরিয়েই সদর স্ট্রীট থেকে সোজা গিয়েছিল মানিকতলার সেই ছোট্ট দোতলা বাড়িটাতে।

জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতায় একদিন হঠাতই চলে আসতে হয়েছিল আর্থারকে।

রোজকার মত সেদিনও শিউলীদের বাড়ি গিয়েছিল সে, তার সর্বসময়ের সঙ্গী সাইকেলের পিঠে সওয়ার হোয়েই! সেই সাইকেলটা রেলিঙে ঠেসান দিয়ে বারান্দায় উঠতেই একেবারে শিউলীর মুখোমুখি। আর্থারের সারকেলের আওয়াজ শুনেই সে ছুটে বেরিয়ে আসছিল ঘর থেকে। চোখ মুখ তার শুকনো, সারারাত যে ঘুমোয়নি চোখে মুখে তার স্পষ্ট ছাপ। আর্থারকে দেখে খানিকটা উজ্জ্বল হোয়ে উঠেছে ওর চোখ, এতক্ষণে যেন একটা আশ্রয় পেয়েছে সে। আর্থারের দিকে মুখ তুলে বললে, 'তোমার জন্যেই এতক্ষণ বসেছিলাম, এত দেরী করলে কেন?'

—দেরী? কই না তো। ঠিক সময়েই তো এসেছি।

—কি জানি। আমার তো আর সময় কাটতেই চাইছিল না।

—কেন, কি ব্যাপার?

—বোসো বলছি।

বারান্দায় দু'খানা চেয়ারে দুজনে বসেছিল পাশাপাশি। তারপর ধীরে ধীরে

ঘটনাটা বলে গিয়েছিল শিউলী। গতরাত্রে শুভময় এসেছিল। মিনিট দশেক মাত্র ছিল, তারপর চলে গেছে। কবে আবার ফিরবে তার ঠিক নেই, আদৌ আর ফিরতে পারবে কিনা তাও অনিশ্চয়তার গর্ভে। পুলিশ নাকি ওদের দলের অনেককেই সন্দেহ করছে। তাই দলের লোকদের স্থান বদল করা হচ্ছে। শুভময় বদলী হয়েছে কলকাতার কাছাকাছি কোথাও। সামনে ওদের বিরাট কাজ। যে কোনো মুহূর্তে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হোতে পারে। সংঘর্ষে মারাও পড়তে পারে, আবার পুলিশের হাতে ধরাও পড়তে পারে। ধরা পড়লে ফাঁসীর দড়ি অনিবার্য। কাজেই কি হবে কিছুই বলা যায় না। তাদের এ যাত্রা সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার মধ্যে। গান্ধীজীর অহিংস নীতিতে ওরা বিশ্বাসী হোতে পারছে না, তাই জাতীয় কংগ্রেস থেকে ওরা বিচ্ছিন্ন। কংগ্রেস ওদের কাছে এখন এক রকম শত্রু শিবির, এদিকে পায়ে পুলিশের জাল। কাজেই খুব সাবধানে চলতে হচ্ছে ওদের।

কথা বলতে বলতে কান্নায় বুজে এসেছিল শিউলীর গলা। চোখে জল টলমল করে উঠেছিল। কান্না চাপতে কষ্ট হচ্ছিল ওর। কিছুকাল দু'জনেই চুপ। ধীরে ধীরে একসময় প্রশ্ন করেছিল আর্থার, 'তারপর?'

আঁচল দিয়ে চোখ মুছে নিয়েছিল শিউলী, আস্তে আস্তে বলেছিল, 'তোমার কথা বললে।'

—আমাকে কিছু বলতে বলে গেছে?

—হ্যাঁ। বলেছে, দাদার হয়ে আমি যেন তোমায় বলি, দাদার অবর্তমানে তুমি যেন আমার এবং বাবার দেখা শোনার ভার নাও।

—শুধু এই, আর কিছু না?

—আর কি বলবে?—কথা শেষ করেই আর্থারের চোখের দিকে একবার চেয়েছিল শিউলী। মুহূর্তে দুজনার চোখাচোখি হয়েছিল একবার। আর্থারের চোখের ভাষা পড়তে কষ্ট হয়নি শিউলীর। ধীরে ধীরে চোখ নামিয়ে নিয়েছিল শিউলী। ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আস্তে আস্তে বলেছিল, 'এদিকে আর এক বিপদ। বাবার অসুখটা এখন যে অবস্থায় দাঁড়িয়েছে, তাতে এখানে আর ফেলে রাখতে ভরসা হয় না। কলকাতায় নিয়ে যাওয়া দরকার। অথচ কেবল নায়েব মশাই আর চাকর বাকরের ওপর ভরসা করে যাওয়াও যায় না।'

—বেশ তো কালই চল না, আমি যাচ্ছি সঙ্গে।

—কিন্তু তোমাকে তো আবার তোমার বাবার অনুমতি নিতে হবে।

—কোনো দরকার নেই। এখন সব প্রশ্ন অবাস্তর।

আর দেরী করেনি, তারপর দিনই ওরা রওনা হয়েছিল কলকাতার পথে।

গাড়িতে এক সময় বলেছিল শিউলী, 'আচ্ছা, আমাদের সঙ্গে নিজেকে এমন করে জড়িয়ে ফেললে কেন বলো তো?' জানালা দিয়ে তখন বাইরের দিকে তাকিয়েছিল আর্থার। শিউলীর কথায় বাইরে থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে ওর মুখের ওপর রেখেছিল। কোনো কথা না বলে শিউলীর একটা হাত নিজের দুহাতের মধ্যে নিয়ে আবার বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়েছিল সে, শিউলীও আর কোনো কথা বলেনি, সরিয়েও নেয়নি হাত, সে-ও নিঃশব্দে বাইরের দিকেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছিল।

গাড়ি তখন এগিয়ে চলেছিল তার নিজস্ব গতিতে বিচিত্র শব্দ তরঙ্গের মধ্যে। দু পাশে বন-জঙ্গল, দূরে দূরে এলোমেলো পাহাড়। বাইরের সেই প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে ওরা বসে ছিল চুপচাপ। ফার্স্ট ক্লাসের কামরায় মাত্র ওরা তিনজন প্রাণী—আর্থার, শিউলী আর তার বাবা। পাশের কামরায় বাকী লোকজন—নায়েব, গোমস্তা, চাকর-বাকর। শিউলীর বাবা তখন ঘুমোচ্ছিলেন। আর সেই অবসরে জানালার ধারে ওরা বসেছিল পাশাপাশি।

আর্থারের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে শিউলী এক সময় বলেছিল, 'অবাক হয়ে এক এক সময়ে ভাবি, কি করে এমন হল, সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের মানুষটি কেমন করে এত ঘনিষ্ট হল? কি দেখল সে এই সাদা মাটা মেয়েটার মধ্যে?'

আর্থার চেয়ে রইল ওর চোখের দিকে একটুকাল। তারপর আবৃত্তি করল—

> I saw the smile—the sapphire's blaze
> Beside thee ceased to shine;
> It could not match the living rays
> That fill'd that glance of thine.

আবৃত্তি শেষ করে গাঢ় স্বরে বলল আর্থার 'এরপর নিশ্চয়ই আর জিজ্ঞাসা করবে না, সাতসমুদ্র তেরো নদী পারের এই মানুষটি তিস্তা পারের ঐ মেয়েটির মধ্যে কি দেখতে পেয়েছে?'

ম্লান হাসল শিউলী। একটুকাল দু'জনেই চুপ। আবার একসময় বলেছিল শিউলী, 'আজকাল কি যে হয়েছে আমার, নিজেকে কেবলই বড় অসহায় মনে হয়। মনে হয়, আমি যেন বড় একা। কেন এমন হয় বলো তো?'

—নিশ্চয় কোনো কিছু হারাবার ভয় তোমার মধ্যে প্রবল হোয়ে উঠেছে।

—কি জানি, তা' হবে। কেমন উদাস ওর কণ্ঠ।

আবার একটু চুপ করে থেকে বলল, 'বিয়ের দু,বছর পর যখন বিধবা হয়ে

ফিরে এলাম বাবার কাছে, তখন খুব কষ্ট হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এমন অসহায় বোধ করিনি। আজকাল ভারি কাঁদতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে হয়, কোথাও গিয়ে মন খুলে কাঁদি।'

আর্থার শিউলীর একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়েছিল। ধীরে ধীরে বলেছিল,—'ওটা ভালবাসার ধর্ম, পাবার পরই হারাবার ভয় তাকে পাগল কোরে তোলে। ওকে যতই প্রশ্রয় দেবে, ততই বাড়বে।'

এরপর আর কোনো উত্তর দেয়নি শিউলী। চুপ করে গিয়েছিল। আর্থারও কথা বাড়ায়নি আর।

সেদিন সেই সকালে সদর স্ট্রীট থেকে মানিকতলায় আসবার পথে এই কথাগুলোই মনে পড়ছিল আর্থারের।

একতলার ঘরটাতে গৌরীনাথ তখন খবরের কাগজ মুখে নিয়ে বসেছিলেন। আর্থারকে দেখতে পেয়েই বললেন, 'এসো বাবা, এসো। তোমার কথাই ভাবছিলাম।' আর্থার চেয়ারটা টেনে নিয়ে গৌরীনাথের পাশে বসে বললে, 'আজ কেমন আছেন?'

—বেশ ভালই তো আছি। চলাফেরা করতে কোনই অসুবিধে হচ্ছে না। আমার তো মনে হয় কলকাতায় না এলেও চলতো। শিউলী তো কিছুতেই শুনলে না।

—এসে তো ক্ষতি হয়নি, ওখানে একটু অনিশ্চয়তা ছিল তো। বিনা কারণে রিস্ক নেওয়ার দরকার কি?

—তা বলতে পারো।—কথাটা বোলে একটুকাল চুপ করে রইলেন গৌরীনাথ। তারপর প্রায় ফিসফিস কবে বলার মত করে বললেন, 'শুভময়ের কোনো খবর জান?'

গৌরীনাথের কথা বলার ভঙ্গি প্রায় চমকে উঠেছিল আর্থার। গৌরীনাথ আরও পরিষ্কার করলেন নিজেকে, বললেন, শিউলী আর তুমি আমার কাছ থেকে ব্যাপারটা লুকোতে চাইছ, কিন্তু আসলে আমি সব জানি।' আবার একটুকাল চুপ করে থেকে বললেন, 'এ-জানায় আমার দুঃখ নেই। আমার গৌরব যে, শুভময়ের মত ছেলের পিতা আমি। মরতে তো একদিন সবাইকেই হবে, কেবল এই মাঝের ক'টা দিন। এই ক'টা দিনের জন্য স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঘর সংসার সবাই করে, কিন্তু পাঁচ জনের কথা ভাবে কজন? কজন ভাবে দেশের কথা, দেশের স্বাধীনতার কথা? শুভময় নিজের কথা ভুলে দেশের কাজে নেমেছে, এতে আমি গৌরব বোধ করি। যেদিন কলকাতার এই বাড়িতে পুলিশ সার্চ করতে

আসে সেদিন খুব চঞ্চল হোয়ে পড়েছিলাম। পরে সব সহজ হোয়ে গিয়েছিল, তাই ওকে আর বাধা দিইনি কোনোদিন। সব জেনে শুনেও কথা বলিনি একটাও। শিউলীকে কিছু জানতে দিইনি পাছে আমি সব জানি একথা জেনে ও আঘাত পায়।'

চুপ করিলেন গৌরীনাথ। সব শুনে আর্থার স্তব্ধ হোয়ে গিয়েছিল। বারবার মনে হচ্ছিল ওর, এমন পিতা না হোলে কি শুভময়ের মত এমন সন্তান হয়?

গৌরীনাথ চেয়েছিলেন বাইরের দিকে। চোখ দুটো ছলছল করছিল তাঁর। ধীরে ধীরে আবার বলেছিলেন, 'শিউলীর জন্য ভাবিনা, বি এ, পাশ করেছে, গান বাজনা জানে, বুদ্ধিমতী। জমিদারীর যা আয় তা' দিয়ে ও চালিয়ে নিতে পারবে। আর তুমি যদি ওর পাশে এসে দাঁড়াও তবে তো কোনো ভাবনাই থাকে না।'

—আমার সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, কাকাবাবু। আপনি যা আদেশ করবেন আমি তাই করবো।

—জানি জানি আর্থার, তোমার মত ছেলে পাওয়া ভাগ্যের কথা। তোমার মত ছেলে কোটীতে গুটি-কয় হয়। আমরা ভাগ্যবান তোমার মত ছেলের সংস্পর্শে এসেছি।

কেমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন গৌরীনাথ। কিছুক্ষণের জন্য উজ্জ্বল হোয়ে উঠেছিল তাঁর চোখ মুখ। তারপর আবার কেমন একটা বিষণ্ণতার ছায়া ঘনিয়ে এসেছিল তাঁর চোখে। আর্থারের দিকে চেয়ে বলেছিলেন, আজকের কাগজ পড়েছো?'

—না। কেন?

—একটা খবর আছে। মেছুয়াবাজার অঞ্চলে কিছু সংখ্যক ছেলে কতগুলো পোষ্টার বিলি করেছিল, তাকে কেন্দ্র করে পুলিশ একটা বাড়িতে হানা দিয়ে খানা তল্লাসী চালায় এবং বেশ কিছু সংখ্যক রিভলবার, কার্টিজ, তাজা বোমা উদ্ধার করে। কয়েকজন ছেলে ধরা পড়েছে আর কিছু ফেরার হয়েছে। যারা ফেরার তাদের মধ্যে শুভময়ের নামও আছে।

'শুভময়ের নামও আছে' কথাটা শুনেই প্রায় চমকে উঠেছিল আর্থার। প্রায় আপনা হোতেই কথাটা বেরিয়ে গিয়েছিল ওর মুখ থেকে, 'তাহলে?'

—তা হোলে আর কি, পুলিশ হয়তো আমাদের বাড়িতেও হানা দেবে, জেরায় জেরায় আমাদের বিব্রত করে তুলবে। নীরবেই সহ্য করতে হবে সব।

এরপর গৌরীনাথের কাছ থেকে উঠে সোজা দোতলায় চলে গিয়েছিল আর্থার। শিউলী তখন একটা বই খুলে বসেছিল। খোলা চুলগুলো ঘাড়ের দু'পাশ দিয়ে এসে বুকের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। আর্থার সামনে এসে দাঁড়াতেই চোখ তুলে তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়েছিল সে। আর্থার ওর চিবুকে হাত দিয়ে বলেছিল, শিউলী আমি ব্রাহ্ম হব, ব্রাহ্ম হোয়ে তোমায় বিয়ে করবো। একদিনও দেরী করা চলবে না।'

—হঠাৎ এত তাড়াহুড়ো কেন?

—কি হবে কিছু বলা যায় না, ঘটনার স্রোত খুব দ্রুত বয়ে চলেছে।

—বেশ তাই হবে। তোমার যা ইচ্ছে।

—আঃ বাঁচালে শিউলী।

তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বসে পড়েছিল ডবসন সাহেব।

তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে শুভময়ও বলেছিল সেদিন, 'তুই আমায় বাঁচালি আর্থার, স্যুটকেসটা নিয়ে বড় ভাবনায় পড়েছিলাম।'

তখন সব সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। গ্যাসের আলোর ফাঁকে ফাঁকে জমাট বাঁধা অন্ধকার। শীতকাল, তায় কুয়াশায় ঢাকা পথে লোক জন খুব বেশী নেই। ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীট পায় হোয়ে আপন মনে হেঁটে চলেছিল আর্থার। হঠাৎ কাঁধের উপর মানুষের হাতের চাপ পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সে। পেছন ফিরে চেয়ে দেখেছিল এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে। পরনে সাহেবী পোশাক, কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফে ঢাকা মুখ, চোখে চশমা, হাতে একটা চামড়ার স্যুটকেস। অপরিচিত লোকটিকে দেখে কেমন অস্বস্তি বোধ করেছিল। বলেছিল, 'একস্‌কিউজ মি, ঠিক চিনতে পারছি না।'

মুচকি মুচকি হাসছিল লোকটি। আর্থারের প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে বলছিল, 'আমি শুভময়।'

—তুই!—প্রায় চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল আর্থার।

—চুপ! লোকে শুনতে পাবে।

চমকে উঠে থেমে গিয়েছিল আর্থার। সহজ হোতে সময় লেগেছিল একটু, বলেছিল, 'তারপর?

—রাস্তায় দাঁড়িয়ে হবে না, তোর বাড়ি চল, একটা রাতের জন্য এই স্যুটকেসটা তোর কাছে রেখে যাব। আমার ব্যাপারটা জানিস তো?

—হ্যাঁ কাগজে দেখলাম।

দু'জনে পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করেছিল। একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছিল শুভময়। শুভময়কে প্রশ্ন করে আর্থার, পায়ে কি হোল ?

—কিছু না, দাড়ি-গোঁফের সঙ্গে ওটাকেও স্থান দিয়েছি।

—ড্রেসটা কিন্তু সত্যিই খুব ভাল হয়েছে।

—সে তো বুঝতেই পারছি, তুইও যখন আমায় চিনতে পারলি না! যাক বাড়ির সব খবর কি ? বাবার শরীর এখন কেমন ? শিউলী ভাল ?

—হ্যাঁ, কাকাবাবু এখন অনেক সুস্থ শিউলীও ভাল। ওরা যে এখানে আছে তুই জানলি কি কোরে ?

—দলের লোকের মারফৎ, ওরা সব সময়ই তোদের খোঁজ খবর রাখে। ভাল কথা, তোর বাবা কিন্তু শিউলীর কাছ থেকে তোকে সরিয়ে নেবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। ভয় হয়, ওরা শিউলীর ওপর হামলা কোরে না বসে।

—সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিস, আমার প্রাণ থাকতে তা হোতে দেবো না। তাছাড়া দু'একদিনের মধ্যে শিউলীকে আমি বিয়ে করছি।

কথাটা শুনে আর্থারের দিকে একটুকাল চেয়েছিল শুভময়। তারপর আস্তে আস্তে বলেছিল, 'খুব ভাল। একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত করলি আমাকে। এক এক সময় কি ভাবি জানিস ? ভাবি, তুই, এণ্ড্রুজ সাহেব, এদের মত লোক ইংলণ্ডে জন্মেছে বলেই ইংরেজ জাতি পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যাবে না, নতুবা একদিন তাই যেতো।'

আর্থার আর শুভময় একসময় সদর স্ট্রীটের সেই বাড়িটায় গিয়ে ঢুকেছিল। আর্থারের একতলার ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল ওরা। দুজনে মুখোমুখি বসে থাকা বলেছিল অনেকক্ষণ। একসময় বলেছিল শুভময়, 'আমাদের দলের সব প্রোগ্রাম তোকে স্পষ্ট বলতে পারব না। নীতিগত বাধা আছে, তবু খানিকটা ইঙ্গিত দিচ্ছি। মাস কয়েকের মধ্যেই অস্ত্র সংগ্রহের জন্য একটা বড় রকমের সংগ্রাম হবে। আমি অবশ্য তাতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নই।'

—কোথায় হবে কলকাতায় ?

—না, কলকাতা থেকে অনেক দূর। পূর্বাঞ্চলের কোনো একটা জায়গায়।

— তারপর ?

তারপরের প্রোগ্রাম নিয়েই আমরা চিন্তিত। ভেবেছিলাম, সুভাষকে কেন্দ্র করে বাংলা দেশে একটা বিরাট সংগঠন গড়ে তোলা যাবে। যে সংগঠন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়বে, আঠারশো আটান্নতে সংগঠনের অভাবে যা সফল হোতে পারেনি আজ তাই সম্ভব হবে। কিন্তু এখন দেখছি সে-আশা খুব কম।

—কেন ?

—আমি, সূর্য সেন, লোকনাথ আরও কয়েকজন সুভাষের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম, সুভাষ তো স্পষ্ট 'না' বোলে দিলে। এ-রকম সংগঠনে সে যোগ দিতে রাজী নয়।

—যোগ দিতে রাজী নয় ? কেন ?

—ওর মতে, এতে নাকি স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। এই মুহূর্তে গান্ধীজী জহরলালের বিরুদ্ধে ও যেতে নারাজ। সুভাষের মত ছেলে কি করে যে এই কথা বলতে পারল•ভেবে আশ্চর্য হোয়ে যাই। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন একজন বীর্যবান পুরুষ, তাঁরই ভাব-শিষ্য সুভাষ। অথচ সে কিনা গান্ধীজির পথকে মেনে নিয়েছে। এই পথ তো ভারতবর্ষকে ক্রমশ নির্বীর্য করে তুলবে। মানুষের প্রধান শত্রু হোল ধনকুবের শোষকশ্রেণী। স্বাধীনতার পরেও যে তারা শোষণ বন্ধ করবে তারও তো কোনো মানে নাই। গরীব ভারতবাসী যদি নির্বীর্য হোয়ে যায় তা হোলে স্বদেশী শোষকদের বিরুদ্ধে তখন দাঁড়াবে কি কোরে ? তাহোলে তো যে পরাধীনতা সেই পরাধীনতাই থেকে যাবে। অর্থ নৈতিক পরাধীনতাই তো চরম পরাধীনতা। দ্বিতীয়ত গান্ধীজির আন্দোলন তো মুসলীম সম্প্রদায়কে ক্রমশঃই দূরে সরিয়ে দিচ্ছে, রাজনীতির মধ্যে ধর্ম যেন ক্রমশঃই প্রধান হোয়ে উঠছে। ভারতবর্ষ বহুধর্মের সমন্বয়ে গড়া, এখানে রাজনীতিতে যদি ধর্ম প্রবেশ করে তবে একদিন না একদিন ভারতবর্ষ ভেঙে যাবেই। এই রকম একটা অবস্থায় সুভাষের মতো ছেলে কি কোরে যে নির্লিপ্ত থাকছে কিছুতেই বুঝতে পারছি না। একটু থেমে আবার বলেছিল শুভময়, 'স্বাধীন ভারতে যে শ্রেণী সংগ্রামের সমস্যাটাই বড় হোয়ে দেখা দেবে উচ্চতর অধিকার ভোগীরা যে দরিদ্রের ওপর পীড়ন করবে, এ-কথা স্বামী বিবেকানন্দ তো স্পষ্ট করেই বলে গেছেন। তিনি বলেছিলেন, স্বাধীনতা যে দিতে প্রস্তুত নয় সে স্বাধীনতা পাবার যোগ্যও নয়। ধরো, আজ যদি ইংরেজ সব ক্ষমতা তুলে দিয়ে যায় তখন ? তখন যারা ওই ক্ষমতা মুঠোতে পাবে, তারা ঐ ক্ষমতার দ্বারা জনসাধারণকে দমন করতে চাইবে—জনসাধারণের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে নেবে না। দাসেরা ক্ষমতা চায় অপরকে দাস বানাতে। বিবেকানন্দের এর বাণীর সামনে দাঁড়িয়ে সুভাষ কি করে পিছিয়ে পড়ছে ভাবতে পারছি না।'

—সুভাষবাবু হয়তো ভাবছেন, দেশের লোক এখন গান্ধীজির প্রভাবে এমন মুগ্ধ যে এই মুহূর্তে তাঁকে ছেড়ে আসতে গেলে জনসাধারণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন।

—যদি তাও হয় তবু সরে আসা উচিত। ভুল পথকে আঁকড়ে থাকার কোনো যুক্তি নেই। এই পথে স্বাধীনতা যদি কখন আসেও তবে তা' হবে ভিক্ষের নামান্তর। সেই স্বাধীনতায় ভারতের বৃহত্তর অংশের কোনো কল্যানই হবে না। আজ হোক কাল হোক সুভাষকে একদিন ঠিক সরে যেতেই হবে, তখন হয়তো পথ আর খোলা থাকবে না।

—দু' একজনের জন্য যদি এতখানি ক্ষতি স্বীকার করতে হয়, তাহোলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এত অস্ত্র এত অর্থ সংগ্রহ করায় লাভ কি?

—না, অতখানি হতাশা আমাদের নেই, থাকলে হয়তো এগোতে পারতাম না। আমাদের এ বিশ্বাস আছে, বিচ্ছিন্নভাবে হোলেও আমাদের এই প্রচেষ্টা বিফল হবে না। একদিন না একদিন দেশের মানুষ এর তাৎপর্য উপলব্ধি করবেই। অনাহারে অত্যাচারে ভারতের মানুষগুলো কি রকম কুঁকরে গেছে দেখছিস তো। বাইরের উত্তাপ না পেলে এরা কিছুতেই জেগে উঠতে পারবে না।

—তাহোলে পরের প্রোগ্রামের জন্য এত ইতস্তত কেন?

—আসলে কি জানিস এই জাতীয় আন্দোলনে গ্যারিবল্ডীর মত একটা নামের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে, একটা নামকে কেন্দ্র করে সমগ্র মানুষ দেহ মনে অনেকখানি শক্তি পায়, নিজের ওপর আস্থা ফিরে আসে। ভেবেছিলাম সুভাষকে দিয়ে সেই কাজটা করানো যাবে। কিন্তু তা' যখন হোল না—।

ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ একেবারে সোজা হোয়ে বসেছিল শুভময়, বাইরের কোনো শব্দে চঞ্চল হোয়ে উঠেছিল সে। মাত্র কয়েকটা সেকেণ্ড। পকেট থেকে রিভলবারটা বের করে শক্ত করে হাতের মুঠোয় ধরেছিল। আর্থারের কাছে মুখ নিয়ে বলেছিল,' পুলিশের বাঁশী। এক্ষুনি পুলিশ এসে পড়বে। তুই বই পড়ার ভান কর, পায়চারী করতে করতে যেন বই পড়ছিস। দরজাটা খুলে রাখ, আমি আড়ালে আছি, কিছুতেই যেন ভেতরে ঢুকতে না-পায়।'

প্রস্তুত হয়েছিল আর্থার। আর সত্যি সত্যি অল্পক্ষণের মধ্যেই এসে পড়ল পুলিশ। পুলিশ অফিসারটি ইংরেজ। আর্থার বই হাতে বেরিয়ে এল দরজার বাইরে। অফিসারটি সহাস্যে বললেন এদিকে কাউকে আসতে দেখেছেন?'

—কাউকে মানে? -হেসে ভুরু কুঁচকোল আর্থার।

—একজন টেরোরিস্টকে নাকি এদিকে আসতে দেখা গেছে, বাংলাদেশে এদের উৎপাত তো জানে?

—টেরোরিস্ট ! কি রকম দেখতে বলুন তো ?

—আসল চেহারা হয়তো অন্য ; বর্তমানে কাবুলীওয়ালার পোশাক আছে।

—কাবুলীওয়ালা ? নাঃ, এমন কাউকে দেখিনি।

—যাক, সাবধানে থাকবেন, একেই ইংরেজদের ওপর এদের রাগ, তার ওপর আপনাদের বাড়ি বন্দুক-রিভলবার আছে।— একটু হেসে বলেছিল অফিসারটি, জানেন তো অস্ত্রের ওপর এদের আবার খুব লোভ ?

—তা বটে !

বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিল পুলিশ দলটি। আর্থারও ঘরে ঢুকেছিল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। খোলা রিভলবারটা পকেটে পুরতে পুরতে শুভময় বলেছিল, 'ব্যাটাতো তাহোলে আমার পোশাকটাকে সন্দেহ করে নি। তবে করতো, আর কিছুক্ষণ স্যুটকেসটা হাতে থাকলেই করতো। শোন্, কাল আমি আর আসবো না, আর হাতের লেখা চিঠি নিয়ে যে আসবে তাকেই দিয়ে দিবি স্যুটকেসটা। চিঠিতে শুধু থাকবে - ভাল আছিস তো'।

এর একটুকাল পরেই উঠে গিয়েছিল শুভময়। যাবার সময় আর্থারের হাত দুটো ধরে বলেছিল, 'তোর সাথে আর দেখা হবে কিনা জানি না, বোধ হয় হবে না। বন্ধুর শেষ অনুরোধটা রাখিস, শিউলীর সমস্ত ভাল মন্দের দায়-দায়িত্ব তোর। বড় দুঃখী মেয়ে ও। তোকে হয় তো এ অনুরোধ করতাম না, কিন্তু শিউলী তোকে বড় বেশী ভালবেসে ফেলেছে।'

শুভময়কে জড়িয়ে ধরেছিল আর্থার। আবেগে গলাটা ধরে এসেছিল ওর। আস্তে আস্তে বলেছিল, 'আমি যে তোরই শিষ্য, শুভ। তোকে পেয়ে, শিউলীকে ভালবেসে আমার যে নূতন জন্ম হয়েছে। শিউলীর ভাল-মন্দ যে আমারই ভাল-মন্দ।'

দুই বন্ধুর চোখ জলে ছলছল করে উঠেছিল। কিন্তু কোন কথা বলতে পারেনি আর।

এগারো

সেদিন সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকেই আর্থারও প্রথমে কোনো কথা বলতে পারেনি। তারই ঘরে অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় ডরোথীকে দেখতে পাবে এ যেন তার স্বপ্নেরও অতীত। এতদিন পর বাল্যসঙ্গিনীকে দেখার আনন্দে যেমন উচ্ছ্বসিত হোয়ে উঠেছিল তেমনি লজ্জায় বিহ্বল হোয়ে পড়েছিল সে। এতক্ষণের চিন্তার জগৎ থেকে হঠাৎ কেমন যেন ছিটকে পড়েছিল আর্থার।

তখন রাত প্রায় দশটা। মানিকলতার বাড়ি থেকে ফিরছিল সে। পথে বারবার মনে পড়ছিল শুভময়কে, মনে পড়ছিল শিউলীর কথাগুলো।

আর্থার যখন গিয়ে পৌঁছেছিল শিউলী তখন একথা শেলাই হাতে নিয়ে গুণ গুণ করে গাইছিল,

রাই জাগো রাই জাগো শুক-শারী বলে।
কত নিদ্রা যাও কালা মাণিকের কোলে॥

আর্থার সন্তর্পণে একটা হাত ওর কাঁধে রেখেছিল। ওর স্পর্শে ভীষণ চমকে উঠেছিল শিউলী। আর্থারকে দেখে আশ্বস্ত হয়ে বলেছিল, 'ও তুমি! হঠাৎ বড ভয় পেয়েছিলাম।'

—আজকাল একটুতেই বড ভয় পেয়ে যাও। নিজের ওপর একটুও জোর নেই তোমার।—আর্থারের গলায় যেন একটু ভৎর্সনার স্বর।

—কি জানি।—অন্যদিকে মুখ ফেরাল শিউলী।

—যাক, একটা সুখবর আছে।

—কি?—আয়ত চোখ দুটো তুলে ধরলে শিউলী।

—কাল রাত্রে শুভময় এসেছিল।

—সত্যি! - হঠাৎ কেমন উচ্ছ্বসিত হোয়ে উঠেছিল শিউলী।

– হ্যাঁ। প্রথমটা তো চিনতেই পারিনি এমন নিখুঁত ছদ্মবেশ। একটা সুটকেসে করে কিছু রিভলবার আর কার্টুজ আমায় জিম্মায় রেখে গিয়েছিল। আজ সকালে ওদের দলের আর একজন এসেনিয়ে গেছে। ওরা খুব জোর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ কথা হোল ওর সাথে, তোমাদের কে কেমন আছে সব খবর ওর জানা।

—দাদাকে কেমন দেখলে. ভাল আছে?

—ভাল। কাজের আনন্দে একেবারে মশগুল। বেশ আছে।

—ভাল থাকলেই ভাল। কি হবে কে জানে!—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লে শিউলী।

—আমাদের বিয়ের খবর শুনে শুভময় খুব খুশী।

—দাদার মত আছে এই বিয়েতে?—কেমন যেন একটা অবিশ্বাসের সুরে প্রশ্ন করল শিউলী।

—কেন, তুমি কি ভেবেছিলে দাদার মত থাকবে না?

—ঠিক তা' নয়, তবু কেমন একটা সন্দেহ ছিল। জান তো, দাদা কতখানি ইংরেজ বিদ্বেষী?

—ঠিক এ-ভাবে বোলো না। আসলে ইংরেজ জাতির কাছে শুভময়ের অনেক দাবী। মানবতার দাবী। একটা দেশের মানুষের ওপর সমানে অত্যাচার চলেছে অথচ আর একটা দেশের মানুষ সব জেনেও চুপ করে বসে রয়েছে এতেই তার অভিমান। গোটা জাতির ওপর অভিমান। শুভময়ের মত মানুষেরা কাউকে ঘৃণা করতে পারে না, কারও বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষন করতে পারে না, ওরা আসলে দেশপ্রেমিক। মানবতার শত্রুই ওদের শত্রু। নইলে আমাকে ও বন্ধুভাবে নিতে পারতো না।

কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা বলতে পারেনি শিউলী। আর্থারের মুখের দিকে চেয়েছিল নিস্পলকে! এক সময় একটু একটু করে ওর মুখটা উজ্জ্বল হোয়ে উঠেছিল। আর্থারের পাশে দাঁড়িয়ে ওর কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে গুণ-গুণ করে একটা গান ধরেছিল। গান থামিয়ে একটু হেসে বলেছিল, 'তোমার কথা শুনে আজকাল আমারই অবাক লাগে। এমন কোরে কথা বলো যেন তোমার মাতৃভাষাই বাঙলা।'

—এক রকম তো তাই। তোমার ভাষা যে বাঙলা।—হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছিল আর্থার।

আর কোনো কথা বলেনি শিউলী. দুহাতে আর্থারের সোনালী চুলগুলো পাট করতে লেগেছিল সে। তারপর আবার এক সময় ধীরে ধীরে বলেছিল, 'আমার কিন্তু কেবল ঘর সংসার নিয়ে থাকতে ভাল লাগে না। এমন একটা কিছু করতে ইচ্ছে করে যাতে দেশের লোকের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে।' কথাটা শুনে শিউলীর মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়েছিল আর্থার, আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কি করতে চাও?'

—আচ্ছা, এমন একটা অর্গানিজেসন করা যায় না যার মাধ্যমে মানুষকে মানুষের কাছে আনা যায়? মানুষে মানুষে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য রয়েছে তা' দূর করা যায়? আমি ভেবে দেখেছি, একমাত্র ঐ পথে এগোলেই আমরা সত্যিকার স্বাধীনতা লাভ করবো। নইলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এলেও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আসবে না কোনদিন।

—শুভময়ের পথে তোমার বিশ্বাস নেই?

—কেন থাকবে না? পাহাড় কেটে পথ তৈরী করতে হোলে ডিনামাইটের প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যায় না, আবার তেমনি ডিনামাইটের পাশে পাশে পথ গড়ার হাতিয়ারও রেডী রাখতে হয়। আমি শুধু এই কথাই বলতে চেয়েছি।

খানিকটা সময় চুপ করে মনে মনে শিউলীর কথাগুলো ভাবল আর্থার তারপর বলল, 'বেশ তাই হবে। তোমার মনের মত একটা সংগঠন কি করে গড়ে তোলা যায় তা' আলোচনা করে দেখা যাবে।'

এই সব কথাগুলোই ভাবতে ভাবতে একেবারে মশগুল হয়ে নিজের ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল আর্থার। ঘরের ভেতর একটা ডিম আলো জ্বলছিল তখন। দরজাটা বন্ধ। নবটা ঘোরাতেই দরজাটা খুলে গেল। আর্থার যখন ঘরের ভেতর ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল তখনও সে নিজের চিন্তার জগতেই ডুব দিয়ে আছে। হঠাৎ একটা অস্ফুট শব্দে সজাগ হোয়ে সামনের দিকে চাইতেই কেমন যেন বিহ্বল হোয়ে পড়েছিল আর্থার।

প্রথমটা বুঝতেই পারেনি ঐ মেয়েটিই ডরোথী। ডরোথী তখন পোষাক বদলাতে উদ্যত, সোনালী চুলগুলো তার মাথার ওপর চূড়ো করে বাঁধা। সামনে সোফার ওপর টাল করে রাখা পোষাক। শরীরের কোথাও কোনো বস্ত্র নেই। আর্থারের আগমনে মুখে একটা অস্ফুট শব্দ করে বুকের ওপর তোয়ালেটা চেপে ধরেছিল মাত্র। সেই তোয়ালের ফাঁকে ডরোথীর উদ্যত যৌবনের পেলবতা কিন্তু হাত ধরে বসে ছাখো, তোমার কাঁধে মাথা রেখে কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে আছি, এতটুকু ভয় করছে না। মনে হচ্ছে, তুমি আমায় কোনোদিন ছেড়ে যেতে পারবে না।'

আর্থারের বাহুতে পিষ্ট হচ্ছিল ডরোথীর বুক, ওর গরম নিঃশ্বাস লাগছিল আর্থারের ঘাড়ে-গলায়। সমস্ত শরীরটা ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল আর্থারের। যতই ওর উত্তেজনা বাড়ছিল ততই যেন চিন্তাগুলো সব জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। বারবার ওর মনে একই প্রশ্ন জেগে উঠছিল, কেন ডরোথী হঠাৎ এমন ভাবে ছুটে এল, একি কেবল ভালবাসার তাগিদেই না আর কিছু? ওরা দু'জন দু'জনকে ভালবাসে ঠিকই কিন্তু সে-ভালবাসায় বন্ধুত্ব ছাড়া আর তো কিছু ছিল না! প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্কতো সেখানে কখনও প্রকট হয়ে ওঠেনি! ডরোথী নিজেও তো কখনও এমন ইঙ্গিত দেয়নি। তবে?

আর্থার স্পষ্ট ভাবে কিছুই যেন বুঝে উঠতে পারছিল না। ডরোথীর বাবা বিলেত থেকে প্রথম যখন দিল্লীতে চাকরী নিয়ে এলেন তারপর থেকে অনেকবার ওদের মধ্যে চিঠিপত্র আদান-প্রদান হয়েছে। কিন্তু সে-সব চিঠিতে ডরোথী কখনও নিজেকে এমন ভাবে মেলে ধরেনি। খুব সাদামাটা সে-সব চিঠি। মামুলি কথায় ভরা। কখনও কখনও নিজেদের গ্রামের কথা, পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের কথা, দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ার কথা লিখতো। ভারতীয়

নেতাদের সম্বন্ধে বিষোদগারও করেছে কখনও কখনও। এসব চিঠির মধ্যে প্রণয়ের গন্ধ এতটুকু ছিল না কিন্তু আজ হঠাৎ এমন কি ঘটল যার জন্য ওকে এমন করে ছুটে আসতে হল? তবে কি শিউলীর কথা জানতে পেরেছে ডরোথী? আর জানতে পেরেই চঞ্চল হয়ে ছুটে এসেছে? এতকাল যে ভালবাসাকে মনের মধ্যে গোপনে লালন করে এসেছে হঠাৎ সেখানে একটা অতর্কিত আঘাতে নিজেকে আর স্থির রাখতে পারেনি, তা-ই কি আজ মরিয়া হয়ে ছুটে এসেছে কলকাতায়? নিজের চোখে দেখতে এসেছে সব কিছু? এমনি সাত-পাঁচ ভাবনায় সব কিছু যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল।

আর্থারের কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে ডরোথী প্রশ্ন করেছিল, 'আর্থার, তুমি তো কোনো কথা বলছো না?'

—একটা কথা ভাবছি।

—কি কথা?—আর্থারের কাঁধ থেকে মাথা তুলে প্রশ্ন করল ডরোথী।

—ভাবছি, তুমি এতদিন স্পষ্ট করে তোমার মনের কথাটা প্রকাশ করোনি কেন?

—স্পষ্ট করে প্রকাশ করাটাই কি সব? মনের কথাটা কি কিছুই নয়? তুমি কি কখনও উপলব্ধি করতে পারনি যে, আমি এক মুহূর্তের জন্যও তোমায় ভুলতে পারিনা? আর এ-কথা কি কাউকে বলে দিতে হয়, একজন যুবতীর পক্ষে একজন অনাত্মীয় যুবককে ভুলতে না পারার অর্থ কি? বলো, এ-কথা কি কাউকে বলে বোঝাতে হয়?

কেমন এক উত্তেজনায় থর থর করে গলা কাঁপছিল ডরোথীর। আর্থার ডরোথীর মাথাটা নিজের কাঁধ থেকে সরিয়ে এনে অনেকক্ষণ চেয়েছিল ওর চোখের দিকে। বুঝতে চেষ্টা করেছিল, কি আছে ওর চোখে। ডরোথীর ঠোঁট দুটো একটু একটু করে কাঁপছিল, তারপর এক সময় নিঃশব্দে ঠোঁট জোড়া এগিয়ে গিয়েছিল আর্থারের ঠোঁটের দিকে। আর্থারের ঠোঁটে-গালে অসংখ্য চুমু খেয়েছিল ডরোথী, আবেশে চোখ-দুটো বুজে এসেছিল ওর। আর্থারের মনে তখন রাশি রাশি ভাবনার তরঙ্গ।

পরদিন ব্রেকফাস্টের টেবিলে সবাই এক সঙ্গে বসেছিল। মিষ্টার এবং মিসেস ডবসন, আর্থার আর ডরোথী। আবহাওয়া থেকে শুরু করে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছিল ওদের মধ্যে। কথা প্রসঙ্গে এক সময় আর্থারের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন এ্যালফ্রেড ডবসন, 'ডরোথী তাহলে এখন থেকে এখানেই থাক। আর্থার তুমি কি বলো?, হঠাৎ এ-কথাটার কোনো অর্থই ব্রেন খুঁজে পেল না

আর্থার। কিছু বুঝতে না পেরে ত্বরিতে একবার বাবার মুখের দিকে আর একবার ডরোথীর মুখের দিকে চেয়ে দেখেছিল সে। ডরোথী তখন কিন্তু কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে ব্যস্ত। ওর মুখে কোনো ভাবান্তরই প্রকাশ পেল না। স্বামীর দিকে ফিরে কতকটা যেন আবদারের স্বরেই বল্লেন মিসেস ডবসন, 'ওদের আর আটকেই-বা রাখছো কেন? নিজেদের মধ্যে মন জানা-জানির পালা যখন চুকে গেছে তখন মিছিমিছি ওদের দেরী করিয়ে লাভ কি?'

—নিজেদের আর ক'টা দিন বুঝে নিক না।—ঠোঁটের ফাঁকে একটু যেন হাসলেন এ্যালফ্রেড ডবসন।

মিসেস ডবসন দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন ডরোথীর দিকে, মুচকি হেসে বল্লেন, 'ধন্যি মেয়ে বাবা তুমি! এতদিন ধরে এত বড় ভার বুকে বয়ে বেড়াচ্ছে অথচ একবারও জানাওনি কাউকে? যদি তেমন কোনো অঘটন ঘটে যেত তাহলে তোমার অবস্থাটা কি হত? আমাকে জানাতেও লজ্জা? বোকা মেয়ে, মায়ের কাছে মেয়ের আবার লজ্জা কি?'

ডরোথী ওর লাজুক চোখ দুটো তুলে চকিতে একবার আর্থারের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল। আর্থারের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই লজ্জায় কেমন লাল হয়ে গিয়ে, নামিয়ে নিয়েছিল চোখ। আর ঠিক তখনই উঠে পড়েছিলেন এ্যালফ্রেড ডবসন। বলেছিলেন, 'তোমরা বসো, আমরা একটু বেরোচ্ছি।' মিষ্টার আর মিসেস ডবসন উঠে গিয়েছিলেন সেখান থেকে।

আর্থার আর ডরোথী খানিকটা সময় চুপচাপ বসে ছিল, কোনো কথা যেন খুঁজে পাচ্ছিল না ওরা। এক সময় ডরোথী আর্থারের একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে আলতো ভাবে প্রশ্ন করেছিল, 'তুমি রাগ করেছো?,

—কেন রাগ করবো কেন?

—তোমায় কিছু না জানিয়ে হঠাৎ এ-ভাবে চলে এলাম বলে?

—যাঃ বোকা মেয়ে, এতে রাগ করবার কি আছে?

—তাহলে এমন গম্ভীর হয়ে আছ কেন?—আদুরে গলায় প্রশ্ন করেছিল ডরোথী।

এবার হেসে ফেলেছিল আর্থার। বলেছিল, 'তুমি কিন্তু একটুও পাল্টাওনি, সেই ছেলেবেলার মত আদুরে রয়ে গেছ।'

—সেই ভাল, অকালে বুড়িয়ে যেতে আমি চাই না।

এবার উঠে দাঁড়িয়েছিল ডরোথী। আর্থারের একটা হাত ধরে টেনে বলেছিল, 'এখানে আর নয়, চলো কোথাও একটু বেড়িয়ে আসি।'

ওরা সেদিন কলকাতার নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছিল। আর্থারের সঙ্গে ঘুরতে-ঘুরতে ছেলে মানুষের মত কেমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল ডরোথী। ওদের সেদিনের দিনটাকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য আর্থারকে নিয়ে ডরোথী স্টুডিওতে গিয়েছিল, আর্থারের সঙ্গে নানা ভঙ্গিমায় ফটো তুলেছিল। আর্থারের বুকে মুখ রেখে, গালে গাল ছুঁয়ে বিচিত্র ভঙ্গিমার ফটো। আর্থারের সমস্ত ওজর আপত্তি ডরোথীর উচ্ছ্বাসের জোয়ারে ভেসে গিয়েছিল। ডরোথী তখন যেন রঙীন পাখায় ভর করে হাওয়ায় উড়ছিল।

বাড়ি ফিরবার পথে গড়ের মাঠের ওপর দিয়ে আসতে আসতে কথায় কথায় ডরোথীকে প্রশ্ন করেছিল আর্থার 'এ-দেশটা কেমন লাগছে ?'

—একদম বাজে। এখানকার লোকদের আমার একেবারে ভাললাগে না।

—কেন ?

—একটা লোকের সঙ্গেও মেশা যায় না। একদল লোক তো কুকুরের মত কেঁউ কেঁউ করছে আর ল্যাজ নাড়ছে, সামান্য ছিটে ফোটা পেলেই খুশি। আর একদল লোক উগ্র আর এক গুঁয়ে, সব সময় যেন মারমুখী হয়েই আছে। যাচ্ছে-তাই দেশ, একদম ভাললাগে না আমার।

—তা'হলে বলবো, দোষটা এখানকার লোকের নয়, দোষটা তোমার।

—কেন ?

—কারণ চোখ মেলে যদি দেখতে তা' হোলে দেখতে পেতে, এদেশের লোক কত সুন্দর, কত হৃদয়বান।

হঠাৎ চোখ সূক্ষ্ম করে ভুরু কুঁচকে আর্থারের চোখের দিকে চেয়েছিল ডরোথী, একটু যেন কঠিন হোয়ে উঠেছিল ওর চোয়াল দুটো। আস্তে আস্তে প্রশ্ন করেছিল, 'কি ব্যাপার, তুমি যেন এদের সঙ্গে বড় বেশী মেশামেশি করছো ?'

—তা' করছি !—খুব সহজ ভাবে উত্তর দিয়েছিল আর্থার।

—কাজটা কিন্তু ভাল করোনি। যা' হোক এখন থেকে সংযত হোয়ে যেও।—একটু থেমে আবার বলেছিল—'আসলে কি জান, শাসকশ্রেণীর উচিত নয় ওদের সঙ্গে বেশী মেশামেশি করা। ওতে শাসন করার অসুবিধে হয়, শাসক শ্রেণীও মনে মনে দুর্বল হোয়ে পড়ে।'

—আমি কিন্তু মানবধর্মে বিশ্বাসী।

—খুব ভাল কথা। কিন্তু মানবধর্ম মানে তো এই নয় যে, কতকগুলো অনাচার, ভ্রষ্টাচারকে সমর্থন করতে হবে ?

—ওটা দৃষ্টিকোণের তারতম্যের ফল। তোমার কাছে যেটা অনাচার আর একজনের কাছে তা' স্বাভাবিক। ওদের অত নীচু করে দেখোনা ডরোথী।

—আর্থার! ওর একটা হাত সজোরে চেপে ধরেছিল ডরোথী।—'তুমি—তুমি—ওদের হোয়ে আমার সঙ্গে তর্ক করছো, এ-যে আমি ভাবতেও পারছি না।' কান্নায় যেন গলা বুজে এসেছিল ওর।

আর্থার কোনো উত্তর করেনি। মনে মনে যেন প্রস্তুত হচ্ছিল সে। কাল থেকে যে-কথাটা বলি বলি করেও বলতে পারছিল না, সেই কথাটা বলার জন্যই প্রস্তুত হচ্ছিল আর্থার। ডরোথীর আচরণে মনে মর্মে ক্রমশই অশান্ত হোয়ে উঠেছিল সে। অথচ ডরোথী তাকে কিছু বলার সুযোগ দিচ্ছিল না। এতক্ষণে তার সামনে যেন সেই সুযোগটাই এসে হাজির। আর্থার নিঃশব্দে হেঁটে চলেছিল ডরোথীর পাশে পাশে।

দু'জনে এক সময় গিয়ে বসেছিল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের কাছে ঘাসের ওপর। মুখোমুখি। ডরোথী নিজের দুই হাঁটুর ফাঁকে থুতনি রেখে চোখ নত করে নিঃশব্দে একটা একটা করে ঘাস ছিঁড়ে চলেছিল। উড়ো চুলগুলো মুখের ওপর পড়ে মুখের অর্দ্ধেক প্রায় ঢেকে ফেলেছিল, চকোলেট রঙের স্কার্টের ওপর এসে পড়েছিল সোনালী রোদের আস্তরণ। স্কার্টের ফাঁকে উরুর অনেকখানি অংশ প্রকাশ হোয়ে পড়েছিল। সব মিলে ওকে যেন কেমন মোহময়ী করে তুলেছিল। আর্থার ওর দিকে একবার তাকিয়েই দূরে সরিয়ে নিয়েছিল দৃষ্টি। তারপর বলেছিল, 'ডরোথী, একটা কথা বলবো?' মুখ না তুলেই উত্তর করেছিল ডরোথী, 'বলো।'

—ছাখো, আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বের যে সম্পর্ক রয়েছে তা ছাড়া অন্য কোনো সম্পর্ক কিন্তু গড়ে উঠতে পারে না।

হঠাৎ যেন একটা চাবুক খেলো ডরোথী। চমকে উঠে চোখ মেলে চেয়েছিল আর্থারের দিকে, কাঁপা কাঁপা গলায় প্রশ্ন করেছিল 'কেন, এ-কথা কেন বলছো?'

—কোনো ভুল বোঝাবুঝি যাতে না থাকে তাই এ-কথা বলছি। শোনো, ডরোথী, তোমায় আমি ভালবাসি, খুবই ভালবাসি, কিন্তু সে-ভালবাসা একজন বন্ধুকে যতটা ভালবাসা যায় ততটাই। আর যাকে বিয়ে করতে চলেছি তাকে শুধু ভালবাসিনা, তার সঙ্গে আমি এক হয়ে মিশে গিয়েছি, সেখানে আর কেউ পৌঁছতে পারবে না। আমায় ভুল বুঝোনা।

—আমার তবে কি হবে?—কেমন আর্তনাদ করে উঠেছিল ডরোথী। চোখ দুটো জলে ভরে এসেছিল।

—তোমার-আমার বন্ধুত্ব অক্ষয় হোয়ে থাকবে, ডরোথী। বন্ধুত্ব অনেক বড় জিনিষ। তাছাড়া—তাছাড়া তুমি যদি তোমার মনের এ-খবরটা আমায় আগে কখনও ঘুণাক্ষরেও জানাতে তবে হয়তো ঘটনার স্রোত অন্যদিকে বইতেও পারতো, কিন্তু এখন—।

কথা বলতে বলতে মাঝ পথে থেমে গিয়েছিল আর্থার। ডরোথীও চুপ করে গিয়েছিল। উত্তর করেনি। নত চোখে সবুজ ঘাসের ওপর হাত বুলিয়ে চলেছিল। নিজেকে সহজ করে নিতে খানিকটা সময় লেগেছিল। তারপর এক সময় বেশ সহজ স্বরেই প্রশ্ন করেছিল, 'মেয়েটা কোথায় থাকে ? কি নাম ?'

—এখন কলকাতাতেই আছে, আসলে থাকে জলপাইগুড়ি। নাম শিউলী। বাঙালী।

—বাঙালী!—ভুরু কুঁচকে সোজা আর্থারের চোখের দিকে চেয়েছিল ডরোথী চোখের কোণে যেন একটু আগুনের ঝিলিক। প্রশ্ন করেছিল, 'তার মানে তুমি একজন নেটীভ গার্লকে বিয়ে করতে চলেছো ?'

— হ্যাঁ, তাই।

— জান এর ফলে আমাদের সমাজে তোমার কোথায় স্থান হবে ?

—জানি। এ-ও জানি, এর ফলে হয়তো বাবার সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত হব!

—তবু ?

—হ্যাঁ।

—মেয়েটা তোমায় কোনোদিন বিট্রে করবে কি-না সেটা ভেবে দেখেছো ?

—ভাবিনি, তবে সে কোনোদিন তা করবে না, এরা তা করে না।

— ভাল। তবু তুমি যখন আমায় বন্ধু বলে মেনে নিয়েছো, বন্ধুর একটা কর্তব্য করতে চাই।

—কি ?

—মেয়েটাকে একটু বাজিয়ে দেখবো। এর আগে তোমার কিছু করা চলবে না। কথা দাও।

—বেশ তো। তবে আমি হলপ করে বলতে পারি, ওকে বাজাতে গিয়ে তুমিও প্রেমে মজে যাবে।—হেসেছিল আর্থার।

—তাই হবে।—হেসে আর্থারের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছিল ডরোথী। শেক হ্যাণ্ড করেছিল ওরা।

তারপর দু'জনেই আনন্দে ছুটোছুটী করেছিল মাঠময়। দু'জনেরই মনের

গ্লানি যেন মুছে গিয়েছিল, সহজ হোয়ে উঠেছিল দু'জনেই। আর্থারের বুক থেকে একটা বিরাট ভার নেমে গিয়েছিল। কতগুলো ঘণ্টা যেন কেটেছিল এক দুঃস্বপ্নের মধ্যে। সেই দুঃস্বপ্নের পর এবার নতুন দিনের আলো দেখতে পেয়েছিল সে।

কিন্তু ভাগ্যের কী অদ্ভুত পরিহাস! আর্থার যে মুহূর্তে বিপদ-মুক্তির আনন্দে উদ্দাম বেগে ছুটছে সেই মুহূর্তে ভাগ্যদেবতা কুটিল হাসি হাসলেন। সবচেয়ে সুরক্ষিত ভেবে যেখানে নির্ভয়ে আশ্রয় নিলও আর্থার চরম আঘাত এল সেখান থেকেই। এটাই বোধ হয় জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডী। আর্থার সেদিন সেই মুহূর্তে একবারের জন্যও কি ভাবতে পেরেছিল, ডরোথীর এই আনন্দ-উচ্ছ্বাস কত বড সর্বনাশের ইঙ্গিত বহন করছে, কত বড় সর্বনাশ অপেক্ষা করছে তার জন্য? সেদিন সে একবারের জন্যও ভাবতে পারেনি, তার জীবনের এই আনন্দ-ধারাকে ডরোথীর ঐ সর্বনাশী উচ্ছ্বাস একেবারে মরুভূমির মত শুকিয়ে দেবে। ডরোথী যে তার জীবনে একটা উল্কার মত এসেছিল, এ কথাটা একবারের জন্যও সেদিন মনে হয়নি তার!

(বারো)

সেদিনটা প্রায় সকাল থেকেই বাবার সঙ্গে কাজে ব্যস্ত ছিল আর্থার। ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ। চায়ের অতবড় প্রতিষ্ঠান তার বাবার, কাজের শেষ নেই। চায়ের বড় বড় পেটী আসছে যাচ্ছে, উঠছে নামছে। কাজের ভিড়ে সন্ধ্যা গড়িয়ে কখন রাত হয়েছিল খেয়াল ছিল না আর্থারের। দুপুর থেকে মিসেস ডবসনও বাড়ি ছিলেন না। সারাটা দিন প্রায় একাই কেটেছিল ডরোথীর। বিকেলের দিকে আর্থারের দেওয়া ঠিকানাটা হাতে নিয়ে সোজা বেরিয়ে পড়েছিল সে। গাড়ি নিয়ে হাজির হয়েছিল মানিকতলার বাড়িতে।

বাবা-মেয়ে তখন নীচের ঘরে বসে গল্প করছে। গৌরীনাথ বারবার বলেছিলেন 'ব্যাপার কি বলতো মা, আজ দু'দিন হোল আর্থারের একেবারে দেখা নেই? এমন তো কখনও হয় না।'

—আমিও তাই ভাবছি। হয়তো কোনো কাজে আটকা পড়েছে। আজ নিশ্চয়ই এসে পড়বে!

প্রায় ওদের কথার মাঝে এসে হাজির হয়েছিল ডরোথী। ওকে দেখে বাবা-মেয়ে দু'জনেই কেমন হকচকিয়ে গিয়েছিল। শিউলীর মনে হল যেন খুব চেনা মেয়েটী। কিন্তু ঠিক চিনতে পারল না।

ডরোথী এগিয়ে এসে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছিল, 'আমি ডরোথী। আর্থারের কাছে হয়তো আমার নাম শুনে থাকবেন।' ডরোথীর পরিচয়ে খুশীতে ভরপুর হোয়ে উঠেছিল শিউলী। ওর দু'টো হাত ধরে নিজের পাশে বসিয়ে বলেছিল, 'প্রথমেই মনে হয়েছিল তুমি ডরোথী। আর্থারের কাছে শুনেছি তুমি কলকাতায় এসেছো। তোমার কথা ওর মুখে এত শুনেছি যে, তোমাকে না দেখেও তোমার চেহারাটা কল্পনা করে নিয়েছিলাম। এখন দেখছি কল্পনার সঙ্গে খুব একটা অমিল হয়নি।'

—তুমি বুঝি খুব কল্পনা করতে ভালবাসো ?

—কল্পনাই তো মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে ! তুমি করোনা ?

—খুব কম। আমার স্বপ্ন দেখতে ভয় করে, কখন স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়।

—বেশ মিষ্টি তো তোমার কথা। বাঙলা জানো ?

—না, তুমি শিখিয়ে দিও, যেমন আর্থারকে শিখিয়েছো।

হেসে ঘাড় কাৎ করেছিল শিউলী। ডরোথী ওর ভ্যানিটী ব্যাগ থেকে ছোট্ট কাগজের টুকরোটা বের করেছিল এবার। আর্থারের হাতে-লেখা শিউলীদের সেই ঠিকানাটা। বলেছিল, 'আজ কিন্তু ভাই আর বসতে পারছি না। তাছাড়া তোমাকেও একবার উঠতে হবে। আর্থারের শরীরটা খারাপ তোমাকে একবার যেতে হবে সেখানে।'

—শরীর খারাপ ? কি হয়েছে ?—শিউলীর কণ্ঠে উদ্বেগ।

—না বেশী কিছু নয়। আসলে তিনজনে মিলে গল্প-গুজব করা যাবে এই মতলব আর কি !

তবু একটু ইতস্ততঃ করতে লাগল শিউলী। মন থেকে কিছুতেই জোর পাচ্ছিল না সে, হঠাৎ এ-ভাবে চলে যাওয়াটা কি ঠিক হবে ? ডরোথী গৌরীনাথের দিকে ফিরে বলেছিল, 'আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে ওকে নিয়ে যাই। গাড়ি করে নিয়ে যাব, আবার গাড়ি করেই পৌছে দেবো।'

—বেশ তো। তোমাদের ওখানে যাবে তাতে আর ভাবনার কি আছে ?— এক কথাতেই রাজী হয়ে গিয়েছিলেন গৌরীনাথ।

শিউলীকে নিয়ে সদর স্ট্রীটের বাড়িতে সোজা চলে এসেছিল ডরোথী। গাড়িতে একটা কথাও বললনা সে। বলতে গেলে সমস্ত পথটায় কোনো কথাই হয়নি ওদের।

ওরা যখন সদর স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়ে পৌছেছিল তখনও সন্ধ্যে হয়নি।

সোজা ওপরে এ্যালফ্রেডের ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল ওরা। তখনও ফেরেনি কেউ—মিঃ এবং মিসেস ডবসন, আর্থার—কেউ না।

শিউলীকে একটা সোফায় বসতে দিয়ে ওর মুখোমুখি আর একটা সোফাও বসেছিল ডরোথী। শিউলী চেয়ে দেখছিল ঘরের চারদিকটা। চারদিকটা দেখতে দেখতেই প্রশ্ন করেছিল, 'এই ঘরটা বুঝি—?'

—সিনিয়র ডবসনের।—মাঝপথে বাধা দিয়ে উত্তর করেছিল ডরোথী।

—ওঁদের কাউকে তো দেখছি না।—একটু অস্বস্তি বোধ করে শিউলী।

—বাড়িতে কেউ নেই যে।—কাটা কাটা জবাব ডরোথীর। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল, কী জিনিষ ওর মনে তখন তোলপাড় করছে।

—আর্থার?—

—সে-ও না। বাপ-ছেলে সকাল থেকেই ব্যবসার কাজে ব্যস্ত।—খুব নির্লিপ্ত জবাব ডরোথীর।

—তার মানে?—ভুরু কুঁচকে ডরোথীর চোখের দিকে এবার সোজা তাকিয়েছিল শিউলী। কথাটা বিশ্বাসই করতে পারেনি সে।

ডরোথীও তখন নিষ্পলকে চেয়েছিল ওর চোখের দিকে। শিউলীর হঠাৎ মনে হয়েছিল একটা শিকারী যেন তার শিকারের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

শিউলীর প্রথমে কেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল, পরে আশঙ্কা। তবু সহজ ভাবেই প্রশ্ন করেছিল, 'আমাকে তা'হোলে মিথ্যে কথা বোলে এনেছো?'

—হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে কতগুলো কথা পরিষ্কার হওয়া দরকার, তাই তোমায় এখানে ডেকে এনেছি।

গম্ভীর ভাবে কথা ক'টা বোলে চুপ করল ডরোথী। তারপর এক সময় ড্রয়ার থেকে বার করল কতগুলো ফটো, শিউলীর সামনে নিঃশব্দে মেলে ধরল সেগুলো। শিউলী হাসি মুখে একটী একটী করে খুঁটিয়ে দেখল। আর্থার আর ডরোথীর নানা ভঙ্গিমার ফটো সব। কোনোটায় ডরোথী আর্থারের বুকে মুখ রেখে হাসছে, কোনোটায় আর্থারের গালে গাল ছুঁয়ে রয়েছে। বেশ লাগল শিউলীর। শিউলী ডরোথীর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হেসে বলল, 'ভারি সুন্দর তো!'

—হুঁ।—গম্ভীর থম থম করছে ডরোথীর মুখ। শিউলীর চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞাসা করল ডরোথী, 'এর থেকে আমাদের দু'জনার সম্পর্ক অনুমান করতে পার?'

—কেন পারব না ?—জোরে হাসল শিউলী। বলল, 'গভীর বন্ধুত্ব তোমাদের মধ্যে। এটুকু বুঝতে কি আর অসুবিধে হয় ?'

—আর কিছু নয় ?

—আর কি হোতে পারে ?

—চমৎকার! অভিনয় ক্ষমতাটা বেশ ভালভাবেই আয়ত্ত করেছো দেখছি। যা হোক, যেটা বুঝেও বুঝতে চাইছো না সেটা পরিস্কার করেই শুনে রাখো, আমাদের বিয়ে খুব শিগগির, আর্থারের সম্বন্ধে কোনো রকম আশা পোষন করোনা।

—ধন্যবাদ। তুমি কি কেবল এই কথা ক'টা শোনাবার জন্যই আমায় ডেকে এনেছো ?

—আরও আছে। এরপর থেকে আর্থারের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করবার আর কোনো চেষ্টা করোনা।

—সেটা আমার ব্যাপার। তোমার মাথা না গলালেও চলবে।

—ব্যাপারটা তোমার নয়, ও-ব্যাপারটার সঙ্গে আমাদের মান-সম্মানের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। তুমি একটু বেশী দূর এগিয়ে গেছ। একজন ইংরেজকে দেহ দিয়ে ধন্য হচ্ছ এতে আমরা কোনো আপত্তি করতাম না, আপত্তি করবার কথাও নয়। কিন্তু—

ওর কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল শিউলী। উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছিল সে! প্রায় গর্জে উঠেছিল, 'চুপ করো, নইলে জিভ উপড়ে ফেলবো।'

শিউলী যেন একটা দারুন হাসির কথা বলে ফেলেছে! ওর কথায় হি হি করে হেসে উঠেছিল ডরোথী। হাসতে হাসতে একেবারে সোফায় লুটিয়ে পড়েছিল। হাসির দমক একটু থামলে বলেছিল, 'সতীত্বে আঘাত দিয়ে ফেলেছি বুঝি ?' মুখে চুক-চুক করে একটু আওয়াজ করে বলল, 'সত্যি আমি দুঃখিত। তা' শোনো ভাই, তোমার ঐ সতীত্বটুকু এবার সত্যি সত্যি বজায় রাখবার চেষ্টা করো।' কথাটা বোলে শিউলীর উত্তেজনাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ড্রয়ার খুলে কাগজ কলম বের করে টেবিলের ওপর রেখেছিল। তারপর হুকুমের সুরে বলেছিল, 'আমি যা' বলছি সেই মত আর্থারকে একটা চিঠি লেখো। এতে তোমার ভালো ছাড়া মন্দ হবে না। এমন ভাবে চিঠিটা লিখবে যাতে মনে হয়, তোমার, তোমার বাবার, তোমার দাদার ভালোর জন্যই আর্থারকে তোমাদের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখতে বারণ করছো। দেরী করোনা, খুব চটপট

লিখে ফেলো।'

এতক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে ওকে লক্ষ্য করছিল শিউলী। দু'চোখ দিয়ে যেন আগুনের ফুলকি ছুটছিল ওর। পরাধীনতার সমস্ত জ্বালা যেন ফুটে বেরোচ্ছিল ওর দু'চোখ দিয়ে। ওর মন থেকে তখন সমস্ত অস্বস্তি-আতঙ্ক মুছে গিয়েছিল। ওর সমস্ত চেতনা তখন একটা জায়গায় এসে স্থির হোয়ে গিয়েছিল। বার বার একটা কথাই মনে হচ্ছিল,—সে পরাধীন, পরাধীন দেশের মানুষ সে! স্বাধীনতা তার চাই—যে কোনো মূল্যের বিনিময়ে তাকে স্বাধীনতা পেতে হবে, রুখে দাঁড়াতে হবে সমস্ত শক্তি দিয়ে। সেই মুহূর্তে ডরোথীর মধ্যে ও যেন প্রত্যক্ষ করেছিল শাসক কুলের বীভৎস রূপটা। প্রতি মুহূর্তে আক্রোশটা যেন ফুঁসে ফুঁসে উঠছিল ওর বুকের মধ্যে। শুভময়ের মুখটা মনে পড়ছিল বারবার। শুভময় বলতো, 'কোনো কাজই ক্ষুদ্র নয়, মনের তীব্রতা যদি থাকে, অত্যন্ত ক্ষুদ্র মাপের কাজও বৃহৎ রূপ নিতে পারে, একটা স্ফুলিঙ্গও বিরাট অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে পারে।' আরও বলেছিল, 'অন্যায় সে যত ছোটই হোক না কেন, তাকে কোনো অবস্থাতেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।'

কথাগুলো যেন হাতুড়ি পিটছিল শিউলীর মাথার মধ্যে। নিজেকে কিছুতেই স্থির রাখতে পারছিল না আর। ওর সমগ্র চেতনা প্রতি মুহূর্তে অপেক্ষা করছিল একটা ভয়ানক কিছুর জন্য। ডরোথীর চোখ থেকে দৃষ্টি সরাতে পারছিল না তাই।

—কি দেখছো?—প্রশ্ন করেছিল ডরোথী।

—দেখছি তোমার স্পর্দ্ধা কতদূর বাড়তে পারে।

চোখ দিয়ে আগুন বেরোচ্ছিল ওর। এ যেন সে শিউলীই নয়, সেই শান্ত মেয়েটা যেন হারিয়ে গিয়েছিল।

—বাঃ, চমৎকার। বিপ্লবী দাদার উপযুক্ত বোনের মত কথা। তা' শোনো, আর খুব বেশী দূর এগোবো না।

কথা বলতে বলতে ড্রয়ার টেনে একটা রিভলবার বের করেছিল ডরোথী। চোখ দুটো তখন জ্বলছিল ওর। রিভলবারটা টেবিলের ওপর রেখে দাঁতে দাঁত ঘষে বলেছিল সে, 'এটা লোডেড, তবে এর গুলি তোমার জন্য নয়. বিপ্লবী শুভময় রায়ের জন্য। তার হোয়ার-এ্যাবাউটস আমার জানা। তুমি যদি আমার কথা না শোনো, তাহোলে এক ঢিলেই দুটো পাখী মারবো। তোমাকে পুলিশের হাতে তুলে দেবো এই বলে যে, বিপ্লবী দলের সাথে তোমার যোগাযোগ আছে এবং একটি ইংরেজ পরিবারের ভালমানুষীর সুযোগ নিয়ে তুমি ফায়ার-আর্মস

চুরি করতে এসেছিলে। এটা নিশ্চয়ই খুব অসত্য বলে মনে হবে না। তাছাড়া খুব অল্পদিনের মধ্যেই দুটো জায়গায় সরকারের টাকা লুঠ হতে চলেছে, দুটোতেই তোমার দাদা জড়িত—এ খবরটাও আমার কাছে আছে। কাজেই এই রিভলবারের গুলি দিয়ে তার মাথা ফুঁড়ে ফেলতেও খুব বেগ পেতে হবে না। ফলে বুঝতে পারছ, জালটা কতদূর ছড়ানো? আমার কথা শুনলে কিন্তু কিছুই হবেনা। তুমিও বাঁচবে তোমার দাদাও বাঁচবে।'

শিউলী তখন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য। সে মরীয়া। ওর চোখের সামনে থেকে তখন সব কিছু মুছে গেছে, শুধু ভেসে আছে ডরোথীর মুখ। এক মুহূর্তে মন স্থির করে ফেলেছিল সে, ছুটে গিয়ে দুই হাতে চেপে ধরেছিল ডরোথীর গলা। প্রাণপণ শক্তিতে চেপে ধরেছিল। দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল, "ঐ মুখে কোনো বিপ্লবীর পুণ্যনাম যাতে আর কোনো দিন উচ্চারণ করতে না পরে সেই ব্যবস্থা আজ করবো। চিরকালের কালের জন্য শান্ত করে দেবো।

এর জন্য ডরোথী একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। তাই সহসা বাধা দিতে পারেনি সে! প্রচণ্ড চাপে একটা গোঁ-গোঁ আওয়াজ বেরিয়ে আসছিল ওর গলা থেকে, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছিল, মুখের সমস্ত শিরা ফুলে উঠেছিল। প্রাণপণ চেষ্টা করেও শিউলীর হাত দুটো ছাড়াতে পারছিল না কিছুতেই। আর কোনো উপায় না দেখে বাঁচবার শেষ অবলম্বন হিসেবে টেবিলের ওপর রাখা রিভলবারটার দিকে হাত বাড়িয়েছিল সে। কিন্তু চোখের পলকে ডান হাতটা ডরোথীর গলা থেকে সরিয়ে এনে রিভলবারটা চেপে ধরেছিল শিউলী। আর সঙ্গে সঙ্গে ডরোথীও শিউলীর হাত সহ চেপে ধরেছিল রিভলবারের বাঁটটা। তার পরমুহূর্তেই সেই চরম ক্ষণটা উপস্থিত হয়েছিল, যার ফল আর্থারকে বয়ে বেড়াতে হয়েছে চিরটাকাল। কে জানে, সংসারের হয়তো এই-ই নিয়ম। যে ঘটনার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী হয় একজন তার ফল ভোগ করে আর একজন। কে জানে এতে প্রকৃতির কোন উদ্দেশ্য সাধিত হয়!

সেদিন সেই মুহূর্তে সন্ধ্যার কালো পর্দার আড়ালে অনেক চেষ্টা করেও ডরোথী শিউলীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারেনি রিভলবারটা, জয়ের টীকা তবু পড়েছিল ডরোথীর কপালেই। রিভলবার সহ শিউলীর হাতটা একটু একটু করে শিউলীর চোয়ালের কাছে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল ডরোথী। আর সঙ্গে সঙ্গে শিউলীর যে আঙুলটা ট্রিগারের ওপর ছিল তার উপর চাপ দিয়েছিল ডরোথী। মুহূর্তে একটা শব্দ করে টলে পড়েছিল শিউলী। রক্তে ভেসে গিয়েছিল সমস্ত স্থানটা।

ভাগ্যের পরিহাস ঠিক সেই মুহূর্তে আর্থারও প্রবেশ করেছিল বাড়িতে। বাড়িতে পা দিয়েই একতলা থেকে শুনতে পেয়েছিল সে গুলির শব্দ। শুনতে পেয়েই ছুটে গিয়েছিল। দোতলায় উঠে বাবার ঘরে ঢুকেই সমস্ত যেন কেমন গুলিয়ে গিয়েছিল আর্থারের। কিছুক্ষণের জন্য কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলনা। ঘটনার প্রচণ্ডতায় ভরোথীও তখন থর থর করে কাঁপছে। শিউলীর রক্তাক্ত দেহ পড়ে রয়েছে মাটীতে। বিস্ময়ে হতবাক আর্থার চেয়ে দেখল এক মুঠো ঝরা ফুলের মত মাটীর বুকে ছড়িয়ে রয়েছে তার শিউলী। সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে কয়েকটা সেকেণ্ড সময় লেগেছিল আর্থারের। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই উন্মাদের মত হয়ে গিয়েছিল আর্থার, ছুটে গিয়ে লুটিয়ে পডেছিল শিউলীর দেহের ওপর।

'তারপর ?,

একটা ঢোক গিলে কাঁপা কাঁপা গলায় প্রশ্ন করেছিল ললিতা। জলে ভরে এসে ছিল ওর চোখ দুটো।

আশ্রমের লাইব্রেরী ঘরে ডবসন কাকার কাছে গল্প শুনছিলাম ললিতা আর আমি। পুরোনো দিনের কথা বলতে বলতে ডবসনকাকা একটু থামতেই প্রশ্ন করেছিল ললিতা।

আজ ক'টা দিন ধরে আশ্রমে খুব ব্যস্ততা। মাত্র সাতদিন আর বাকী। সাতদিন পরেই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা দিবস—পরম উৎসবের দিন গোটা সপ্তাহ ধরে চলবে সেই উৎসব। আশ্রমের সমস্ত কেন্দ্র থেকে আসবে কর্মীরা, আশ্রম সম্বন্ধে উৎসাহী লোকজন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি। তাদের নিয়ে আলোচনা চক্র বসবে, পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় হবে, হাসি-গানে ভরে উঠবে সমস্ত আশ্রম। সেই উৎসবেরই প্রস্তুতি চলছে। আশ্রমের কর্মীদের তাই অবসর নেই এতটুকু। খাটুনি চলছে ললিতারও, তবু সে দিনের শেষে একবার করে এসে বসে ডবসন কাকার কাছে। দেবজ্যোতির ফ্ল্যাট ছেড়ে যেদিন সে আশ্রমে চলে এসেছিল সেদিন থেকেই তার এই নিয়ম। অন্যদিনের মত আজও এসে বসেছিল ললিতা, ডবসনকাকা একটু একটু করে বলতে শুরু করেছিলেন তাঁর ফেলে আসা দিনগুলোর কথা।

আমি তাকিয়ে ছিলাম লাইব্রেরী ঘরে টাঙানো সেই ফটোটার দিকে। ডবসন কাকার মানস-প্রতিমা, শিউলীর ফটো, যার নামে এই আশ্রম। এক জোড়া ডাগর চোখ, ঠোঁটের ফাঁকে এক টুকরো হাসি। বড় জীবন্ত সেই

প্রতিকৃতি। কেমন যেন মনে হচ্ছিল, এখুনি বুঝি চোখের পলক পড়বে, নড়ে উঠবে ঠোঁটজোড়া। আমি চেয়েই ছিলাম সেই দিকে সম্মোহিতের মত।

হঠাৎ এক সময় মনে হয়েছিল, শিউলীর অস্তিত্ব যেন রয়েছে এই লাইব্রেরী ঘরের মধ্যেই, স্পষ্ট অনুভব করেছিলাম তার উপস্থিতি। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, ঐ কাজল-কালো চোখ জোড়া যেন আমাদের তিনজনের ওপরই দৃষ্টি রেখেছে—সতর্ক দৃষ্টি, ঐ হাসি মাখা ঠোঁটজোড়া যেন কেবলই বলতে চাইছে, তোমরা কাজ করে যাও, তোমাদের কাজের মধ্যেই আমায় শান্তি পেতে দাও। আমি কেমন স্বপ্নাবিষ্টের মত চেয়েছিলাম ঐ দিকে। আর ওখানে বসে ঐ দিনই সর্ব প্রথম আমার মনে হয়েছিল, শিউলী-ডবসনকাকা, ললিতা-দেবজ্যোতি, এদের সবাইকে নিয়ে একটা কিছু লিখি। জানিনা, সেদিন হঠাৎ এ-প্রেরণা পেয়েছিলাম কোত্থেকে।

—তারপর।

ডবসন কাকার কথায় ফিরে তাকিয়েছিলাম আমি। তিনি বলেছিলেন, 'তারপর আর কি! অনেক ছুটোছুটি অনেক দৌড়োদৌড়ি হোল। এ্যাম্বুলেন্স, হাসপাতাল, থানা-পুলিশ, সবই হোল, কিন্তু শিউলী বাঁচল না।'

ধীরে ধীরে বাকীটুকু বলেছিলেন ডবসন কাকা।

হাসপাতালে একবার একটু জ্ঞান হয়েছিল শিউলীর। বিছানার এক পাশে ডরোথী। তখন পর্যন্ত একটা কথাও বলেনি ডরোথী। আর্থারের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারেনি একবারও। শিউলীর জ্ঞান হতেই ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল আর্থার। আর্থারকে দেখে যন্ত্রনার মধ্যেও একটু যেন হাসবার চেষ্টা করেছিল শিউলী। তারপর খুবই আস্তে বলেছিল, তোমায় রেখে গেলাম, যে-প্রতিষ্ঠানের কথা ভেবেছিলাম সেটা করো। কাজের মধ্যে থাকলে সব ভুলে থাকতে পারবে। জানো, সেই মুহূর্তে দাদাকে বড্ড মনে পড়ছিল, এখন থেকে ওর কথা তুমি ভেবো। আর বাবাকে—।' কথাটা শেষ করতে পারেনি শিউলী। হঠাৎ কথা বন্ধ হোয়ে গিয়ে গলায় একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ হোতে সুরু করেছিল, তারপরই সব শেষ।

আর্থার কিছুক্ষণ পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে ছিল, তারপরই ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে। বাইরে তখন দাঁড়িয়ে ছিলেন ওর বাবা-মা আর ডরোথী। কারও দিকে না তাকিয়ে আর্থার সোজা বেরিয়ে এসেছিল হাসপাতালের চৌহদ্দি থেকে। কিন্তু ওর পিছু পিছু ছুটে এসেছিল ডরোথী। ঐ রাস্তার ওপরই একেবারে জড়িয়ে ধরেছিল ওকে। কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। ওর বুকের ওপর

মাথা রেখে বলেছিল, 'আর্থার, আমায় গুলি করে মারো, আমায় গুলি করে মারো। তোমার বাবা-মা, ওদের বন্ধু-বান্ধব সবাই ষড়যন্ত্র করে আমায় টেনে এনেছিল। কিন্তু এ আমি চাইনি। অথচ আমিই মেরে ফেললুম ওকে, তোমার সর্বনাশ করলুম। আমায় মেরে ফেলো, আর্থার।'

নিজেকে সামলে নিতে আর্থারের সময় লেগেছিল একটু। ডরোথীর কথায় সমস্ত ইংরেজ জাতির ওপর ঘৃণায় রিরি করে উঠেছিল ওর সমস্ত শরীর। ডরোথীকে বলেছিল, 'এ-সব কথা আর কাউকে বলো না, সবাই যা' জেনেছে তাই থাক,—একটা ইংরেজ পরিবারের সঙ্গে বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে রিভলবার চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ায় শেষ পর্যন্ত সুইসাইড করেছে। সবাই এ-ই জানুক- সুইসাইড। আমি চাইনা এর মধ্যে তুমি আবার জড়িয়ে পড়ো।' এরপর আর দাঁড়ায়নি আর্থার। সোজা চলে গিয়েছিল গৌরীনাথের কাছে।

তখন রাত আটটা। মেয়ে ফেরেনি তখনও, সারাক্ষণ কেমন এক অস্বস্তি বোধ করছিলেন গৌরীনাথ। এমন সময় উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে এসেছিল আর্থার। তাকে দেখে কি এক অজানা আশঙ্কায় চঞ্চল হোয়ে উঠেছিলেন তিনি।

—কি ব্যাপার, আর্থার, কি হয়েছে ?—উদ্বেগে প্রশ্ন করেছিলেন তিনি !

কোনো উত্তর দিতে পারেনি আর্থার। বৃদ্ধ-অসুস্থ পিতা গৌরীনাথের সামনে নিজেকে আর স্থির রাখতে পারেনি সে। গৌরীনাথের হাঁটুর ওপর মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল।

একটু একটু করে সব শুনেছিলেন গৌরীনাথ। শুনতে শুনতে কেমন যেন বিহ্বল হোয়ে পড়েছিলেন তিনি। সমস্ত কথা কানে যেন তার প্রবেশ করছিল না। কেমন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিলেন আর্থারের মুখের দিকে। এক সময় আর্থারের মাথাটা নিজের বুকে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, 'আমি জানতাম এমন একটা কিছু হবে। আমি বড় অন্যায় করেছিলাম যে, বাবাকে বড কষ্ট দিয়েছিলাম ! এর ফল আমায় পেতেই হবে এ আমি জানতাম !' একটু কাল চুপ করে থেকে হঠাৎ একটা বুক-ফাটা আর্তনাদ করে উঠেছিলেন, 'কিন্তু এ-কথাটা যে কিছুতেই ভুলতে পারছি না, ওরা ষড়যন্ত্র করে মেয়েটাকে শেষ করে দিল। এর বিরুদ্ধে না লড়ে তো আমি শান্তি পাচ্ছি না, আর্থার।'

—লড়ব বৈকি, কাকাবাবু, নিশ্চয় লড়ব।

রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়িয়েছিল আর্থার !

—কিন্তু কি ভাবে লড়বে ?

—পথ তো শিউলীই ঠিক করে গেছে, আমরা শুধু ওর পথ অনুসরণ করব।

—কি সে-পথ ? কি ভাবে চলব আমরা ?

তাঁর মুখে এক অসহায় ভাব।

—শিউলী যেমন চেয়েছিল আগে তেমনি একটা সংগঠন তৈরী করতে হবে ! এমন সংগঠন যেখানে মানুষ মানুষের খুব কাছে আসবে। কাছে এসে মানুষ মানুষকে ভালবাসতে শিখবে। সবাই এক জোট হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে শিখবে। আমাদের লড়াই হবে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য লড়াই। আমাদের কাজের মধ্যেই শিউলী বেঁচে থাকবে, কাকাবাবু।

কেমন এক অনাস্বাদিত আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন গৌরীনাথ। হাসি-কান্নায় তাঁর মুখটা অদ্ভুত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কিছুক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারেন নি তিনি। তারপর জড়িয়ে ধরেছিলেন আর্থারকে। ওকে বুকে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, 'ওরে কি এমন পুণ্য করেছি, যে তোর মত ছেলেকে কাছে পেলাম !'

সেই রাতেই একটা একটা করে প্যান্ট-কোট-শার্ট সব পুড়িয়ে ফেলেছিল আর্থার। গৌরীনাথ নিঃশব্দে তাকিয়ে দেখেছিলেন ওর কাজ। সব কিছু পুড়িয়ে দিয়ে ধুতি-পাঞ্জাবী পরে পুরোপুরি বাঙালী হয়ে গিয়েছিল আর্থার। পুরোনো সব কিছু ছেড়ে ফেলে সে যেন নতুন করে জন্ম নিয়েছিল আবার।

পরদিন শিউলীর সৎকার করতে গিয়েছিল ঐ পোশাকেই। শ্মশানে এ্যালফ্রেড —ডরোথী—মিসেস ডবসন ওর সঙ্গে কথা বলতে এসেছিল, কিন্তু কারও সঙ্গে কথা না বলে গৌরীনাথের সঙ্গেই সোজা চলে এসেছিল সে। সেই শেষ ! ডরোথীর সঙ্গে দেখা হয় নি আর কোন দিন। অনেক দিন পরে কেবল চিঠি পেয়েছিল একটা। কিন্তু তারও কোনো জবাব দেয়নি আর্থার।

দুঃখের দিনের কিন্তু শেষ হয়নি ওখানেই আরও একটু বাকি ছিল। সেটুকুও পুরণ হোল আর দুদিন পর। সকালে ফলাও করে খবরটা বেরিয়েছিল কাগজে। শুভময়ের খবর। খবরটা পড়ে চোখের জল ধরে রাখতে পারেনি আর্থার।

চন্দননগরের কাছে গঙ্গার ঘাটে ঘটেছিল ঘটনাটা। রাতের অন্ধকারে কয়েকটা লোক নৌকো থেকে নেমে হাঁটা পথে চলেছিল গাঁয়ের দিকে। পরনে তাদের জেলেদের পোশাক, দাড়ি-গোঁফে ঢাকা মুখ, হাতে মাছ ধরার জাল, মাথায় মাছের ঝুড়ি, এমন ছদ্ম পোশাকেও শেষ রক্ষা হয় নি। পুলিশ এদের আসল রূপ ধরতে পেরেছিল অনেক আগে। পথের ধারে ওঁৎ পেতে বসেছিল

ওরা। হঠাৎ পুলিশের আবির্ভাবে একটু যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছিল জেলের দল। কিন্তু সে ক্ষণিকের। পরক্ষণেই সজাগ হয়ে একটা জঙ্গলের আড়ালে আত্মগোপন করেছিল ওরা। হাতের বন্দুকগুলো গর্জে উঠেছিল সেই সঙ্গে। জাল-চাপা মাছের ঝুড়িগুলো পরিণত হয়েছিল বন্দুক আর গুলি-বারুদে। প্রচণ্ড সংগ্রাম হয়েছিল পুলিশের সঙ্গে। আধঘণ্টা ধরে চলেছিল সে-সংগ্রাম। পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে তিনজন, তাদের বাধ্য হয়ে ফেলে রেখে বাকী সবাই পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়ে গেছে ঐ রাতের অন্ধকারেই।

কাগজে নিহতদের একটা নামের তালিকাও ছিল, তাতে ছিল শুভময়ের নাম। শুভময় রায়। বাকী দু'জন—শশধর সিংহ এবং অম্বিকা সেন। এদের মধ্যে শুভময় যে কিছুদিন থেকেই পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, কাগজে সে-কথারও উল্লেখ ছিল। সেই সঙ্গে একটা মজার খবর। নিহত শুভময়ের কাছ থেকে পাওয়া গেছে ছোট্ট একটা চিঠি। চিঠিতে নাম নেই কারও, তারিখটাও পুরোন। তাতে লেখা—'হে বিদেশী বন্ধু, তোমার কাছে আমার অনেক ঋণ, কিন্তু সেই সঙ্গে কিছু দাবীও জমা হয়েছে। বন্ধুত্বের দাবী। তোমার কাছে আমার দাবী আমার পরিবারের সবাইকে তুমি দেখবে, সেই সঙ্গে আমার পোড়া দেশটার কথাও একটু ভাববে।' নীচে সই 'শু'।

কাগজটা পড়ে-স্তম্ভিত হোয়ে গিয়েছিল আর্থার। শুভময়ের বন্ধুত্বের তীব্রতার কথা ভাবছিল সে, ভাবছিল, কতখানি আস্থা, কতখানি ভরসা তার আর্থারের ওপর। যত ভাবছিল ততই যেন কেমন হারিয়ে ফেলছিল নিজেকে। তার আশে পাশে যেন অনুভব করছিল শুভময়ের অস্তিত্ব, ওর হৃদয়ের একটা উত্তাপ যেন নিজের মধ্যে অনুভব করছিল প্রতি মুহূর্তে। আর্থারের সমস্ত দেহ-মন জুড়ে তখন একটা সুরেরই অনুরনণ চলছিল—শিউলী নেই, শুভময় নেই, কিন্তু আছে ওদের শাশ্বত আদর্শ; ওদের সেই আদর্শের মশাল জেলে এবার তাকে একা পথ চলতে হবে; দেশ-কালের গণ্ডী অতিক্রম করে যাবে ওদের সেই আদর্শের পথ। এরপর এক মুহূর্তের জন্যও নিজেকে আর ছোট মনে হচ্ছিল না আর্থারের। মনের মণি-কোঠায় কী এক তীব্র জ্বালা অনুভব করতে শুরু করেছিল সে। কর্ম-জগতের জন্য উন্মুখ হয়েছিল তার সমস্ত চেতনা।

শুভময়ের মৃত্যুর খবরটা শুনেছিলেন গৌরীনাথও, কিন্তু এতটুকু বিচলিত হননি তিনি। খবরটা শুনতে শুনতে মুখটা তাঁর কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। সব শুনে ধীরে ধীরে বলেছিলেন তিনি, 'মৃত্যু! মৃত্যুতো একদিন সবাইকেই ছিনিয়ে নেবে, টুডে অর টুমরো। কিন্তু এমন মহান মৃত্যু ক'জন মানুষের

ভাগ্যে ঘটে ? শুভময় হাসতে হাসতে মৃত্যুকে বরণ করে প্রমাণ করল যে, মৃত্যুই সব কিছুর শেষ নয়। মৃত্যু আর এক পর্বের শুরু মাত্র। কাল সে ছিল একজন সাধারণ মানুষ আজ সে কত অসাধারণ! শুভ আজ আর কোনো ক্ষুদ্র সীমার মাঝে বাঁধা নেই। সে আজ শহীদ। তার অস্তিত্ব ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত মুক্তিকামী মানুষের মধ্যে। সে আজ আর কেবল কারও পুত্র নয়, কারও ভাই বা বন্ধু নয় আজ থেকে সে সমস্ত যুব-শক্তির প্রাণের উৎস, কর্মের প্রেরণা। ক'জন পিতার ভাগ্যে এ জিনিষ দেখার সৌভাগ্য হয় আর্থার ? তাই বলছিলাম, আজ আমার বড় সুখের দিন, বড় আনন্দের দিন। আমি পরম ভাগ্যবান!' কথা বলতে বলতে দু'চোখ বেয়ে জল পড়ছিল গৌরীনাথের। চোখের সে-জল গোপন করবার এতটুকু চেষ্টা করেননি তিনি।

আর্থারের চোখেও জল টলটল করছে। আর্থারের কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে বলেছিলেন, 'আমার কাছে এ-এক পরম শিক্ষা আর্থার। ভেবে ত্যাখো সেই পরম পিতার কী বিচিত্র লীলা! যে-ইংরেজ একবার ভয়ঙ্করের রূপ নিয়ে আমার দেহ থেকে দু'খানা বাহু বিচ্ছিন্ন করে দিল, আবার সেই ইংরেজই পরম করুণাময়ের রূপ নিয়ে শান্তির বারি সিঞ্চন করল আমার দেহ-মনে! এ কত বড় শিক্ষা বলতো আর্থার ? আজ কি মনে হচ্ছে জানো ? মনে হচ্ছে, এই যে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে আমাদের সামনে কত কি ঘটনা ঘটছে, আমরা তার সবটুকু দেখতে পাইনা। দেখার পরেও অনেক কিছু অ-দেখা থেকে যায়। আর এই অ-দেখা থাকে বলেই আমাদের এত ক্ষোভ। যাঁরা সবটুকু দেখতে জানেন তাঁরা বিরাজ করেন এক মহাশান্তির রাজ্যে। মনে হচ্ছে, আজ যেন একটু একটু করে বুঝতে পারছি, ভাল আর মন্দ এই দুই-ই আসলে সেই মহাশক্তির দুই রূপ।'

গৌরীনাথের কথা শুনতে শুনতে চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছিল আর্থারের। কোনো উত্তর দিতে পারেনি সে। কেবল অনুভব করছিল, কী এক অদৃশ্য বাঁধনে সে যেন বাঁধা পড়ে গেল এই সন্ন্যাসী প্রতিম বৃদ্ধের সঙ্গে।

পুলিশের কাছ থেকে কিন্তু রেহাই পায়নি আর্থার। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে ডাকা হয়েছিল পুলিশ হেড-কোয়ার্টার্সে। বারবার প্রশ্ন করা হয়েছিল, শুভময়ের লেখা চিঠির উদ্দিষ্ট ব্যক্তি সে-ই কিনা, শুভময়ের সঙ্গে তার কি ধরণের যোগাযোগ ছিল, ওদের দলের কতটুকু খবর সে রাখে, ইত্যাদি হাজার প্রশ্ন। আর্থারের প্রশ্নের উত্তরে ঠিক যেন সন্তুষ্ট হতে পারছিল না পুলিশ কর্তৃপক্ষ।

যে-পুলিশ অফিসারটি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল একসময় সে আর্থারের চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিল, 'আচ্ছা আপনি তো শিউলী দেবীকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন তাইনা ?

—চেয়েছিলাম।—শান্ত উত্তর আর্থারের।

—করলেন না কেন ?

—সে-সুযোগ হল না বলে।

—আচ্ছা ওরা যে আপনাকে একসপ্লয়েট করতে চেয়েছিল এ-কথা কি আপনার কখনও মনে হয়নি ?

—একসপ্লয়েট করতে চাইলে নিশ্চয়ই মনে হোতো।

—সেদিনও মনে হয়নি, যেদিন শিউলী দেবী আপনার পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে আপনাদের বাডী থেকে ফায়ার-আর্মস চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে শেষ পর্যন্ত সুইসাইড করল ?

একটুকাল চুপ করে রইল আর্থার। তারপর হেসে প্রশ্ন করেছিল, 'একটা কথা বলবো ?'

—বলুন না।

—আচ্ছা আপনার কি কখনও মনে হয় না, বিদেশী সরকার মাইনের ক'টা টাকা দিয়ে আপনাকে একসপ্লয়েট করছে ?

—এমন অবাস্তর কথা কেন মনে হবে ?—ভুরু কুঁচকোলেন বাঙালী অফিসারটি।

—অথচ দেখুন এই মুহূর্তে আমার তাই মনে হচ্ছে। কাজেই দেখছেন কার যে কখন কি মনে হয় সে-বলা বড় মুস্কিল। ও-নিয়ে মাথা না ঘামানোই ভাল, তাই না ?

—হুঁ।

গম্ভীর হয়ে গেলেন অফিসারটি। একটুকাল চুপ করে থেকে বল্লেন, 'যাক যা হবার তা' হয়েছে, এখন ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে একটা অনুরোধ করছি।'

—করুন।

—আপনার বাবা আপনাকে যা বলছেন তা-ই করবেন। বাবার কথা অবহেলা করবেন না, এতে আপনার ভালই হবে।

—ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ।

ছাড়া পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল আর্থার। বেরোবার মুখেই কিন্তু বাবার সঙ্গে দেখা। একেবারে মুখোমুখি। এ্যালফ্রেড ডবসন পুত্রের পোষাকের

দিকে চেয়ে একটু যেন চমকে উঠেছিলেন। অলক্ষ্যে ধুতি-পাঞ্জাবীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করেই পুত্রের একটা হাত ধরে বলেছিলেন, 'বাড়ি চল আর্থার, বাড়ি চল।'

বাবার করুণ কণ্ঠ শুনতে অভ্যস্ত নয় আর্থার। বাবার গলার এমন করুণ আর্তনাদ হঠাৎ যেন তাকে বড় বিচলিত করেছিল। সেই মুহূর্তে বাবার মুখের ওপর 'না' বলতে পারেনি সে। বাবার দিকে একবার তাকিয়ে নিঃশব্দে তাঁর সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে বসেছিল। গাড়ি চালাতে চালাতে বলেছিলেন এ্যালফ্রেড, 'আর্থার, ভাবছি এখানকার সব কিছু বিক্রী করে এবার দেশে চলে যাব। দেশে গিয়েই ব্যবসা করা যাবে। কাজেই এবার সব কিছু দেখে-শুনে নাও, সব কিছু বুঝে নিয়ে বিক্রীর ব্যবস্থা করো। বুড়ো হয়েছি, একা আর সব কিছু পারি না। দেশে গিয়ে এখন থেকে তুমিই সব করবে। আমার ছুটি।'

আমি তো যেতে পারব না, বাবা। আমি এখানেই থাকছি।

—না, আর্থার চল, এখানে থাকলে আমাদের কারও ভাল হবে না।

বাবার কথার কোনো উত্তর না করে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল আর্থার। গাড়ি থেকে বাইরের দিকে চেয়ে রইল কিছুকাল। তারপর আস্তে আস্তে বাইরে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে বাবার দিকে তাকিয়ে বলল,—'বাবা তোমার আমার মধ্যে একটা কথা পরিস্কার হোয়ে যাওয়া ভাল। শিউলীর ব্যাপারটা নিয়ে যে-পৈশাচিক ঘটনা ঘটেছে তারপর আমি তোমাদের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখতে চাইছি না। তুমি তোমার টাকা-পয়সা-বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে যা' ইচ্ছে তাই করতে পার। ওর একটা কানাকড়িও আমি নেব না, নিতে পারি না।'

—আর্থার।—এ্যালফ্রেড ডবসনের গালে কেউ যেন একটা চড় মেরেছিল।

—এমন দিন যদি কখনও আসে যখন আমাকে একান্ত প্রয়োজন তখন ডেকো, নিশ্চয়ই যাব।

—আর্থার, আমার যদি আর একটা সন্তান থাকতো তোমাকে এমন করে বিরক্ত করতাম না!—আকুলভাবে বলেছিলেন এ্যালফ্রেড ডবসন।

এরপর আর কোনো কথা হয়নি। আর্থার মাঝপথে একসময় নেমে গিয়েছিল গাড়ি থেকে।

সেইদিনই গৌরীনাথকে গিয়ে বলেছিল আর্থার, 'কাকাবাবু, আর দেরী করা চলে না, অর্গানিজেসন গঠন করবার সব ব্যবস্থা পাকাপাকি করে ফেলতে হয়।'

—বেশ তে করো। কিভাবে শুরু করবে?

—একটা জমি দেখে এসেছি, প্রায় দশ বিঘের একটা প্লট। কলকাতার কাছেই গঙ্গার ধারে। খুব সুন্দর জায়গা। এই জমিটা কিনে মাত্র দুটো জিনিষকে কেন্দ্র করে প্রথমে কাজ শুরু করতে হবে। উইভিং এ্যাণ্ড এগ্রিকালচার। অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান সকলের আগে প্রয়োজন। এই দুটো জিনিষে যদি কো-অপারেটিভ মাইণ্ড গঠন করা যায় তাহোলে অনেকখানি কাজ হবে।

—বেশ তো, তা হোলে আর দেরী করা কেন, জমি কেনার ব্যবস্থা করো। জমির টাকার জন্য ভেবো না। হ্যাঁ একটা কথা শিক্ষার্থীদের যে-ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করতে চাইছো সেটা কি অবৈতনিক?

—প্রথম কিছুদিন অবৈতনিক না করলে শিক্ষার্থী পাওয়া হয়তো অসুবিধে হবে।

—তাহোলে খরচ চলবে কি করে? কিছু লোক তো তোমাকে রাখতেই হবে। যারা হাতে-নাতে কাজ শেখাবে তারা তো আর বিনা টাকায় শেখাবে না।

—উইভিং সেণ্টারে যে কাপড় তৈরী হবে তা' বিক্রী করেও তো কিছু আয় হবে।

—সে আর কতটুকু? তার চেয়ে এক কাজ করো, কিছু কিছু ক্যাশ ডোনেসন জোগাড় করো, বাইরের সাহায্য নিয়ে প্রতিষ্ঠান চলার খরচ আপাতত চালিয়ে নাও। পরে প্রতিষ্ঠান যখন বড় হবে, তখন এসব প্রয়োজন হবে না, নিজের খরচের টাকা সে নিজেই আয় করতে পারবে। কিছু ডোনেসন পেয়ে যাবে। আমার বন্ধুবান্ধবের কাছে চিঠি লিখে দেবো, তারা তোমাকে সাহায্য করবে। সবার আগে জমিটা কিনে বিল্ডিং কনস্ট্রাকসনের ব্যবস্থা করো।

এরপর কাজ শুরু করতে আর বেশী দিন লাগেনি। জমি কেনা হয়েছিল, প্ল্যান মাফিক শুরু হয়েছিল কনস্ট্রাকসন। জমি ঘিরে নিয়ে একটু একটু করে তৈরী হচ্ছিল বিভিন্ন কেন্দ্র। মাঝখানে অফিস। অফিসের একপাশে কৃষির ক্ষেত, যন্ত্রের সাহায্যে চাষের ব্যবস্থা। বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ, সার প্রয়োগ, কীটনাশের পদ্ধতি। আর একপাশে লম্বা লম্বা দোচালা শেড তাতে নানা রকম কারিগরি কাজের ব্যবস্থা—চামড়ার কাজ, বেতের কাজ, তাঁত। সেই সঙ্গে লাগান হচ্ছিল নানা রকম গাছ—আম-নিম-অশোক-শিউলী। অফিসের পেছনে ঠিক গঙ্গার ওপর দুটি আবাসগৃহ,: একটা ছেলেদের আর একটা মেয়েদের। এরই সংলগ্ন লাইব্রেরী।

জলের মত টাকা খরচ করলেন গৌরীনাথ, জলপাইগুড়ির জমিদারির অনেকখানি অংশ বিক্রী হোয়ে গেল এর টাকা জোগাতে।

সেটা উনিশশো তিরিশ সাল। এপ্রিল মাস। দেশের রাজনৈতিক পালে তখন নতুন হাওয়া। শিউলীর বিল্ডিং কনস্ট্রাকসন তখনও শেষ হয়নি। লোকের জন্য, টাকার জন্য, কাজ দেখাশোনার জন্য আর্থারকে ছুটোছুটি করতে হচ্ছে সারাক্ষণ। গৌরীনাথ যখন রিপন কলেজে অধ্যাপনার কাজ করতেন সেই সময়ের বন্ধু-বান্ধবের কাছে ছুটে যেতে হচ্ছে আর্থারকে। তখন তার প্রচণ্ড কাজের উদ্দীপনা। প্রত্যেকের কাছে পাচ্ছে শুভেচ্ছা, পাচ্ছে অর্থ সাহায্য, আর সেই সঙ্গে জুটে যাচ্ছে উৎসাহী কর্মী। একজন ইংরেজ যুবকের উৎসাহে শিক্ষিত বাঙালী যুব সমাজ যেন নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হল। তখন দেশ জুড়ে চলেছিল রাজনৈতিক আন্দোলন—দ্বিতীয় পর্যায়ের অসহযোগ আন্দোলন। লর্ড আরউইন ভারতের বড়লাট। ভারতকে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দেবার ব্যাপারে তিনি ছিলেন উৎসাহী। বৃটীশ সরকার কিন্তু তাঁর কথায় কর্ণপাত করতে রাজী নয়। জাতীয় কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী তুলল। গান্ধীজীর ডাণ্ডি অভিযান দিয়ে শুরু হল বিপুল আন্দোলন।

এদিকে বৃটীশ সরকার একদিন যে-বিষবৃক্ষ রোপণ করেছিল তা' তখন মহীরুহের রূপ নিয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার চিড়টা তখন একটা বিরাট ফাটল হয়ে দেখা দিয়েছে দেশের গায়ে। জিন্না সাহেবের চোদ্দদফা দাবী ঝুলছে জাতির মাথার ওপর। গোটা জাতিকে দুই ভাগে ভাগ করতে সফল হয়েছে জেনে বৃটীশ সরকার খোশ মেজাজে গোঁফে তা দিচ্ছে। ধর্মের আফিমের নেশায় বুঁদ-হওয়া মানুষগুলো সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জর। যারা সেদিন সিরাজের জন্য পলাশীর প্রান্তরে মোহনলালের নেতৃত্বে এক সঙ্গে লড়াই করেছিল, লড়াই করেছিল এক সঙ্গে কাঁধে কাঁধ দিয়ে আঠারোশো সাতান্ন সালে সিপাহী বিদ্রোহে, তারাই বৃটিশ সরকারের চক্রান্তে একজন আর একজনের পরম শত্রু হয়ে দাঁড়াল। সরে দাঁড়াল একজন আর একজনের কাছ থেকে।

সেদিন সকালের কাগজটা হাতে নিয়ে দেশের এই সব কথাই ভাবছিল আর্থার। ভাবতে ভাবতে শিউলীর কথা মনে পড়ছিল। দেশের সাধারণ গরীব মানুষগুলোর কথা বলতে গিয়ে একদিন বলেছিল শিউলী, 'এই যে সব গরীব খেটে-খাওয়া মানুষ, এদের আবার আলাদা কোনো জাত-ধর্ম আছে নাকি? দারিদ্র্যই ওদের ধর্ম, কিছু না-থাকাটাই ওদের জাত। জাত-ধর্ম আছে বই-এর পাতায় আর আছে যারা শোষণ করতে চায় তাদের হাতে

হাতিয়ার হিসেবে।'

কথাগুলো অনেকক্ষণ ধরে ভাবল আর্থার। ভাবল হিন্দুদের ছুঁৎ-মার্গের কথা, সেই সঙ্গে ভাবল, মানুষের ঈশ্বর-বোধের কথা। ঈশ্বরকে চায় ক'জন? খুব সামান্যই। বাকীরা তো ঈশ্বরকে নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির মাধ্যম হিসেবে মনে করে। ঈশ্বর-উপলব্ধি আছে ক'জন মানুষের? সবাই তো বাইরের আচার-অনুষ্ঠান-সংস্কার এইসব দিয়েই ঈশ্বরকে বোঝে। সমস্ত কিছুর কেন্দ্রে যে শক্তি বিরাজ করছে তাকে নিয়ে গোল বাধতে পারে না কিছুতেই। সেই শক্তির কথা খুব সামান্য লোক ভাবে বলেই, কে নমাজ পড়ল, আর কে করল পূজাহ্নিক, কে রোজা করল, কে করল একাদশী, কে জবাইকে করল বলিদান, তা-ই নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়। অন্তর-শূন্য বলেই বাইরের টানাটানি। এ-হেন ধর্ম তথা ঈশ্বরকে জীবন থেকে বাদ দিলে ক্ষতি কি? বরং বাদ দেওয়াই ভাল নইলে জীবন হবে দুর্বিষহ। সমস্ত সংস্কার আচার অনুষ্ঠানকে বাদ দিয়ে ঈশ্বরকে যে অন্তরে জাগিয়ে রাখতে পারবে ঈশ্বরে অধিকার কেবল তারই আছে।

অনেকক্ষণ বসে বসে কথাগুলো ভাবল আর্থার। ভেবে ভেবে একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছল যে, মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ধর্মের এই প্রহসন কিছুতেই থাকা উচিত নয়। এতে সাধারণের উপকার হয় না, এতে শোষকের হাতই শক্ত হয়।

সেই সময়টা মনে মনে আর্থার বড় অশান্তিতে কাটাচ্ছিল। দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে সব যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল তার। রাজনৈতিক গোলোক-ধাঁধার মধ্যে পড়ে সে যেন পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। কিছুতেই স্থির করে উঠতে পারছিল না দেশের এই আন্দোলনের মুখে তার কি করা উচিত, কোন্ পথে চলা উচিত। সে যেন পরিষ্কার বুঝতে পারছিল, বৃটিশ সরকারের ষড়যন্ত্রে দেশের অভ্যন্তরে যে-ফাটল ধরেছে সেই ফাটল-ধরা পথে আন্দোলন যদি এগোতে থাকে তবে দেশ একদিন দ্বিধা-বিভক্ত হবেই হবে। আর্থার নিজে ইংরেজ তাই কেমন একটা অপরাধ-বোধ তাকে কেবলই পীড়া দিচ্ছিল।

গৌরীনাথকে আর্থার তার মানসিক অবস্থার কথা খুলে বলল। সব শুনে গৌরীনাথ বল্লেন, 'তুমি বরং এক কাজ করো, রবিবাবুর কাছে একবার যাও। আজকের পৃথিবীতে তাঁর মত মানব-প্রেমিক ক'জন আছে? তাঁর কাছে যাও, তিনি হয়তো তোমায় কোনো নতুন পথ দেখাতে পারবেন। তোমার অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে পারে।'

কথাটা মনে লেগেছিল আর্থারের, তাই আর দেরী না করে পরদিনই ছুটে গিয়েছিল বিশ্বকবির কাছে। নিরিবিলি গোধূলিতে হাজির হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সামনে। তখন আবির-ছড়ানো পশ্চিম আকাশ, গাছের মাথায় মাথায় আগুন-রাঙানো স্বপ্নের নেশা! কবি একটা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে সামনের দিকে চেয়ে নিজের মধ্যে বিভোর হয়েছিলেন! আর্থার নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছিল তাঁর পাশে। কবি দেখতে পাননি। একটুকাল ইতস্তত করে ফিরেই যাচ্ছিল আর্থার, কবির ধ্যান ভঙ্গ করতে সাহসী হয়নি সে। এমন সময় কবি দেখতে পেয়েছিলেন তাঁকে। ধুতি-পাঞ্জাবী পরিহিত বিদেশী যুবকটিকে হঠাৎ সামনে দেখে বোধহয় একটু অবাকই হয়েছিলেন তিনি। ফিরে চাইতেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল আর্থার।

দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করতে করতে কবি বলেছিলেন, 'থাক থাক। এসে বসো।' কবির সামনে বসে আর্থার নিজের পরিচয় দিয়েছিল, 'আমার নাম আর্থার ডবসন, ইংলণ্ডের এক অজ গাঁয়ে জন্ম। সেখানে চব্বিশটা বছর কাটিয়ে একদিন কলকাতা এসেছিলাম বাবার ব্যবসা দেখাশুনো করতে। এখানে থাকতে থাকতে একদিন ভালবেসে ফেললাম এ-দেশটাকে।' একটু থামল আর্থার। কবির মুখে স্মিত হাসি, আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তারপর?'

—অবশ্য প্রথমেই দেশটাকে ভালবাসতে পারিনি। বাঙলা দেশকে ভালবাসার আগে ভালবেসেছিলাম একটী বাঙালি মেয়েকে! কিন্তু সে একদিন আমাদের সকলের কাছ থেকে হারিয়ে গেল।

কথা বলতে বলতে গলাটা ধরে এসেছিল, থেমে গিয়েছিল সে। তারপর আস্তে আস্তে কবির কাছে শিউলীর সমস্ত কথা খুলে বলেছিল। কবির কাছে সব কথা অকপটে বলতে এতটুকু দ্বিধা হয়নি তার। কিছুদিন ধরে মনে মনে যে-অশান্তি ভোগ করছিল তারও উল্লেখ করেছিল সে। প্রশ্ন করেছিল, 'আচ্ছা ভারতের ঠিক পথ কোন্‌টা? কোন্‌টা তার আদর্শ হওয়া উচিত? এই যে সাম্প্রদায়িকতার বেড়াজাল এর থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কি?'

কবি ধীরে ধীরে বলেছিলেন, 'সত্যিকার ভারতবর্ষীয় হওয়া। সত্যিকার ভারতবর্ষীয়ের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। তার কাছে ভারতবর্ষের সকল জাতই তার জাত,, সকলের অন্নই তার অন্ন। চণ্ডালের ঘরেও তার অপবিত্রতার ভয় থাকেনা। এই আদর্শ থেকে আমরা বিচ্যুত হয়েছি বোলেই আজ আমাদের সামনে সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা।'

—এর মূলে কি ধর্ম নেই?

গুরুদেবের মুখে মিষ্টি হাসি। ধীরে ধীরে বললেন, 'আসলে ধর্ম কি জান? সংসারে একমাত্র যা সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য, সমস্ত বিরোধের মধ্যে শান্তি আনতে পারে, সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে একমাত্র যা মিলনের সেতু তাকেই ধর্ম বলা যায়। সমস্ত মনুষ্যত্ব তার অন্তর্ভূত। এ জিনিষ মনুষ্যত্বের এক অংশে অবস্থিত থেকে অপর অংশের সঙ্গে অহরহ কলহ করেনা। মানুষ এ-কথাটা যখনই ভুলে যায়, তখনই বাইরের খোলসটাই তার কাছে প্রধান হোয়ে ওঠে, পরস্পরে শুরু হয় কলহ।'

গুরুদেবের কথায় সেদিন মন ভরে গিয়েছিল আর্থারের, মনের সেই অশান্ত ভাবটা কেটে গিয়েছিল। দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিল আর্থার, 'শিউলী জনকল্যাণ আশ্রম মানুষের কল্যাণ করতে পারবে তো?' উত্তরে গুরুদেব বলেছিলেন, 'সব সময়ে মনে রাখবে, গ্রামই ভারতের প্রাণ। সত্যিকার এ-দেশের যদি কিছু করতে চাও, গ্রামের মানুষের দিকে ফিরে চাইতে হবে।'

কথাটা মনে রেখেছিল আর্থার। সমস্ত অবসাদ কেটে গিয়েছিল আর্থারের, কাজে নতুন প্রেরণা লাভ করেছিল সে।

'শিউলী জনকল্যাণ আশ্রমে'র নির্মাণ-কাজ একদিন শেষ হয়েছিল। তারপর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয়েছিল। উদ্বোধন করেছিলেন স্বয়ং গৌরীনাথ রায়। উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে কোনো আড়ম্বর ছিল না, ছিল কর্মী আর শুভানুধ্যায়ীদের হৃদয়ের উত্তাপ। গৌরীনাথের উদ্বোধনী ভাষণ ছিল সংক্ষিপ্ত কিন্তু মর্মস্পর্শী। তিনি বলেছিলেন, 'আজ আমার বড আনন্দের দিন, বড় গৌরবের দিন। একদিন আমি আমার ছেলে-মেয়েকে হারিয়েছিলাম কিন্তু আজ আমি তাদের ফিরে পেয়েছি, অনেক বেশী করে কাছে পেয়েছি। শিউলী আশ্রমের কাজে আজ যারা এগিয়ে এসেছে তাদের সকলের মধ্যেই শিউলী আর শুভময়কে দেখতে পাচ্ছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একদিন এই সংগঠনের প্রভাব বহুদূর ছড়িয়ে পড়বে, সেদিন হয়তো আমি থাকবো না, কিন্তু সূর্যের আলোর মত আমার কাছে এ-কথা স্পষ্ট যে, সেদিন শিউলী আর শুভময়ের অস্তিত্ব ছড়িয়ে পড়বে সমস্ত মানুষের মধ্যে।'

'শিউলী'র উদ্বোধনের পরম ক্ষণটির জন্যই যেন এতদিন বেঁচেছিলেন গৌরীনাথ। উদ্বোধনের অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর জীবন-দীপ নিভে গেল। 'শিউলী'র কাজ কিন্তু থেমে থাকেনি। গ্রামে গ্রামে অনেক সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছিল।

কাজের মধ্যে নিজেকে একেবারে ভুলে গিয়েছিল আর্থার। নিজের ব্যক্তি জীবনটাকে একেবারে ভুলেই গিয়েছিল সে।

এমনি সময় একদিন হঠাৎ ডরোথীর এক চিঠি এসে হাজির। ছোট্ট চিঠি, মাত্র কয়েক ছত্র লেখা, "আর্থার, ক্ষমা চাইতে তোমাকে এ-চিঠি লিখছি না। 'শিউলী'র নামে কিছু টাকা পাঠাচ্ছি 'শিউলী'র প্রয়োজনে কাজে লাগিও। প্রায়শ্চিত্ত করছি বলে মনে করো না। আমার ইচ্ছে, 'শিউলী' বড় হোক। মাত্র ক'দিন আগে ভারতে এসেছি, ক'দিন পরই আবার চলে যাব, আর কখনও ফিরব কি-না জানিনা। শুভেচ্ছা রইল।"

চিঠিটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ বসেছিল আর্থার। এক-এক করে অনেক কথা মনে পড়েছিল সেদিন। ডরোথীর জন্য কেমন একটা ব্যথা অনুভব করেছিল। মনটা বারবার হু-হু করে উঠেছিল আর্থারের। ডরোথীর বিরুদ্ধে আর্থারের মনে এতদিন যে বিরূপতা ছিল চিটিটা পাবার পর তার সমস্তটুকু যেন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। ডরোথীর জন্য করুণা বোধ করেছিল সে। মনটা বার বার বলতে চাইছিল, ডরোথীর মঙ্গল হোক, তার কল্যাণ হোক। ডরোথীর টাকাটা যেদিন এল সেদিন সানন্দে তা' গ্রহণ করেছিল আর্থার। ফিরিয়ে দেবার কথা মনে হয়নি একবারও। 'শিউলী'র লাইব্রেরীর জন্য অনেক বই কেনা হয়েছিল ঐ টাকাতেই।

এই প্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন ডবসনকাকা 'জীবনের গতি কী বিচিত্র। ভেবে আশ্চর্য হতে হয়, যে-ডরোথী একদিন পৃথিবী থেকে শিউলীর অস্তিত্ব একেবারে মুছে দিতে চেয়েছিল, আর একদিন সে-ই আবার এগিয়ে এল শিউলীকে সকলের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখতে।' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়েছিলেন ডবসনকাকা। কিছুক্ষণের জন্য একটা কথাও বলতে পারেন নি আর।

টেমস্ থেকে তিস্তা

(দ্বিতীয় খণ্ড)

এক

আমিও সেদিন প্রথমটা কোনো কথা বলতে পারিনি। যখন জানতে পেলাম, দেবজ্যোতির ফ্ল্যাট ছেড়ে ললিতা চলে গেছে ভবসনকাকার কাছে, আর সেই সঙ্গে দেবজ্যোতি নিখোঁজ, তখন কথাটা যেন বিশ্বাসই করতে পারিনি আমি। কেমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। ওদের দু'জনার মানসিক দ্বন্দ্ব-যে শেষ পর্যন্ত এই পর্যায়ে এসে পৌঁছবে কখনও 'তা' ভাবতে পারিনি। জানতাম, দেবজ্যোতির জীবনে চলেছিল রঙ্ বদলের পালা। টাকার নেশা গ্রাস করেছিল ওকে, ললিতার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল ও। এ-সবই জানতাম, তবু এতটা আশা করিনি আমি।

ভবসনকাকার সাহায্যে যে-ফ্যাক্টরীতে দেবজ্যোতি একদিন এ্যাপ্রেনটিস হয়ে ঢুকেছিল, ট্রেনিং শেষ করে সেখানেই সে পারচেজিং সেকসতে সুপার-ভাইজার হয়ে বসেছিল। বেশ চলছিল সব, সাদামাটাভাবে দিন কাটছিল। হঠাৎ একদিন একটা সুযোগ এসে হাজির হল ওর সামনে। দেবজ্যোতি লুফে নিল সে-সুযোগটা। দেবজ্যোতির অবচেতন মন এমনি একটা সুযোগের জন্যই যেন অপেক্ষা করছিল এতদিন। জনকয়েক অর্ডার সাপ্লায়ার্সকে ঘিরে গড়ে উঠল একটা চক্র। বিভিন্ন পার্টস-এর ড্রইং ফ্যাক্টরী থেকে বাইরের সাপ্লায়ারকে চালান করে, টেণ্ডারের লোয়েস্ট প্রাইস্ আগেই ফাঁস করে দিয়ে লাভের একটা অংশীদার হয়ে বসল সে।

ললিতা দেখতো টাকার নেশায় একেবারে মশগুল হয়ে আছে দেবজ্যোতি। তার সেই পুরনো দিনের শপথ, কর্মের সঙ্কল্প সমস্ত ভেসে গেছে কোথায়। ললিতা ভয় পেতো। দেবজ্যোতির এই মোহগ্রস্ত অবস্থা তাকে শঙ্কিত করে তুলত।

সেদিনটা ছিল ছুটীর দিন, দেবজ্যোতি আর ললিতা এক সঙ্গে চলেছিল আশ্রমে। যাবার পথে ললিতা একসময় বলেছিল, 'টাকার জন্য এত খাটছো কেন? এত টাকার কিসের প্রয়োজন তোমার?'

ললিতার প্রশ্ন শুনে হা-হা করে হেসে উঠেছিল দেবজ্যোতি। তারপর বলেছিল, 'আমার একার প্রয়োজন নয়, বলো আমাদের প্রয়োজন। তোমার-আমার প্রয়োজন ছাড়াও তাদের প্রয়োজন আরও বেশী দু'দিন পর যারা

পৃথিবীর আলো দেখবে। জানো ললিতা, আমদের ছেলে-মেয়েদের যাতে আমাব মত কষ্ট করতে না-হয় তার ব্যবস্থা করে যাব।'

—সংসারের কথা আজকাল বড় বেশী করে ভাবছো।

—সংসার করবো অথচ সংসারের কথা ভাববো না?

—তা' অবশ্য। আদর্শের কথা তো কতগুলো ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া কিছুই নয়।

ললিতা যেন একটু কটাক্ষ করতে চাইল। দেবজ্যোতিও যে সেটুকু বুঝতে পারল না তা' নয়। দেবজ্যোতি ললিতার কথার উত্তরে ভুরু কুঁচকে বলল, 'আমাদের আদর্শের সঙ্গে সংসার-ধর্মের কি কোন সংঘাত আছে?'

তা' নেই ঠিকই, তবে ব্যক্তি-স্বার্থ যখন আর সব কিছুকে ছাপিয়ে ওঠে তখন সংঘাত বাধে বৈকী!

—তা'হলে কি বলতে চাও ব্যক্তি-স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে আদর্শকে রক্ষা করতে হবে?

—আমি কিছুই বলতে চাইনা, কারও ওপর কিছু চাপাতেও চাইনা, কথার পিঠে কথা উঠল তাই বল্লাম।

একটুকাল চুপ করে রইল দেবজ্যোতি, তারপর বলল, 'আজ অবহেলা করছো, কিন্তু ভবিষ্যতে বুঝতে পারবে আমি এতটুকু ভুল করিনি।'

আলোচনাটা এখানেই থেমে গিয়েছিল সেদিন। সত্যি বলতে গেলে, এ-নিয়ে আর কোনো দিনই আলোচনা করেনি ওরা। এক ভাবে দিন কেটে যাচ্ছিল। দেবজ্যোতি ওর নতুন কাজের মাধ্যমে একসঙ্গে অনেকগুলো টাকা পেয়ে গেল। সেই উপলক্ষে হোটেলে একটা পার্টির আয়োজন করেছিল সবাই। ললিতাও নিমন্ত্রিত হয়েছিল, কিন্তু শরীর খারাপের অজুহাত দেখিয়ে ললিতা গেলনা সেখানে। বস্তুত ব্যাপারটায় মনটা হঠাৎ যেন বিদ্রোহ করতে চাইল, আর যেন সহ্য করতে পারছিল না সে। সহ্যের সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। এক মুহূর্তে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মনস্থির করে ফেলেছিল। তারপরই কাগজ কলম নিয়ে দেবজ্যোতিকে একটা চিঠি লিখতে বসেছিল। লিখেছিল—

জ্যোতি,

মানুষের পরিণতির বীজ তার চরিত্রের মধ্যেই লুকোনো থাকে, এতদিন পর এ-কথাটা আবার নতুন করে উপলব্ধি করলাম। তোমরা যাকে স্বাচ্ছন্দ্য বলো আমার ভাগ্যে তা' নেই, বোধহয় তার জন্য আমার চরিত্রই দায়ী। যারাই আমার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বেশী করে ভাবে সেখান থেকেই মনটা আমার

পালাই পালাই করে, আমার চরিত্রের গঠনই এমন। মা-বাবা-দাদা-বৌদিদের চিরকাল দূর থেকেই দেখে এসেছি, ওদের কাছে গিয়ে ওদের সঙ্গে মিশে যেতে পারিনি কখনও। তোমাকেও এখন থেকে দূর থেকেই দেখবো। এটাও হয়তো আমার চরিত্রের একটা দিক,—আপন জনকে দূর থেকে দেখার নেশা। ঠিক করেছি এখন থেকে শিউলী আশ্রমেই থাকব। সেখানে থাকতে ভালই লাগবে। মনে করোনা যেন তোমার ওপর কোনো রাগ বা অভিমান করে চলে যাচ্ছি। এখানে থাকতে আর ভাললাগছে না, এই ভাল-না-লাগা অবস্থায় যদি থাকি তা'হলে মনের ওপর জোর করতে হয়, কিন্তু আমি তা' করতে চাই না, তাই চলে যেতে হচ্ছে। আমার বিশ্বাস, তুমি আমার কথা বুঝতে পারবে।

'একদিন তোমার পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করতে ভাললেগেছিল তাই চলে এসেছিলাম, মা-বাবার অবাধ্য হয়েই চলে এসেছিলাম। সেদিন না-এলে মনের ওপর জোর করা হত। তেমনি আজও চলে না গেলে মনের ওপর জোর করা হবে। বাড়ি থেকে যেদিন চলে এসেছিলাম সেদিন আমার মনে হয়েছিল, আমি আমার আদর্শের মধ্যে দিয়ে ফুলে-ফলে পূর্ণ হয়ে উঠবো, তাই ছুটে এসেছিলাম, কোনো দিকে ফিরে তাকাইনি। আজ আমার সে-ভুল ভেঙ্গে গেছে। আজ বুঝতে পেরেছি, আদর্শকে যে আঁকড়ে থাকে তার মহীরুহের প্রয়োজন হয় না, সে আপনিই বেড়ে উঠতে পারে, আদর্শ ই তাকে পথ দেখায়, তার জীবনকে ফুলে-ফলে পূর্ণ কোরে তোলে। নিজেকে ছোট করে দেখে নিজের ওপর যে-অন্যায় একদিন করেছিলাম আজ তার সংশোধন করে স্বস্তি পেলাম। এর মধ্যে কিন্তু মান-অভিমানের কোনো অবকাশ নেই।

'এ-কথা নিশ্চয় মানো আদর্শের বোঝা কারও ওপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না, চাপিয়ে দিলে তার ফল ভালও হয় না? সহজ ভাবে বেড়ে ওঠার মধ্যেই রয়েছে সৌন্দর্য। নিজের জীবন দিয়ে এ-সত্য আজ উপলব্ধি করেছি। আমার কথাই ধরো, প্রথম যখন শিউলী আশ্রমের কাছাকাছি এলাম, তখন আমার মনটা একেবারে সপ্তমে বাঁধা ছিল, অমনি একটা কর্মজীবনের জন্য উন্মুখ হয়েছিল মন। ইচ্ছে করলেই ডবসনকাকা সেদিন পুরোপুরি আমায় তাঁর আশ্রমের মধ্যে টেনে নিতে পারতেন, কিন্তু তা' তিনি করেননি। তিনি আমার মনটাকে সহজভাবে বেড়ে উঠবার সুযোগ দিয়েছিলেন। সেদিন তিনি তা' করেননি বোলেই আজ মনটা আমার উদ্বেল হয়ে উঠেছে। সেই ঋষিতুল্য মানুষটীর কাছে গিয়ে নিজেকে উজাড় করে দিতে না পারলে আজ আর আমার স্বস্তি নেই শান্তি নেই। তাই চললাম।

তোমার জীবনকেও সহজভাবে বেড়ে উঠবার সুযোগ দিয়েছেন ভবসনকাকা। তাই আশা রাখি, তোমার মনও একদিন আশ্রমে ছুটে যাবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠবে। যদি সত্যি তোমার জীবনে তেমন দিন কখনও আসে, তুমিও এসো।

ইতি তোমার

ললিতা।

টেবিলের ওপর চিঠিটা চাপা দিয়ে রেখে সেই সন্ধ্যাতেই চলে গিয়েছিল ললিতা। সোজা গিয়ে হাজির হয়েছিল ভবসনকাকার সামনে। মিষ্টি হেসে অভ্যর্থনা করেছিলেন ভবমনকাকা, ভালো-মন্দ কোনো কথাই বলেননি তিনি। তিনি যেন জানতেন, এমন একটা দিন আসবে যেদিন ললিতাকে ছুটে আসতে হবে আশ্রমের গণ্ডীর মধ্যে, তাকে নিজের কাঁধে তুলে নিতে হবে কর্মের ভার। তাই ললিতাকে দেখে ভবসনকাকার মুখে ফুটে উঠেছিল একটা তৃপ্তির হাসি, আনন্দের দীপ্তি। শুধু বলেছিলেন, 'যাও, নিজের থাকবার জায়গটা একটু দেখে শুনে নাও।'

—হুঁ যাই।—অস্পষ্ট ভাবে কথাটা বলেই চলে গিয়েছিল ললিতা মেয়েদের কোয়ার্টায়ের দিকে।

সেদিন পার্টি সেরে ফিরতে একটু রাতই হয়েছিল দেবজ্যোতির। বাড়ি ফিরে ললিতাকে দেখতে না পেয়ে ভেবেছিল, হয়তো ললিতা তখনও আশ্রম থেকে ফেরেনি। তাই শান্ত মনেই ঘরে ঢুকেছিল সে, কিন্তু টেবিলের ওপর চিঠিটা দেখেই কেমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। বারবার অনেকবার চিঠিটা পড়েছিল। কি করবে কিছুই যেন ভেবে স্থির করতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত সেই রাত্রেই ছুটে এসেছিল আমার কাছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ওর, আমিও তখন আমার ডেরায় ছিলাম না, দিন কয়েকের জন্য গিয়েছিলাম কলকাতার বাইরে।

দেবজ্যোতি ওর ফ্লাটে ফিরে গিয়েছিল আবার। নিজের অন্ধকার ঘরের মধ্যে অনেকক্ষণ বসেছিল চুপচাপ। বসে থাকতে থাকতে ওর মনে হচ্ছিল, একটা ভয়ঙ্কর অন্ধকার যেন ওকে ক্রমশ গ্রাস করে ফেলতে চাইছে। ওর সামনে থেকে যেন সমস্ত আশার আলো নিভে যাচ্ছিল একটা একটা করে। ওর মনে হচ্ছিল, ঐ ফ্ল্যাটে যদি আর একটা দিনও থাকে তাহলে ও পাগল হয়ে যাবে। ললিতাকে দেবজ্যোতি চেনে, ললিতা যে আর ফিরবে না সেটা সূর্যের আলোর মত স্পষ্ট। ললিতাকে ফিরিয়ে আনতে যাওয়া অর্থহীন। কিন্তু এরপর? এরপর

দেবজ্যোতির যাত্রা কোন পথে? অনেকক্ষণ বসে ভেবেছিল, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি। শেষ পর্য্যন্ত স্থির করেছিল, যত শিগ্‌গির সম্ভব কলকাতা ছাড়তে হবে তাকে।

পরদিন ভোরেই হাওড়া স্টেশনে এসে হাজির হয়েছিল দেবজ্যোতি, কোথায় যাবে কোনো ঠিক ছিল না। কবে ফিরবে, আদৌ ফিরবে কিনা সেসব কথা ভাববার মত মনের অবস্থাই ছিল না তার। হঠাৎ একটা আঘাতে এতদিনের তৈরি তাসের ঘরটা যেন ভেঙে চুর চুর হয়ে গিয়েছিল। দেবজ্যোতি যেন নিজের কাছ থেকেই পালাতে চাইছিল, ওর যাত্রা ছিল অনির্দ্দিষ্টের পথে। কলকাতা থেকে ওর নিখোঁজ হওয়ার দিন দশ-বারো পর পেয়েছিলাল ওর চিঠি খানা। ভাবালুতায় ভরা চিঠি। একটা আকুতিতে পূর্ণ মনের ছোঁয়া রয়েছে চিঠির প্রতিটি ছত্রে। চিঠিটায় দেবজ্যোতি লিখছে—

"ভাবলে অবাক হতে হয় সারা জীবন কত বিচিত্র ঘটনার মধ্যে দিয়েই না মানুষকে এগোতে হয়! এই সব ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষ কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এই সব বিচিত্র ঘটনা-প্রসূত অভিজ্ঞতা মানুষের মনে যে ভাবের তরঙ্গ সৃষ্টি করে তা-যে কেবল বৈচিত্র্যময় তা-ই নয়, প্রায়ই তা' পরস্পর-বিরোধী। অবশ্য এ-কথা সত্য যে জীবনের দরিয়ায় ঘটনার স্রোতে ভাবের যে তরঙ্গমালার সৃষ্টি হয় মানুষকে তা-ই এনে দেয় গতি! হয়তো এই গতিময়তার নামই জীবন।

আজ জীবনের এক অদ্ভুত অবস্থায় দাঁড়িয়ে পেছনের দিন গুলোর দিকে তাকিয়ে এই সব ভাবনাই আমায় বিশেষ ভাবে দোলা দিচ্ছে।

ছেলেবেলায় দিদিকে যেদিন হারিয়েছিলাম সেদিন আমার মনে একটা ভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। সেদিন মনে লয়েছিল, মানুষের একমাত্র কাম্য প্রচণ্ড দৈহিক শক্তি। সেদিন অপরিণত বয়েসের বুদ্ধি দিয়ে মনে হয়েছিল, দেহে যদি অসীম ক্ষমতা থাকে তবে সবাইকে শাস্তি দেওয়া যায়, শায়েস্তা করা যায়—রমজান আলি বড় বাড়ির দারোয়ান, সোলেমান ডাকাত—সবাইকে! অদম্য পশু-শক্তিই তখন পার্থিব সব কিছু জয়ের চাবি কাঠি বোলে মনে হয়েছিল। আমার সেই উপলব্ধিতে ফাটল ধরল বর্দ্ধমানে এসে। মনের মুকুরে আবার নতুন উপলব্ধির স্বরূপ ফুটে উঠল। সেদিন মনে হয়েছিল, অর্থই মানুষের সব। মানুষ সব কিছুকে জয় করতে পারে অর্থের বিনিময়ে। দুঃখকে ভুলতে পারে, সমস্ত আত্মীয়তা গড়ে উঠতে পারে অর্থের মাধ্যমে আবার অর্থের জন্যই পরম আত্মীয়ও পর হতে পারে। সেদিন পিতৃ-পুরুষের ভিটেতে স্থান হয়নি আমাদের, পাছে ভিটের অংশ দাবী করি তাই

বাবার জ্ঞাতি-ভায়েরা স্থান দেয়নি আমাদের। চলে যেতে হয়েছিল মামাবাড়ি। সেখানেও মামাদের গলগ্রহ হলাম আমরা। সহায়-সম্বল হীন আমরা, আমাদের দায়িত্ব কে নেবে ঘাড়ে? মা পাগলী, দিন চলতে চায় না, অতএব এর তার সঙ্গ ধরে ছুটে এলাম কলকাতা টাকা রোজগারের আশায়।

সবার কাছে শুনতাম কলকাতায় নাকি টাকা ছড়ানো আছে, দেশ-বিদেশ থেকে লোক এসে কুড়িয়ে নিচ্ছে সেই টাকা। শুনতে শুনতে কেমন যেন নেশা ধরে গিয়েছিল, টাকা আমার চাই-ই। কিন্তু কোথায় টাকা? দু'মুঠো অন্নের সংস্থানই হয়না। সারাদিন ছুটোছুটি করে ক্লান্ত দেহ-মনে বিরাট শহর কলকাতার কোনো বাড়ির রকের এককোণে গুটীসুটি মেরে শুয়ে পড়তাম। ক্রমশ হতাশায় ভরে উঠতে লাগল বুক। এমনি একটা সময় মার মৃত্যুর খবর পেলাম।

কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে চাইল সমস্ত দেহ, কিন্তু সেই মুহূর্তে মনটা কেমন বিদ্রোহ করে উঠল, মানুষের ওপর থেকে বিশ্বাস গেল হারিয়ে। এমন সময় দেখা পেলাম ডবসন কাকার। মনটা কেমন দুলে উঠল, পৃথিবীটার রূপ আবার নতুন হোয়ে দেখা দিল চোখের সামনে। নতুন করে ভাবতে বসলাম আবার। একটু একটু করে বদলে যেতে লাগল মনের চেহারাটা। স্পষ্ট অনুভব করলাম মনটা কেমন যেন সবুজ হোয়ে উঠছে, আনন্দের আমেজ লাগছে সেখানে।

তবু মাঝে মাঝে সেই ভয়ঙ্কর অতীতটা কেমন তাড়া করে আসতো। দিদির মৃত্যু, বাবা-মার মানসিক বিকৃতি, আত্মীয়-স্বজনের অবজ্ঞা মনের সব কিছুকে কেমন মেন গুলিয়ে দিত। আবার একটা প্রতিহিংসা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতো মনের মধ্যে। অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত। চলতে চলতে পথ হারিয়ে যায়। এমনি সময় দেখা পেলাম ললিতার। রৌদ্র দগ্ধ পৃথিবীতে যেন একটা স্নিগ্ধ হাওয়া। জুড়িয়ে গেল সমস্ত দেহ-মন। নতুন করে বেঁচে উঠলাম আমি। নতুন করে পেলাম জীবনের আস্বাদ। এরপর আমি আর কিছুই ভাবিনি, কেবল ভেবেছি ওর কথা, ওর স্বাচ্ছন্দ্যের কথা। ওর ভাল লাগাই ছিল আমার ভাললাগা, ওর ভাল থাকাই ছিল আমার ভালথাকা।

কিন্তু শশাঙ্কশেখর চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আবার একটা আঘাত পেলাম, দারিদ্রের জ্বালা সমস্ত মনটাকে বিষাক্ত করে তুলল। একটা সত্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালাম, বারবার মনে হতে লাগল, শশাঙ্কশেখর চৌধুরী একেবারে মিথ্যে বলেননি। ললিতা যদি ধনী ঘরের মেয়ে না হোত, তবে হয়তো ঘটনার মোড় অন্যদিকেই ফিরতো, হয়তো এমন করে ঝুঁকতাম না

এই দিকে। সেই মুহূর্তে একটা ককপ্লেকস গ্রো করেছিল আমার মধ্যে। অনেক চেষ্টা করেও এর হাত থেকে মুক্তি পাইনি। তাই নিজের আর্থিক অবস্থাকে ওপরে তুলে এনে সমতা রক্ষা করতে চেষ্টা করেছিলাম। মনের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসতে চেয়েছিলাম।

তারপর আস্তে আস্তে একদিন কোথায় তলিয়ে গিয়েছিলাম নিজেরই আর মনে নেই। আজ এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি যেখানে দাঁড়িয়ে আর কোনো কিছু ভাবতে পারছি না। নিজের পৃথক অস্তিত্ব অসহ্য মনে হচ্ছে, নিজের অস্তিত্বকে মিশিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে এই বিশাল জনারণ্যে, হারিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে নিজেকে। ভবিষ্যতের কথা ভাবিনা, অজানা ভবিষ্যৎ জানবার কোনো কৌতূহলও নেই।

ললিতাকে আলাদা কোনো চিঠি দিলাম না। দিয়ে কোনো লাভ নেই বোলে। ডবসন কাকাকেও না, দেবার মুখ নেই বোলে। ওদের যা' হয় একটা কিছু বলে দিস, সব দায়িত্ব তোর ওপরই ছেড়ে দিলাম। ঠিকানা দিলাম না, কারণ আগামী দিনের কোনো কিছুই আমার জানা নেই। ভালবাসা রইল।"

চিঠিটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ বসেছিলাম চুপ করে। নানা ভাবনার দোলায় দুলছিল মনটা। তারপর একসময় সোজা চলে গিয়েছিলাম ললিতার কাছে। ললিতা অত্যন্ত ব্যস্ত। চৌরঙ্গী পাড়ায় একটা বড় শো-রুম খোলা হচ্ছে, 'শিউলী'র তৈরী নানা রকমের জিনিষ বিক্রী হবে সেখানে। কেনা-বেচার সমস্ত দায়-দায়িত্ব থাকবে 'শিউলী'র মহিলা কর্মীদের ওপর। 'শিউলী'র কুটীর শিল্পে তাই কর্ম তৎপরতা।—তৈরী হচ্ছে ভাল-ভাল বেতের চেয়ার, চামড়ার ব্যাগ, তাঁতের কাপড়। এই নতুন শো-রুমের উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে বেরোচ্ছে ছোট একটা পুস্তিকা। সব মিলিয়ে 'শিউলী'তে এক নতুন কর্ম-চাঞ্চল্য। ললিতা তখন কাজের আনন্দে ডুবে আছে, অত্যন্ত ব্যস্ত সে।

তখন প্রায় বিকেল, রোদের তেজ অনেকটা কমে গেছে। ললিতা বাইরে থেকে ফিরে সবে এসে বসেছে বকুলতলার ঐ সিমেন্ট-বাঁধান জায়গাটায়। রোদের তাপে ওর মুখটা লাল হয়ে গেছে, ঘামে ব্লাউজের অনেকটা অংশ ভিজে গেছে। গালে-গলায় ঘামে আটকে আছে কয়েকগাছি চুল। গাছের নীচে চুপচাপ বসে জিরোচ্ছিল ললিতা। ঠাণ্ডা হাওয়ায় হয়তো একটু ঝিমোনিও এসেছিল। এমন সময় আমি গিয়ে হাজির হয়েছিলাম ওর সামনে। আমাকে দেখে দেহের ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে দাঁড়িয়ে উঠে অভ্যর্থনা করেছিল আমাকে। উচ্ছ্বসিত হয়ে

বলেছিল, 'আরে আসুন আসুন। খবর কি আপনার, ক'দিন যে একেবারে দেখাই নেই।'

—বিশেষ কিছু না, একটা কাজে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম।—বোলতে বোলতে বাঁধান-জায়গাটায় বসে পড়লাম আমি। গঙ্গার এক ঝলক হাওয়া এসে জুড়িয়ে দিল শরীরটা। ললিতাও বসল। একটু মুচকি হেসে বললে, 'তা-ও ভাল, আমি ভাবলাম আর কিছু।'

—আর কিছু মানে ?—ভুরু কুঁচকোলাম আমি।

—বলা তো যায় না, কাউকে কিছু না-বোলে আপনিও হয়তো নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন।

বেশ হালকা গলায় কথাটা বোলতে চেষ্টা করল ললিতা, কিন্তু গলার স্বর ওকে প্রতারণা করল। দেবজ্যোতির জন্য যে-উদ্বেগ ওর মনে চাপা ছিল, গলার স্বরে তা' প্রকাশ হয়ে পড়ল। স্বরটা একটু যেন বিকৃত শোনাল। আমি ওর কথার কোন উত্তর না দিয়ে হাসলাম একটু। খানিকটা ইতস্ততঃ করে পকেট থেকে চিঠিটা বের করে বললাম, 'দেবজ্যোতি একটা চিঠি দিয়েছে।'

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল ললিতা। আচমকা দেবজ্যোতির কথায় চমকে উঠেছিল। প্রথমটা কোনো উত্তরই দিতে পারল না। কেমন বিহ্বল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল একটুকাল। তারপর প্রশ্ন করল, 'কাকে দিয়েছে ?'

—দিয়েছে অবশ্য আমার নামেই। তবে লেখা আমার একার জন্যে নয়। পড়লেই বুঝতে পারবেন।

একটু ইতস্ততঃ করল ললিতা, তারপর আমার হাত থেকে নিয়ে পড়ে ফেলল চিঠিটা। একবার নয়, একটু একটু করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দু'বার পড়ল। তারপর ফিরিয়ে দিল আমার হাতে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। বুঝতে পারছিলাম চোখের জল গোপন করতে চেষ্টা করছে ও, সহজ হোতে চেষ্টা করছে। আমি কোনো কথা না বলে চুপ করেই বসে রইলাম। চোখ দুটো আলতো করে মুছে নিয়ে ললিতা একসময় চাইল আমার দিকে। ঈষৎ লাল একজোড়া চোখ। আস্তে আস্তে বললে, 'জানেন, ওকে প্রথম যেদিন দেখি সেদিনের কথাটা এই মুহূর্তে ভারি মনে পড়ছে। কেন কে জানে।' কতকটা আপন মনেই বলেছিল আবার, 'কোনো ছেলেকে অপরিচিত কোনো মেয়ের দিকে অমন সহজ সুন্দরভাবে চাইতে দেখিনি

কখনও। প্রথম দৃষ্টিতেই কেমন শ্রদ্ধা জেগেছিল। অন্য কিছু না, কেবল মনে হয়েছিল, বেশ ভদ্রলোক।'

আমি কোনো কিছু উত্তর দেবার আগেই আশ্রমের একদল কর্মী সেখানে এসে হাজির হয়েছিল। কর্মের আনন্দে চঞ্চল তারা। হৈ-হৈ করে ললিতার সামনে এসে বলল, 'আরে ললিতাদি তুমি এখানে? আর আমরা এদিকে তোমাকে সারা রাজ্য খুঁজে বেড়াচ্ছি। পাঁচ নম্বর শেডে শিগ্‌গির চলো কতগুলো জিনিষ বুঝিয়ে দেবে।'

নিজেকে গুছিয়ে নিতে কয়েকটা সেকেণ্ড লেগেছিল ললিতার, তারপরই একেবারে সহজ হয়ে গিয়েছিল সে। ওদের উচ্ছ্বাস ওকেও স্পর্শ করেছিল। ওদের সঙ্গে চলে যাবার আগে আমাকে একবার শুধু বলেছিল, 'কাজের মধ্যেই মানুষের বেঁচে থাকা, তাই না?'

এরপর দেবজ্যোতির আর কোনো চিঠি পাইনি আমি, নিজের আর কোনো খোঁজই দেয়নি সে। আমার চিঠির সঙ্গে ওর অফিসেও ছুটি চেয়ে লিখেছিল। তারপর সেখানেও আর কোন খবর দেয়নি। একটা দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়েই দিন কাটছিল আমাদের।

এদিকে দেখতে দেখতে কয়েকটা মাস কেটে গেল। এর মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে শিউলী আশ্রমের। আরও নতুন কাজ, নতুন প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে। ললিতা আরও নিবিড় করে ডুবে গেছে কাজের মধ্যে। শিউলী আশ্রমে ধীরে ধীরে ডবসন কাকার পরই ললিতার স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। সকলের 'ললিতাদি' একদিন সমস্ত কর্মীর প্রাণের কাছে স্থান করে নিয়েছে। সুদূর গ্রামের সব কেন্দ্র থেকে ললিতাদির নামে চিঠি আসে। একটা একটা করে নিজের হাতে সেসব চিঠির উত্তর দেয় ললিতা।

ইতিমধ্যে বহু গ্রামে নতুন মহিলা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। ললিতার উপস্থিতি মহিলা মহলে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছে। এর মধ্যে অবশ্য সুতপার অবদানও কম নয়। দুই বন্ধুতে সমস্ত কেন্দ্রে যেন জীবনের উৎসমুখ খুলে দিয়েছে। ওরা মেয়েদের কাছে গিয়ে গিয়ে বলে, 'সবাই এবার এগিয়ে আসুন, সংঘবদ্ধভাবে জেগে উঠুন সবাই। জীবনের প্রতিটি স্তরে মেয়েদের এবার ছড়িয়ে পড়তে হবে, কাজে নেমে পড়ুন সবাই। বসে থাকলে চলবে না। কেউ আমাদের স্থান করে দেবেনা, নিজেদের কাজ নিজেদেরই করে নিতে হবে। নিজেদের পাওনা নিজেদের বুঝে নিতে হবে।' সবার কাছে ঘুরে ঘুরে বলে, 'সমাজে মেয়েরা এতদিন পুরো মানুষ ছিল না, ছিল আধামানুষ, মেয়েমানুষ। আজ

তাদের পুরো মানুষের মূল্য চাই।'

মাঠে-ময়দানে গিয়ে মিটিং করেছে ললিতা, কত ঘরোয়া সভা করেছে। বলেছে, বাঁচতে গেলে সবাইকে সংঘবদ্ধ হোতে হবে, সংঘবদ্ধভাবে লড়াই করে বাঁচতে হবে। বার বার বলেছে, সমবায়ের মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে সব কিছু। চায়-আবাদ থেকে আরম্ভ করে সব কিছু সমবায়ের আওতায় আনতে হবে। লোককে বোঝাতে চেষ্টা করেছে, শিউলী আশ্রমের নীতি, তারা কি চায়, কি তাদের উদ্দেশ্য।

শিউলী আশ্রমে সাধারণ মানুষকে আহ্বান জানিয়েছে ললিতা। বলেছে, ইচ্ছে করলে সবাই শিউলী আশ্রমে এসে হাতের কাজ শিখতে পারে। এমনি ভাবে একটু করে সাধারণ মানুষের কাছে এগিয়ে গেছে ললিতারা। সাধারণ মানুষ তাদের স্বাগত জানিয়েছে, মন দিয়ে শুনেছে তাদের কথা। ললিতাদের এই অভিযানের কথা খবর হোয়ে স্থান পেয়েছে খবরের কাগজে। সে-খবর অনেকের সঙ্গে হয়তো শশাঙ্কশেখর চৌধুরীর চোখেও পড়ে থাকবে।

এত ক'রেও পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারল না ললিতা। মনে মনে এতদিন যা' চেয়েছিল এখনও যেন তা' হোয়ে উঠল না। ললিতা চেয়েছিল, একটা আদর্শ গ্রাম গড়ে তুলতে কিন্তু তা' হোয়ে উঠল না এখনও। ইচ্ছে ছিল, একটা গ্রামের সমস্ত চাষের জমি, সমস্ত শিল্প সমবায়ের আওতায় আসুক, সমস্ত গ্রামের মানুষ একসঙ্গে কাজ করুক, অর্থনৈতিক বৈষম্য ঘুচে অন্তত একটা গ্রামে সাম্য আসুক, সেই গ্রাম আদর্শ হোয়ে দেখা দিক আর সবার সামনে। কিন্তু আজও তা' হোল না। বাধা দিচ্ছে বেশী জমির মালিকরা। ডবসন কাকা বলেছেন, 'এতে হতাশ হ'বার কিছু নেই। ছোট মালিকদের নিয়েই আগে কাজ শুরু করো, তা'হলেই অনেকখানি হবে। আরও বলেছেন, 'এতদিনের একটা মানসিকতাকে ছেড়ে আসা কি এতই সহজ? সময় লাগবে বৈকি! তবে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।'

হতাশ হয়নি ললিতা, তবে মন ভরেনি ওর। এ-আন্দোলনকে আরও জোরদার করবার জন্য মনে মনে তৈরী হচ্ছিল সে। আরও লাইব্রেরী খুলতে হবে, শিক্ষার আরও প্রসার চাই, 'শিউলী'র আরও কর্মী চাই, চাই স্বেচ্ছা-সেবক। অনেকের স্বার্থে দু'একজন যদি বাধা দেয়, তবে প্রয়োজন হলে তার ওপর জোর প্রয়োগও করতে হবে, এমনি মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে সকলের। আরও বৃহত্তর অভিযানের জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয় ললিতা।

এমনি একটা কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যে আমি গিয়ে হাজির হয়েছিলাম শিউলীতে।

ডবসন কাকা এবং ললিতা তখন লাইব্রেরীতে। একটা আলোচনায় মশগুল ওরা। আমি যেতেই একটু হেসে ললিতা ওর পাশের চেয়ারটাতে বসতে বলল আমাকে। বসলাম। ডবসন কাকা আগের আলোচনার জের টেনে বললেন, 'তাড়াহুড়ো করোনা, উত্তেজনার কোনো অবকাশ নেই। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলো, slow, but steady। এখনও অনেক বাধা অতিক্রম করতে হবে। সংযম হারালে চলবে না। বলপ্রয়োগের ভাবনা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো—তেমন অবস্থা এখনও আমাদের আসেনি। সকলের মধ্যে যদি এমন মানসিকতা গড়ে ওঠে, তখন দেখা যাবে। পরের ভাবনা পরে।'

—এই মানসিকতা কি আপনা হোতেই গড়ে উঠবে? মানুষকে না বোঝালে মানুষ বুঝবে কি করে?—প্রশ্ন করে ললিতা।

—আগে মানুষ তার শত্রুকে চিনতে শিখুক, কে তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে তাকে দেখতে শিখুক আগে। তখন সে তার পথের কাঁটা দূরে ঠেলতে নিজেই এগিয়ে আসবে।

—শক্তি জোগাবে কে?

—জোয়ারের জলের শক্তি জোগায় কে? তার শক্তি থাকে তার নিজের মধ্যেই। আজ যদি কিছু করতে যাও সেটা হবে জোর করে আরোপ করা, স্বতঃস্ফূর্ত হবে না। তার ফল স্থায়ী হতে পারে না।

ললিতা চুপ করে রইল। মুখখানা তার থমথম করছে, যেন কিছুতেই মানতে পারছিল না সবটা। ডবসন কাকার কথাটা অমান্যও করতে পারছিল না সে। ওর মনের ভাবটা বুঝতে অসুবিধে হয়নি ডবসন কাকার। হেসে বলেছিলেন, 'আগামী কর্মী সভায় তুমি তোমার বক্তব্য পেশ করো, তাদের মধ্যে এ-নিয়ে একটা আলোচনা হওয়া ভালো। তোমার মনটাও অনেক হাল্কা হয়ে যাবে।'

ডবসন কাকা এতক্ষণে আমার দিকে ফিরে চেয়েছিলেন। একটু হেসে বলেছিলেন, 'তারপর তোমার খবর কি? ওদিককার আর কোনো সংবাদ পেলে?'

—নাঃ।

প্রায় রোজই এই একই প্রশ্নের উত্তরে একই কথা বলতে হয় আমাকে। এই পাঁচ মাস ধরে বলতে হচ্ছে। এক-এক সময় এই উত্তরটা দিতে ভারি বিশ্রী লাগে আমার, কিন্তু উপায় কি? ডবসন কাকা একটু গম্ভীর হোয়ে বললেন, 'মায়া-মমতা বোলে কিছু নেই ছেলেটার।' তারপর আমরা সবাই চুপ! একটা নৈঃশব্দ ঘিরে ধরে আমাদের সবাইকে।

ডবসন কাকা ধীরে ধীরে একসময় বললেন, 'ওর দোষ আমি ধরি না। অত সহজেই ওদের কারও দোষ ধরা আমাদের উচিত নয়। ভেবে ছাখো তো, ঐ ফুলের মত মানুষটির ওপর কি অমানুষিক অত্যাচারটাই না হয়েছে। শুধু ওই বা কেন, ওর মত আরও কতজনের ওপর হয়েছে। এ-অবস্থায় ওদের মধ্যে মাঝে মাঝে মানসিক বিভ্রান্তি আসাটা কি খুব অন্যায়? সমাজের ওপর, মানুষের ওপর ওরা আস্থা রাখবে কি করে? সামান্য কয়েকটা মানুষের খেয়াল খুশীতে অতগুলো লোকের ওপর কি অন্যায়টাই না আমরা করেছি। গোটা পূর্ব বাঙলার অতগুলো জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছি আমরা। বলতে চাও তার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই?'

কথা বলতে বলতে কেমন অন্যমনস্ক হোয়ে গিয়েছিলেন ডবসনকাকা। সময়ের উজান ঠেলে অনেকগুলো বছর পেছনে চলে গিয়েছিলেন তিনি।

দুই

শুভময়ের কথাটাই সেদিন বারবার মনে পড়ছিল আর্থারের। সেদিন সে কত বড় সত্য কথাটাই না উচ্চারণ করেছিল। বলেছিল, 'সুভাষকে একদিন বুঝতেই হবে, এ-পথে সে কিছুতেই এগোতে পারবে না!' শেষ পর্যন্ত তাই হোল, কংগ্রেস থেকে সরে আসতে হল তাঁকে।

সেটা উনিশশো উনচল্লিশ সাল। সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতির পদপ্রার্থী হোয়ে দাঁড়ালেন। কংগ্রেসের মধ্যে ডান-বামের লড়াই তখন চরমে উঠেছে। সুভাষচন্দ্রের এই ইচ্ছেকে সমর্থন করতে পারলেন না গান্ধীজি। তিনি প্রার্থী দিলেন ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়াকে। দেশ জুড়ে প্রচণ্ড আলোড়ন উঠল। সুভাষচন্দ্র অটল। নির্বাচন হোল, সীতারামিয়া হেরেও জিতলেন। গান্ধীজির অভিমানের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হোয়ে উঠল। পদত্যাগ করলেন সুভাষচন্দ্র। বাংলাদেশ একেবারে ফেটে পড়ল, উত্তাল হোয়ে উঠল বাংলার জনগণের বিক্ষোভ। কিন্তু কোনো ফল হোল না, কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা অটল। দক্ষিণপন্থীরা একচুলও সরলেন না তাঁদের নীতি থেকে। তাই সরতে হোল সুভাষচন্দ্রকে।

ইউরোপের আকাশে তখন যুদ্ধের ঘনঘটা। নাৎসী বাহিনী আক্রমণ করেছে পোল্যাণ্ড, বৃটেন যুদ্ধ ঘোষণা করেছে জার্মানীর বিরুদ্ধে। টেমসের দুই কূলে

তখন শঙ্কা, আর সন্দেহ জমাট বেঁধে উঠেছে। গঙ্গার কূলে দাঁড়িয়ে সুভাষচন্দ্রের সামনে তখন সেই সুযোগ। তিনি চাইলেন সংগ্রাম। বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কোনো আপোস নয়, চাই সংগ্রাম। সেই সংগ্রামে হিন্দু আর মুসলমানকে এক সাথে সামিল করতে চাইলেন তিনি। সেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের দিনে বাঙালী মাত্রই যেমন যোগ দিয়েছিল আন্দোলনে, হিন্দু না মুসলিম ভেবে দেখেনি কেউ, তেমনি মানসিকতা গড়ে তুলতে চাইলেন সকলের মধ্যে।

বিশ্ববন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছেটা তখন তাঁকে প্রচণ্ড বেগে নাড়া দিয়েছে। কবিগুরু সুভাষচন্দ্রের কাছে তাঁর দাবী জানিয়েছেন, প্রকাশ করেছেন তাঁর অন্তরের বাসনা। তিনি সুভাষচন্দ্রকে ডাক দিয়ে বললেন, 'আজ বাংলাদেশ দুর্বল। আমার ইচ্ছা কোনো যোগ্য লোককে বাংলা প্রদেশের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব দিয়ে নির্বিচারে তার চারিদিকে সমস্ত বাঙালীকে সম্মিলিত করা হয়। সেই মিলনে বল লাভ করে আর একবার বাংলা আপন শ্রেষ্ঠতা সপ্রমাণ করতে পারবে।' তিনি আরও বললেন, 'এর পরিচয় পেয়েছিলুম বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনে তখন বাংলা নিজের অভিপ্রায়কে যে রকম সম্পূর্ণ শক্তিতে প্রকাশ করেছিল ভারতবর্ষের ইতিহাসে তেমন আর কখনো ঘটেনি। সেই উপলব্ধিকে আর একবার জাগানো চাই, এবং এই প্রচেষ্টায় তোমাকেই আশ্রয় করব।'

সুভাষচন্দ্রের ওপর রবীন্দ্রনাথের অশেষ ভরসা। সুভাষকে ঘিরে তখন তাঁর মনে বাঙলার শুভদিনের স্বপ্ন। শুভময়ও একদিন ঠিক এমনি করেই স্বপ্ন দেখেছিল। সুভাষকে গ্যারিবল্ডির আসনে বসিয়ে ভাবি বাংলার স্বপ্ন দেখেছিল সে। কিন্তু শুভময়ের সে ইচ্ছে সেদিন পূর্ণ হয়নি, শূন্য হাতেই তাকে ফিরে আসতে হয়েছিল সুভাষের কাছ থেকে। সেদিন এ্যালবার্ট হলে দাঁড়িয়ে সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা শুনতে শুনতে শুভময়কেই বার বার মনে পড়ছিল আর্থারের। মনে পড়ছিল আর বুকটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠছিল।

উনিশশো চল্লিশ সালের ২৯শে জুন। কোনো একটা ঘটনাকে উপলক্ষ করে হিন্দু-মুসলমানকে এক করতে চাইছিলেন সুভাষ। পাওয়া গেল একটা উপলক্ষ। হলওয়েল মনুমেণ্ট। তিনি হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। কলকাতার এ্যালবার্ট হলে এক সভা হোল। বিরাট জনসভা। লোকে লোকে ঠাসাঠাসি, কোনোমতে একটা কোণ দখল করে দাঁড়াল আর্থার। সুভাষকে তার এই প্রথম দেখা—সেই সুভাষ, যার ওপর শুভময়ের ছিল পরম আস্থা, যাকে কেন্দ্র করে একটা নতুন যুগের সৃষ্টি

করতে চেয়েছিল সে, শেষ মুহূর্তে যার ওপরে ভয়ানক অভিমান হয়েছিল তার।—সেই সুভাষ। বক্তৃতা শুনতে শুনতে নিজেকে কেমন হারিয়ে ফেলছিল আর্থার। কী জ্বালাময়ী বক্তৃতা! কণ্ঠে কী আবেগ!

সেই দিন সেই অপরাহ্নে সুভাষচন্দ্র বাঙলা সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছিলেন, জাতীয় পরাধীনতার অন্যতম চিহ্ন হলওয়েল মনুমেণ্ট জনসাধারণের চোখের সামনে থেকে অবিলম্বে সরিয়ে নিতে হবে, আগামী তে-শরা জুলাই সিরাজদ্দৌলার স্মৃতি দিবস, সেই দিনের মধ্যেই যেন বাঙলা সরকার এই কাজটি সমাধা করেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল, তে-শরা জুলাই থেকে শুরু করবেন এক নতুন অভিযান, সাম্প্রদায়িকতার অন্ধকার ঘুচিয়ে ফেলে শুরু করবেন নতুন যাত্রা, নবতর আন্দোলন।

কিন্তু সুভাষচন্দ্রের সে-ইচ্ছে সফল হয়নি। তাঁর সে-ইচ্ছে যদি সফল হোত তাহলে ইতিহাসের রথের চাকা ঘুরত অন্যদিকে, কিন্তু ইতিহাসের রথচক্র যাতে ভিন্ন-পথে না চলে এতদিন এত যত্নে তো সেই চেষ্টাই চলছিল, সেই উনিশশো ছয় সাল থেকে উনিশশো চল্লিশ পর্যন্ত।—লর্ড মিণ্টোর দিন থেকে লিনলিথ গাও-এর দিন পর্যন্ত বৃটীশ সরকারের কণ্ঠে সেই একই সুর, সাম্প্রদায়িকতা জিইয়ে রাখার সেই হীন প্রচেষ্টা। আর বৃটীশ সরকারের সেই প্রচেষ্টার মূলেই কুঠারঘাত করতে চাইলেন সুভাষচন্দ্র। তাই তাঁকে কারাবরণ করতে হল, গ্রেপ্তার হলেন ২রা জুলাই। এর কিছুকাল পরেই তাঁর সেই ঐতিহাসিক অন্তর্ধান। দেশে থেকে নতুন ভাবে আন্দোলন করা তাঁর আর হলনা।

এদিকে দেশের হাওয়া আরও বিষিয়ে উঠেছে, জিন্নাসাহেব দাবী তুলেছেন পাকিস্তানের। অপরদিকে যুদ্ধের করাল ছায়াও ঘনিয়ে এসেছে এশিয়ার বুকে। এমন সময় ভারতে এলেন স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস, মহান সঙ্কল্প নিয়ে এলেন তিনি! উইনস্টন চার্চিলের ক্যাবিনেট সদস্য। চারিদিকে সাড়া পড়ে গেল, নেতারা ছুটোছুটি করলেন অনেক, অনেক শলা-পরামর্শ হোল, কিন্তু কোনো ফলই হলোনা। হিন্দু আর মুসলমানের সমস্যার কোনো সমাধান হোল না। রয়েই গেল পূব আর পশ্চিমের সওয়াল, দাড়ি আর টিকির কাজিয়া।

পৃথিবী জুড়ে চলেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াল তাণ্ডব। সেই যুদ্ধও একদিন শেষ হোল, জয়ী হোল মিত্র-শক্তি। গোটা ইউরোপ কিন্তু ততদিনে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। অবসন্ন পৃথিবী, দুর্বল বৃটীশ সরকার। ইংলণ্ডের তখন নতুন মন্ত্রী, এট্লী সাহেব। ভিন্ন চরিত্রের মানুষ এই নতুন প্রধানমন্ত্রী। তিনি

ভারতের সওয়াল শুনতে চাইলেন, এল ক্যাবিনেট মিশন। আবার আলোচনা, শলা-পরামর্শ। একদিকে মহম্মদ আলি জিন্না অপরদিকে মহাত্মা গান্ধী-জওহর লাল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হোলনা, সমস্ত আলোচনাই ব্যর্থ হোল। এতদিনে ভেতরে ভেতরে সকলেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে, এই টানা-পোড়েন আর সহ্য হয়না একটা কিছু হোয়ে যাক। মহম্মদ আলি জিন্না নামলেন প্রত্যক্ষ সংগ্রামে, পাকিস্তান তাঁর চাই-ই। শহরে গ্রামে শুরু হোল নারকীয় নৃত্য। লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষ ঘাতকের হাতে প্রাণ হারাল। বড় লাটের মসনদে লর্ড ওয়াভেল আসীন, আধোঘুমে তিনি চেয়ে দেখতে লাগলেন সেই নারকীয় দৃশ্য। একেবারে নির্বিকার তিনি।

লাট সাহেবের মসনদে সমাসীন একজন ইংরেজ যখন এমনি করে নির্বিকার থেকে গোটা ইংরেজ জাতির মুখে কালিমা লেপন করতে উদ্যত, অপর একজন সাধারণ ইংরেজ তখন মানবতার প্রতিনিধি হোয়ে ছুটে বেড়াচ্ছেন কলকাতার পথে পথে। ভালো-মন্দের এই ভারসাম্য বজায় থাকে বোলেই হয়তো মানুষ-জাতি পৃথিবীর বুকে আজও টিকে রয়েছে, নতুবা কবে তার অস্তিত্ব মুছে যেত পৃথিবীর বুক থেকে! হয়তো পৃথিবী থেকে এতদিনে মানুষ নামটাই মুছে যেত!

তারিখটা ছিল ষোলই আগষ্ট ১৯৪৬। হঠাৎ যেন কলকাতার বুকে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। প্রথম দিন এক তরফা, দ্বিতীয় দিন থেকে শুরু হোল হিন্দু-মুসলমানের মিলিত তাণ্ডব নৃত্য! মানুষ নামক পশু চরে বেড়াতে লাগল কলকাতার বুকে। কলকাতার সেই সব অন্ধকারময় দিনে আর্থার ডবসন ছুটে বেড়িয়েছেন শহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত। হিন্দু পাড়ায় যেমন গেছেন তেমনি গিয়েছেন মুসলমান পল্লীতে। কত মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী থেকেগেছেন সাহেব। একদিন একজন মুসলমানের বাড়িতে আগুন দেওয়া হোলে ছুটে যান আর্থার ডবসন, ছুটে গিয়ে আগুনের ভেতর থেকে কোলে করে নিয়ে আসেন বছর বারো বয়েসের একটি ছেলেকে। অর্দ্ধদগ্ধ ছেলেটি তখন মৃত্যু যন্ত্রনায় চিৎকার করছে। বাঁচবার জন্য তার চোখে কী করুণ আকুতি! সেই করুণ দৃশ্য আজও ভুলতে পারেননি ডবসন কাকা। ছেলেটির মা-বাবা সাহেবের হাত ধরে বারবার বলেছিল, 'সাহেব আমরা তো কোনো হিন্দুকে মারিনি, কোনোদিন কোনো হিন্দুর ক্ষতিও করিনি, তবে ওরা কেন আমাদের মকবুলকে এমন করে মেরে ফেলল? আমাদের কচি ছেলেটা কি করেছিল ওদের?'

ওদের কথার কোনো জবাব দিতে পারেননি সাহেব। এর কোনো জবাবই

জানা ছিল না তাঁর। আর একদিন আর একটি ঘটনা। আসলে ঐ একই ঘটনার আর একটা রূপ। ছেলেটির নাম শঙ্কর, বছর ষোলো বয়েস। তাড়াতাড়ি দোকান করে ফিরছিল সে, হাতে একটা নুনের ঠোঙা, কিছু আলু-পেঁয়াজ। কিন্তু বাড়ি ফেরা তার হোলনা, পথেই আক্রান্ত হোল, একটা বোমার টুকরো এসে লাগল তার মাথায়। 'মা-গো' বোলে একটা আর্তনাদ করেই পড়ে গেল ছেলেটি। চিৎকার শুনে দূর থেকে ছুটে এসেছিলেন ডবসন সাহেব। কোলে তুলে নিয়েছিলেন তাকে, কিন্তু বাঁচেনি সে। সাহেবের সমস্ত জামা-কাপড় রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল। সেদিন সেই ছেলেটির মা-ও একই ভাবে চিৎকার করে কেঁদেছিল, একই ভাবে আর্তনাদ করে বলেছিল, 'ওরে শঙ্কর কেন তোকে দোকানে পাঠিয়েছিলুম? আমি-ই তোকে মেরে ফেললুম রে।' সাহেবের হাত দুটি ধরে বলেছিল, 'সাহেব, ওদের তো আমরা কোনো ক্ষতি করিনি তবে··।'

দুটি শোকার্ত মায়ের বুক-ফাটা কান্না সেদিন একই ভাবে সমস্ত বাতাসকে মথিত করে তুলেছিল, একই ভাবে দুজন পিতা বিহ্বল নেত্রে চেয়েছিল সাহেবের মুখের দিকে! সাহেবের মুখে কোনো কথা সরেনি, কোনো সান্ত্বনার বাণী জোগায়নি সাহেবের মুখে। বারবার তিনি একটা কথা ভেবেই অবাক হয়েছিলেন, ধর্মান্ধ, বিভ্রান্ত মানুষ কত নিষ্ঠুরই না হোতে পারে! সেদিন তিনি সমস্ত মানুষের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন, সবাইকে বোঝাতে চেয়েছিলেন. 'ধর্মই মানুষের শেষ কথা নয়, মানুষই মানুষের শেষ কথা, সেই মানুষকে হত্যা করে কোনো শুভ কাজ হয়না।' বার বার বলতে চেয়েছিলেন, 'ধর্মের জিগির তুলে সুবিধেবাদী মানুষ তার সুবিধেটুকু আদায় করে নেয়। ধর্মের জিগিরে বিভ্রান্ত হওয়া আত্মঘাতী হওয়ার নামান্তর!'

কিন্তু সাহেবের কথায় কে কান দেবে! বাঙলা দেশ তখন নিজের মুণ্ডু কেটে নিজের রক্ত পানের নেশায় উন্মত্ত! ঘরে ঘরে চলেছে গুণ্ডাদের সমাদর, তারাই তখন হিন্দু-মুসলমান সমাজের ধারক। চলেছে গুণ্ডাদের অবাধ রাজত্ব। এদিকে ভাইসব-গভর্ণর প্রমুখ বড় বড় রাজপুরুষেরা গুণ্ডাদের এই বীভৎস খেলা দেখে মুখে ঈষৎ হাসি নিয়ে আনন্দ উপভোগ করছেন। মনুষ্যত্বের এতবড় অবমাননায় নিজের ওপরই কেমন ঘৃণা জন্মে গিয়েছিল ডবসন সাহেবের, নিজেকে নিজেই ক্ষমা করতে পারছিলেন না তিনি।

সেদিন সেই রাস্তায় সাইকেলের ধাক্কা খেয়ে দেবজ্যোতি যখন ডবসন সাহেবের হাতটা সজোরে কামড়ে ধরেছিল, তারপর হাতটা ছেড়ে দিয়ে তার দুর্ভাগ্যের জন্য বারবার সাহেবদের ওপর দোষারোপ করেছিল, সেদিনও ডবসন

সাহেবের সেই পুরোনো কথাগুলোই মনে পড়েছিল। মনে পড়েছিল, তাঁর স্বজাতির কীর্তি-কলাপের কথা! এতবড় একটা জাতির প্রতিনিধিদের এতবড় একটা অন্যায় কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি তিনি। ক্ষমা করতে পারেননি তাদেরও যারা ভারত বিভক্ত করতে দ্বিধা বোধ করেনি, যারা পরম আনন্দে বাঙলার বুক চিরতে সাহায্য করেছিল। ক্ষমা করতে পারেননি তাদেরও যারা একবারও ভাবেনি বাঙলার কথা, ভাবেনি বাঙালীর কথা যারা কেবল তড়িঘড়ি করে গদি আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল।

আর বাঙলা! হায় রে অভাগা দেশ! তার একদিকে সেই সাদা মানুষগুলোর কুটিল চক্রান্ত আর অন্যদিকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অবহেলা! এই দুই-এর মধ্যে পড়ে ক্ষত-বিক্ষত হোয়ে গেল এই দেশ, মিথ্যে হোয়ে গেল ক্ষুদিরাম-সূর্যসেনের মত দেশপ্রেমিকের আত্মত্যাগ। নজরুলের কথা সেদিন কেউ শুনতে পায়নি। ইতিহাসের সেই অন্ধকারময় যুগসন্ধিক্ষণে কেবল বাঙালীই পারতো বাঙলাকে বাঁচাতে অতীতের মিলিত হিন্দু-মুসলমানের সুদিনকে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু বাঙলার তখন বড়ই দুর্দিন, বলতে গেলে তার হালের কাছে তখন কোনো মাঝিই ছিল না, স্রোতের টানে লক্ষ্যহীনভাবে ভেসে চলেছিল তার তরীখানা। ভিন পাড়ার লোকের কারসাজিতে ধর্মের নেশায় বুঁদ হয়ে বাঙালী তার বাঙালীত্বকে হত্যা করল, মনুষ্যত্বের টুঁটি টিপে ধরে কুড়িয়ে নিল দুটি নাম,—হিন্দু আর মুসলমান; বাঙালী নয়, হিন্দু-মুসলীম।

কথা শেষ করে ললিতার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন ডবসন কাকা, 'ছাখো ললিতা, এই পরিণতির জন্য দোষী ও একা নয়, দোষী আমরা সকলে, দোষ আমাদের সকলের, দোষ আমাদের এই সমাজ-ব্যবস্থার। সেদিন যারা এই দেশটাকে দু'টুকরো করে দিয়েছিল দোষটা কি তাদেরও কম?'

ললিতা কোনো উত্তর করল না, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল একটুকাল। তারপর এক সময় ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়েছিল আবার, চোখ দুটো তখন ওর জলে ভরে এসেছে। আস্তে আস্তে বলল, 'সেদিন আমার অহঙ্কারই আমায় অন্ধ করে দিয়েছিল, সবার ওপর বড় হয়ে উঠেছিল আমার অভিমান। তাই সেদিন ওকে সহজভাবে বুঝতে চেষ্টা করিনি। অবহেলা দিয়ে আঘাত করেছিলাম।'

ললিতার চোখ থেকে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। ডবসনকাকা কিন্তু কোনো উত্তর করলেন না। বাইরের দিকে দূরে চেয়ে রইলেন। ললিতাও চুপ করে রইল। আমিও চুপ।

তিন

সেদিন আশ্রম থেকে বাড়ি ফিরবার পথে নানা কথা ভাবছিলাম, ভাবছিলাম দেবজ্যোতির কথা। আজ সে কোথায় কিভাবে আছে কে জানে! মনে মনে ভারি অস্বস্তি বোধ করছিলাম, একটা যন্ত্রণা বোধ করছিলাম বুকে। বাড়িতে ফিরেই কিন্তু চমকে উঠেছিলাম। সেদিনের ডাকেই দেবজ্যোতির একখানা চিঠি এসেছিল, লেটার-বক্সে এতক্ষণ সেটাই অপেক্ষা করছিল আমার জন্যে। এতদিন পর আবার ওর চিঠি! আব সেদিনই ঐ চিঠি! চিঠিটা পড়বার আর তর সইছিলনা আমার। কেমন আছে সে, কোথায় আছে, কি করছে,—এমনি নানান প্রশ্ন তখন আমার মনে ভিড় করেছে। ঘরে ঢুকেই তাড়াহুড়ো করে চিঠিটা পড়তে শুরু করছিলাম আমি। দীর্ঘ চিঠি।

চিঠিটার শুরু এই রকম—"সহজে যে-রত্ন আমাদের হাতের মুঠোয় এসে যায় আমরা তার সঠিক মূল্যায়ন করতে পারিনা। আর তা' পারিনা বোলেই জীবনে আসে বিড়ম্বনা। যেদিন কলকাতা ছেড়ে চলে আসি, সেদিন এই কথাটাই নতুন করে আবার ধরা পড়েছিল আমার কাছে।" ধীরে ধীরে পড়া শেষ করলাম চিঠিখানা। পর পর দু'বার পড়লাম। পড়া শেষ করে একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে চোখ বুজে বসে রইলাম অনেকক্ষণ। চিঠির কথাগুলো আমার মনে গভীর ছবি এঁকে দিয়েছিল।

সেদিন রাত্রে বাড়ি ফিরে ললিতার চিঠি হাতে পাওয়ার পরই কলকাতা থেকে অনির্দিষ্ট পথে যাত্রা করেছিল দেবজ্যোতি। সঙ্গে সামান্য কিছু টাকা আর হাতে একটা স্যুটকেস নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল সে। স্টেশনে গিয়ে পশ্চিমের একখানা টিকিট কিনে ট্রেনে উঠে পড়েছিল। কোথায় যাবে, কতদিন থাকবে কোনো কিছুই তখন ঠিক নেই। তখন তার কেবল একটি চিন্তা, যে করে হোক পালাতে হবে কলকাতা থেকে, সমস্ত চেনা-পরিচিতের চৌহদ্দি থেকে সরে পড়তে হবে। একটা উত্তেজনা তখন ওর মনটাকে অস্থির করে তুলেছে, সহজভাবে কোনো কিছু ভাববার শক্তি নেই। এতদিন মনে মনে সুখের যে-সৌধটি রচনা করেছিল হঠাৎ সেটা যেন গুঁড়িয়ে গিয়েছিল মাটির সঙ্গে। একটা ঝোড়ো হাওয়া তাকে যেন মুক্ত আকাশের নীচে একেবারে উলঙ্গ করে এনে ফেলেছিল। একটা ঘোর-লাগা মানুষের মত তখন

ওর অবস্থা। পাটনায় গিয়ে যখন উঠেছিল তখনও ওর মনের এমনি অবস্থা। এমনি চঞ্চল মন নিয়ে ঘুরতে ঘুরতেই পাটনায় একদিন বন্ধুর সঙ্গে দেখা। সেই ছেলেবেলার সাথী বন্ধু। একেবারে অপ্রত্যাশিত ব্যাপার।

ঘটনাটা ঘটেছিল এমনিভাবে। পাটনার পথে একা একা ঘুরছিল দেবজ্যোতি। আনমনা পথ চলতে চলতে একটা কথাই ভাবছিল সে, অদ্ভুত তার নিয়তি। তার চলার পথে সঙ্গী হোলনা কেউ! এই বিরাট পৃথিবীতে সে একা, একেবারে একা, নিঃসঙ্গ। সামনে যে দীর্ঘ পথ পড়ে রয়েছে, যে পথ তাকে কোনো ঠিকানায় পৌঁছে দেবে না, কেবল চলতে সাহায্য করবে, সেই পথে একা তাকে আরও কতদিন চলতে হবে কে জানে।

এ-পথ চলায় কোনো আনন্দ নেই, কোনো উৎসাহ নেই, কেবল আছে দেহটাকে বয়ে বেড়ানোর ক্লান্তি। এমনি এলোমেলো আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে পথ চলছিল দেবজ্যোতি। হঠাৎ বাধা পড়েছিল তার চিন্তায়। একটা বছর পাঁচেকের ফুটফুটে ছেলে এসে তার দুটো হাঁটু একেবারে জাপটে ধরেছিল। আচমকা একটা বাধা পেয়ে কেমন হকচকিয়ে থেমে গিয়েছিল দেবজ্যোতি। ছেলেটি মুখ তুলে দেবজ্যোতির দিকে চাইতেই অবাক হয়ে গিয়েছিল, ভয় পেয়ে কেঁদে ফেলবার উপক্রম।

দেবজ্যোতিও বুঝে ফেলেছিল ছেলেটি ভুল করেছে, তার আপনজন ভেবে ভুল করে ওকে জড়িয়ে ধরেছে। তাই দেবজ্যোতিও হাসি মুখে ঝুঁকে পড়েছিল ছেলেটিকে আদর করতে। সেই ভয়-পাওয়া শিশু ততক্ষণে তার মায়ের কাছে দৌড়। সেই শিশুকে দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করেই একেবারে চমকে উঠেছিল সে। তার মনের মধ্যে তখন হঠাৎ একটা প্রশ্ন হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল—কে!.. কে এই মেয়েটা!

শিশু পুত্রকে জড়িয়ে ধরে মেয়েটি তখন হাসছে, কৌতুকের হাসি। হাসতে গিয়ে গালে টোল পড়েছে, চোখ বুজে গেছে তার। দেবজ্যোতি অবাক হোয়ে তাকিয়েছিল সেই দিকে। চোখ খুলে ভদ্রলোকটির দিকে চাইতেই চোখাচোখি হোয়েছিল। চোখের ফাঁদ বড় হোয়ে গিয়েছিল মেয়েটিরও। ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠেছিল একটু। বিড় বিড় করে বলেছিল,—কে দেবুদা না! সে-কথা শুনতে পায়নি দেবজ্যোতি। সসঙ্কোচে মেয়েটির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। ধীরে ধীরে বলেছিল, 'মাপ করবেন, একটা প্রশ্ন। আপনারা কি কখনও বগুড়ায় ছিলেন?' প্রশ্নটা শুনে উচ্ছ্বসিত হোয়ে উঠেছিল মেয়েটি, আনন্দে নিজেকে

যেন আর ধরে রাখতে পারছিল না সে। দেবজ্যোতির একটা হাত প্রায় ধরে ফেলে বলেছিল, 'ছিলাম, দেবুদা, ছিলাম।'

—বম্নু তুই!

আর কোনো কথা জোগায়নি ওদের মুখে, আনন্দের আতিশয্যে মুহূর্তের জন্য কথা হারিয়ে গিয়েছিল, কেমন ভিজে ভিজে হোয়ে উঠেছিল ওদের চোখ। কত বছর পর আবার দেখা! মাঝে কত ঝড়জল বয়ে গেছে, কত পরিবর্তন হয়েছে পৃথিবীর। স্মৃতির অনেকগুলো পাতা উল্টে গিয়েছিল। মনের মধ্যে ভিড় করে এসেছিল অনেকগুলো মুখ, অনেক ছোট বড ঘটনা। দেবজ্যোতি আস্তে আস্তে বলেছিল, 'তোর সঙ্গে যে আবার দেখা হবে, এ কথা আমি কখনও ভাবতেও পারিনি।'

—তুমি পারোনি কিন্তু আমি পেরেছি। কতবার ভেবেছি, কোথাও না কোথাও তোমার সঙ্গে দেখা হোয়ে যাবে। আর ছাখো হোলও তাই। হোল না?

—তাইতো দেখছি। তারপর এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস?

—আর বোলোনা, খোকার বাবা ওদিককার মার্কেট থেকে কিছু ফল কিনতে গেছে, এখনও ফেরার নাম নেই।

এতক্ষণে খোকার দিকে আবার দৃষ্টি পড়েছিল দেবজ্যোতির। বারকয়েক তাকে কোলে নেবার চেষ্টা করেও সফল হোল না। বম্নু হাসতে হাসতে বলল 'তোমায় ওর বাবা বোলে ভুল করে যা লজ্জায় একবার পড়েছে, সে-লজ্জা আর সহজে ভাঙছে না।'

এমন সময় খোকার বাবা সেখানে এসে হাজির। দেবজ্যোতির মতই বয়েস, ওরই মত দোহারা চেহারা। পরনের প্যান্টের রঙটাও প্রায় ওর প্যান্টের রঙের মত। বম্নুর ছেলেটা যে খুব স্বাভাবিক কারণেই ভুল করে ফেলেছিল, এতক্ষণে কথাটা বুঝতে পারল দেবজ্যোতি।

বম্নুর মাধ্যমে পরিচয় হোল উভয়ের। ভদ্রলোক দিলদরিয়া মেজাজের। নাম শান্তনু মৈত্র। পশ্চিম দিনাজপুরের লোক। রায়গঞ্জে ব্যবসা, বেশ ভাল আয়। জমি-জায়গাও আছে অনেক, বলতে গেলে একজন জোতদার শ্রেণীর লোক। দেবজ্যোতির পরিচয় পেয়ে খুব খুশী। ব্যবসা সংক্রান্ত একটা কাজে এসেছিল পাটনায়, সেই সঙ্গে স্ত্রী-পুত্রকেও এনেছে, দিন-কয়েক সবাই মিলে বেড়িয়ে যাবে। স্ত্রীর দিকে চেয়ে একসময় বলল, "তখন তো কিছুতেই আসতে চাইছিলে না। না এলে কত বড় সুযোগ হাত থেকে ফসকে যেতো ভেবে দেখছো?'

—পতি পরমগুরু। সেই জন্যই তো পরমগুরুর কথা অমান্য করিনি। বুঝলে মশাই ?

হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছিল বন্ধু। ওরা দু'জনেই হেসে উঠেছিল সেই সঙ্গে।

ওরা ওদের এক চেনা লোকের বাড়িতে উঠেছিল। সেই বাড়ির দিকেই এবার পা বাড়াল সবাই। ছেলের হাত ধরে আগে আগে চলল শান্তনু। দেবজ্যোতি আর বন্ধু ওদের পেছনে। পথে যেতে যেতে এক সময় প্রশ্ন করল বন্ধু, 'তারপর দেবুদা তুমি এখানে কত দিন ?'

—দিন পনেরো হোল পাটনায় এসেছি, তবে আর কত দিন এখানে থাকব তার কিছুই ঠিক নেই।

—অন্য কোথাও যাবার প্রোগ্রাম আছে ?

—তারও কিছু ঠিক নেই। অন্য কোথাও যেতেও পারি আবার না-ও যেতে পারি।

এবার দেবজ্যোতির দিকে চোখ সূক্ষ্ম করে তাকিয়েছিল বন্ধু। একটুকাল তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তোমার ব্যাপার কি বলতো ?'

—ব্যাপার আবার কি দেখলি ?

একটু হেসে প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে চাইল দেবজ্যোতি।

—যা-ই বলো, তোমার এই ছাড়া-ছাড়া ভাব ভাল লাগছে না বাপু।

—দূর কি-যে বলিস্।

—যাকগে, তারপর মাসীমা কেমন আছেন বলো।

—সে-সব পাটতো কবে চুকে গেছে। বর্ধমান চলে আসবার দু'বছরের মধ্যেই মা মারা গেছেন।

খুব সহজভাবেই কথাগুলো বলল দেবজ্যোতি। বন্ধু কিন্তু মনে মনে বেশ একটা ধাক্কা খেল, একটুকাল কোনো উত্তর করতে পারলে না। নিঃশব্দে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় প্রশ্ন করল, 'বিয়ে-থা করোনি ?'

—হ্যাঁ তা-ও করেছি।

—সত্যি ? তা' বৌ কেমন হোল ?—উচ্ছ্বসিত হোয়ে উঠল বন্ধু।

—যা ব্বাবা, আমি তা' কি করে বলবো ?

—আহা বলা যায় না বুঝি ?

—কি বলা যায় ?—বেশ হাসি-হাসি মুখ দেবজ্যোতির।

—এই যেমন ধরো, বৌ কতদূর লেখা পড়া করেছে, বড় ঘরের মেয়ে কিনা, দেখতে কেমন, এই সব।

—সে-সব যদি বলিস তবে বলতে হবে আমি বাজিমাৎ করে দিয়েছি।

—কি রকম?

—লেখা পড়াই ধর, বৌ এম. এ-পাস। এদিকে কলকাতার নামকরা ধনী পরিবারের মেয়ে। আর দেখতে? খারাপ অন্ততঃ কেউ বলতে পারবে না।

—বাব্বা এত পেয়েও তুমি এমন উদাসীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছ, এমন ছাড়া-ছাড়া ভাব তোমার?

হেসে ফেলল দেবজ্যোতি। হেসে বলেল, 'তুই পাকা সংসারী হয়েছিস বন্ধু। ব্যবসাদারের বৌ-তো কড়ায় গণ্ডায় হিসেব মেলাতে চাস। কিন্তু সব হিসেব কি মেলে?'

—যতক্ষণ না মেলে ততক্ষণ চেষ্টা করতে হবে, দেখতে হবে কোথায় ফাঁক রয়েছে। তাছাড়া এটাও ঠিক নয়, সংসার করবো অথচ সংসারী হবো না। তা'তে তুমি আমায় ঠাট্টাই করো আর যা-ই করো।

—আসলে কি জানিস সংসারের চৌহদ্দিটা সকলের কাছে সমান নয়। কেউ সংসার বলতে বোঝে, স্বামী-স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে। কারও সংসার আর একটু বড়, স্বামী-স্ত্রী-ছেলে-মেয়ের সাথে অন্যান্য আত্মীয় পরিজন যুক্ত হয়। আবার কেউ সংসার বলতে বোঝে, গোটা দেশের মানুষকে, সমস্ত মনুষ্য সমাজকে। যার বোধ যত ব্যাপক তার সংসারের পরিধিও তত বড়।

—তা' তোমার সংসারের পরিমাপটা কতখানি শুনি, বিশ্বজোড়া নিশ্চয়? আর বৌদির সংসার বুঝি ঘর আর বর নিয়ে? তুমি যাও ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে বৌদির সেটা পছন্দ নয় এই তো?

—তোর সেই ছেলেবেলার স্বভাবটা কিন্তু মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। আমার ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপাতে পারলেই তুই যেন খুশি। কিন্তু সমস্ত দোষ এক-জনের ঘাড়ে চাপালেই কি হয়?

কথাটা শেষ করেই কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল দেবজ্যোতি। ওর এই অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করেছিল বন্ধু। খুব আস্তে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'সত্যি বলোতো দেবুদা, তোমার কি হয়েছে?'

একটুকাল চুপ করে থেকে বললে দেবজ্যোতি, 'বাড়ি চল তোকে সব বলবো। মনে মনে এমন একজনকে খুঁজছিলাম যাকে সব বলা যায়, তোকে পেয়ে বেঁচে গেলাম আমি। তুই হয়তো আমার কথা বুঝবি।'

দেবজ্যোতি একটু একটু করে তার জীবনের সমস্ত ঘটনা বন্ধুর সামনে তুলে

ধরেছিল। বন্থু অদম্য কৌতূহল নিয়ে শুনেছিল দেবজ্যোতির জীবনের সেই সব ঘটনা। ওর দুঃখের দিনগুলোর কথা শুনতে শুনতে বন্থুর চোখ জলে ভিজে গিয়েছিল। ললিতার কথা শেষ হলে বন্থু বলেছিল, 'সত্যি দেবুদা, তোমার কথা শুনে ভারি অবাক লাগছে। এমন মেয়েও যে হোতে পারে এতো আমি ভাবতেই পারছিনা। এমন দেবীর মত মেয়েকে তুমি কোন প্রাণে ছেড়ে এলে?'

—ছেড়ে তো আসিনি, সে-ই ছেড়ে গেছে।

—তুমি কেন তার কাছে ছুটে গেলেনা?

— কোন মুখে যাব বল্? আমি জানি, গেলে কোনো লাভও হোতনা।

—সত্যি দেবুদা, তোমরা ছেলেরা মেয়েদের একেবারে বোঝোনা।

আমি বলছি, তুমি বৌদির কাছে ফিরে যাও।

—না-রে তা' হয়না, এখন ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়।

—তাহলে এখন কি করবে?

– তাইতো ভাবছি।

খানিকটা সময় চুপ করে ভাবল বন্থু তারপর বললে, 'তুমি তাহোলে এক কাজ করো, আমাদের সঙ্গে রায়গঞ্জ চলো। ওখানে গিয়ে গ্রামের কাজে যদি ডুবে থাকতে পারো তাহলে সময়টাও ভাল কাটবে, মনটাও হাল্কা হবে।'

একটুকাল ভাবল দেবজ্যোতি, তারপর বললে, 'কথাটা মন্দ বলিসনি। মনে হচ্ছে, ভালই লাগবে। ঠিক আছে, মৈত্রমশায়ের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করা যাবে।'

—সে ভাবনা তোমার নয়, সে-ভাবনা আমার।

দেবজ্যোতি হাসল।

কয়েকদিন পরই ওরা চলে গিয়েছিল পশ্চিম দিনাজপুর। আর সেখানে গিয়েই দেবজ্যোতি পেয়েছিল তার নতুন কর্মের জগৎ, সেই সঙ্গে ফিরে পেয়েছিল মনের প্রশান্তি। যে-গ্রামে বন্থুদের জমি-জায়গা তাকে কেন্দ্র করে দেবজ্যোতি তার কর্মস্থল গড়ে তুলল। শান্তনু মৈত্র তার বাবা-দাদার কথা অমান্য করেও এগিয়ে এলো দেবজ্যোতির পাশে। সরকারের সাহায্যও মিলল। গ্রামের বেশীর ভাগ লোকের জমি এক করে শুরু হোল বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ। সেচের সুবিধের জন্য যৌথ প্রচেষ্টায় এলো গভীর নলকূপ। জমিতে দু'বার থেকে তিনবার ফসলের ব্যবস্থা হোল। বহুগুণ ফলন বাড়ল। গ্রামের লোকের মুখে হাসি ফুটল। গ্রামের সকলের সহযোগিতায় গড়ে উঠল কয়েকটি কুটীর শিল্প। গ্রামের সমস্ত যুবশক্তিকে একত্র করল দেবজ্যোতি, গড়ে তুলল শিউলীর মত

একটি আশ্রম।—একটা লাইব্রেরী স্থাপিত হোল। গ্রামের সর্বাঙ্গীন উন্নতির কাজে নিয়োজিত হল আশ্রমের সমস্ত শক্তি। বাধা যে আসেনি তা' নয়, কিন্তু দেবজ্যোতি তার সর্বশক্তি দিয়ে সে-বাধা অতিক্রম করেছে।

এদিকে ক্রমাগত অমানুষিক পরিশ্রমে আর অনিয়মে দেহ ক্রমশ ক্লান্ত হোয়ে পড়ল দেবজ্যোতির। ধীরে ধীরে সত্যিই একদিন অসুস্থ হোয়ে পড়ল সে। তবু মুখে তার হাসি আনন্দের যেন শেষ নেই। বন্ধু বার বার দেবজ্যোতিকে বলেছে, 'দেবুদা এবার ফিরে যাও, বৌদির ওপর এতখানি প্রতিশোধ নিওনা।' দেবজ্যোতি সে-কথার উত্তর দেয়নি, একটু হেসেছে। মনে মনে ভেবেছে, এখনও তার যাবার লগ্ন আসেনি, যাবার লগ্ন যেদিন আসবে সেদিন কাউকে বলতে হবে না, সেদিন সে নিজেই যাবে। অসুস্থ শরীরে সেই পরম লগ্নের জন্যই অপেক্ষা করছে দেবজ্যোতি।

চার

চিঠি-খানা পড়া শেষ করে সামনের দিকে মুখ ফিরিয়েছিল ললিতা। গাছ-গাছালির ভেতর দিয়ে গঙ্গার ওপারে অনেক দূরে ললিতা ওর উদাস দৃষ্টি মেলে দিয়েছিল। কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ ছিলনা ওর। খোলা চুলগুলো হাওয়ায় উড়ছে, আঁচলের আধখানা কাঁধ থেকে খসে পড়ে মাটিতে লুটোচ্ছে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে, বুকটা উঠছে আর নামছে।

স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, ওর বুকে উঠেছে প্রচণ্ড ঝড়, সুতীব্র অনুতাপের জ্বালায় চঞ্চল সে। নিশ্চল ভাবে অনেকক্ষণ বসে রইল ললিতা, তারপর এক সময় দূরে চেয়েই বলল, 'আমি যাব। আমাকে যেতেই হবে।'

ওর কথা শুনে মনে হচ্ছিল, ও যেন অনেক দূর থেকে বলছে কথাগুলো। ও যেন এ-জগতের মানুষই নয়, অন্য কোথাও ওর অবস্থান। ললিতাকে এ-ভাবে দেখিনি কখনও, ললিতার এ-পরিচয় আমার কাছে একেবারে নতুন। ললিতার মনের জোর দেখেছি, দেখেছি তার আত্মবিশ্বাস। যাকে সে সত্য বলে জেনেছে তার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে সে প্রস্তুত, এ-পরিচয় তার পেয়েছি। তাই ধীরে ধীরে সে যখন শিউলীর নেত্রীর আসনের দিকে এগিয়ে চলেছিল, তখন আমি অবাক হইনি, তখন মনে হয়েছে, ওর মত মনের দৃঢ়তা যার আছে নেত্রীপদ তাকেই মানায়, কিন্তু সেদিন দেবজ্যোতির চিঠিখানা পড়ার পর ওর যেন আর এক রূপ দেখতে পেয়েছিলাম।

বাস্তবের সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাতের ঊর্ধ্বে, কর্মচাঞ্চল্যের ওপারে সমস্ত মানুষের মনের মধ্যে ভালবাসায় ঘেরা ছায়া-সুনিবিড় যে-এক সুনির্দ্দিষ্ট গণ্ডী আছে, আছে একান্ত গোপন একটা সত্তা, যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষ নিজেই সব সময় সচেতন নয়, এক-এক সময় বিশেষ কোনো ঘটনায় হঠাৎ তা' প্রকাশ হোয়ে পড়ে, তখন নিজেকে আর কোনো মতেই প্রচ্ছন্ন রাখা যায় না। সেদিন ললিতারও মনে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে নিজেকে সে আর আড়াল করে রাখতে পারেনি। তখন সেই মুহূর্তে ওর মনের আকাশে অন্য কিছুই ছিলনা, আদর্শের কথা নয়, শিউলীর আসন্ন কর্মসূচীর কথা নয়, জীবন যুদ্ধে হারজিতের কথাও নয়। ওর মনের সমস্ত আকাশ জুড়ে ছিল একটিই নাম, সে দেবজ্যোতি। ওর মনের তন্ত্রীতে একটা সুরই ধ্বনিত হয়েছিল,—আমি যাব, আমাকে যেতেই হবে।

অনেকক্ষণ পর আমার মুখের দিকে এক সময় ফিরে তাকিয়েছিল ললিতা। একটু একটু করে নিজেকে গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিল। ধীরে ধীরে বলেছিল, 'আমি জানি ও অভিমান করে আসছে না। তাই ভাবছি, আমি নিজে গিয়েই ওকে ফিরিয়ে আনবো।'

তখন ওর মনের যা অবস্থা তাতে কোনো কিছু বলা ঠিক হবে কিনা তাই ভাবছিলাম। আমি জানতাম, এই মুহূর্তে ললিতার পক্ষে কোথাও যাওয়া অসম্ভব। শিউলীর উৎসবের আর মাত্র ক'টা দিন বাকি।

কোনো উত্তর না দিয়ে আমি চুপ করেই রইলাম। ললিতা নিজেই আবার বললে, 'কিন্তু ক'টা দিন পরেই যে উৎসব।'

—আমিও তো সেই কথাটাই ভাবছি।—বললাম আমি।

একটু থেমে বললাম, 'তার চেয়ে এক কাজ করলে হয় না?'

—কি?—ললিতার গলার স্বরে কেমন অসহায় ভাব।

—উৎসব শেষ করেই চলুন। আমিও যাব আপনার সঙ্গে। এবারকার উৎসবের তো একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে, আশা করা যাচ্ছে সাধারণ মানুষের ভিড় খুব একটা কম হবে না। এ-অবস্থায় আপনি না থাকলে চলবে না।

—সেই বোধহয় ভাল হবে।

ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে গেল ললিতা, আর কোনো কথা বললে না।

বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কর্মী-সমাবেশ ঘটেছিল ইতিমধ্যেই। ছোট ছোট তাঁবু পড়েছিল এখানে সেখানে। সামনের বিরাট চত্বরটা ঢাকা হয়েছিল বড় বড়

ত্রিপলে। একটা বড় মঞ্চও তৈরী হচ্ছে। চারিদিকে দারুণ ব্যস্ততা। ললিতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এই ব্যস্ততার মধ্যে দিয়েই ফিরে চলেছিলাম আমি। অন্যমনস্কভাকেই হাঁটছিলাম পথ, দেবজ্যোতির ভাবনা ছিল মাথায়। আশ্রমের গেটটা পেরোতে গিয়ে আচমকা একটা গাড়ির হর্ণে প্রায় চমকেই উঠেছিলাম। সামনে চেয়ে দেখি একটা ভ্যান এসে ঢুকছে আশ্রমের ভেতর। ড্রাইভারের সীটে স্থতপা, এক হাতে তার স্টিয়ারিং হুইল অন্য হাত দিয়ে ইসারায় আমায় ডাকছে। আমি কাছে যেতেই কোনো কথা না বোলে গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে যেতে ইঙ্গিত করলে। একটু ইতস্ততঃ করেও উঠে পডলাম আমি। স্থতপা বাঁয়ে গাডি ঘুরিয়ে সোজা গিয়ে দাঁড়াল কারখানার শেডগুলোর কাছে।

গাড়ি থামিয়ে এবার হেসে জিজ্ঞাসা করলে, 'ব্যাপার কি? এত অন্যমনস্ক-ভাবে চলেছিলেন কোথায়?'

—কোথায় আর, নিজের বাডির দিকে।

—তা' কি এত ভাবছিলেন বাহ্যজ্ঞান প্রায় লোপ?

— কি ভাবছিলাম তা' কি আমিই ঠিক জানি।

—বাঃ চমৎকার! যাক এবার তাহলে নামুন, জিনিসপত্তর-গুলো সব নামাতে হবে।

কথাটা শেষ করেই এগিয়ে গিয়ে ত্নটো প্যাকেট নিজের কাঁধের উপর তুলে নিয়ে বললে, 'ইচ্ছে করলে আপনিও নিতে পারেন. বেশী ভারি নয়।' প্যাকেট কাঁধে নিয়ে স্থতপা ছুটল শেডের ভেতর। আমিও ত্নটো প্যাকেট নিয়ে অনুসরণ করলাম ওকে।

প্যাকেটগুলো নামান হল সব। কাজ শেষ করে ওড়নাটা দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বললে স্থতপা, 'আপনার একটু দেরী করিয়ে দিলাম। চলুন এবার আপনাকে খানিকটা পথ পৌছে দি।'

— না না···এইমাত্র এতটা পথ এলেন··· ।

—আপনি তো বড় বে-রসিক লোক মশাই। এমন একটা অফার পেলে লোকে কোথায় লুফে নেয় তা' নয়···চলুন চলুন।

আবার স্টিয়ারিং-এর সামনে গিয়ে বসল স্থতপা, আমিও বসলাম ওর পাশে।

গাড়িটা পাকা রাস্তায় পড়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। সামনের দিকে চোখ রেখেই চালাচ্ছিল স্থতপা, আমার দিকে তাকায়নি একবারও। ধীরে ধীরে কেমন গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল সে। আমি চেয়েছিলাম ওর দিকে, বেশ লাগছিল ওকে।— ত্ন'হাতে ধরা স্টিয়ারিং হুইল, দুরন্ত হাওয়ায় চুল উড়ছে, বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে

ঘাড়ে-কপালে, ঢল ঢল মুখে কেমন এক গাম্ভীর্য। বেশ লাগছিল ওকে। এক সময় জিজ্ঞাসা করেছিলাম আমি, 'আশ্রম এখন কেমন লাগছে?' সুতপা সে-কথার উত্তর না দিয়ে কেবল একটু হেসেছিল, তারপর বল্লে, 'গাড়ি চালিয়ে আসবার সময় পথে আপনার কথাই মনে পড়ছিল। আর ঠিক আশ্রমে ঢুকবার মুখেই আপনার সঙ্গে দেখা।'

—আমার কথা ভাবছিলেন? কেন বলুন তো?

—তা' ঠিক বলতে পারব না। হয়তো' অকারণেই ভ.বছিলাম।

আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে আবার ফিরিয়ে নিলে মুখ। খানিকটা সময় চুপ করে বেশ গম্ভীর ভাবেই বল্লে সুতপা, 'সব সময় আপনার এমন উদাসীন ভাব কেন বলুন তো?'

—উদাসীন ভাব আবার কোথায় দেখলেন?

—তা' নয়তো কি? সব কিছু থেকেই নিজেকে কেমন যেন দূরে সরিয়ে রাখতে চান।

—আমার কিন্তু উল্টোটাই মনে হয়—মনে হয়, সব কিছুতেই আমি থাকি।

—থাকেন কিন্তু গায়ে মাখেন না কিছু।

—তা' হবে। —ঠোঁট ওল্টালাম আমি।

—কিন্তু কেন? —আমার দিকে ঘাড় ঘোরাল ও।

—হয়তো এটা আমার চরিত্রের একটা দিক।

আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল সুতপা। সামনের দিকে চোখ রেখেই এক সময় বল্লে, 'আপনার কয়েকখানা পুরনো লেখা পড়লাম শিউলীর পত্রিকায়। বর্তমানের লেখা একটাও পাইনি,—আমায় দেবেন তো!'

—দেবো।

আবার একটুকাল চুপচাপ, খানিকটা সময় কেটে গেল নিঃশব্দেই। এক সময় আমার দিকে কেমন অদ্ভুত ভাবে চাইল সুতপা, ধীরে ধীরে বল্লে, 'একটা কথা বলবো?'

—বলুন।

—আপনাকে পুরোপুরি আমার চাই।

—তার মানে? —কেমন কেন চমকে উঠলাম আমি।

—মেয়েদের নিয়ে শুধু লিখলেই হবে না, মেয়েদের হয়ে কাজও করতে হবে, —হাতে কলমে কাজ।

ওর উত্তরে যদিও একটু ধাতস্থ হলাম, তবু একটা 'কিন্তু' উঁকি মেরেছিল

মনের কোণে। মুখ দিয়ে বেরিয়েও গিয়েছিল সেটা, একটু ইতস্তত: করে বল্লাম, 'কিন্তু—।'

—কোনো কিন্তু নয়। আপনাকে আমার পুরোপুরি চাই—এ আমার দাবী।

কোনো উত্তর করতে পারিনি আমি, ওর কথায় কেমন যেন ঘোর লেগেছিল, আপত্তির কোনো ভাষা পাইনি খুঁজে।

পথে আর কোনো কথা হয়নি। গাড়ি থেকে নামবার সময় আমার একটা হাত ওর দুটো হাতের মধ্যে নিয়ে বললে, 'আমি জানি আমার পথ আর আপনার পথের মধ্যে খুব বেশী তফাৎ নেই। আর এ-ও জানি, আপনাকে আমি আমার কাজের মধ্যে পাবই।' কথা ক'টা শেষ করে আমার দিকে চেয়ে রইল একটুকাল। তারপর বেশীক্ষণ আর অপেক্ষা করেনি, এক লাফে গিয়ে বসেছিল স্টিয়ারিংএর সামনে। গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে আমার দিকে হাত নাড়তে নাড়তে এগিয়ে গিয়েছিল। যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ চেয়েছিলাম গাড়িটার দিকে। আমার যেন সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল। ললিতা-দেবজ্যোতি-সুতপা সবাই একসঙ্গে আমার মনে একটা ঘূর্ণি ঝড়ের সৃষ্টি করেছিল, বিশেষ করে ভাবতে পারছিলাম না কিছুই।

প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সাতদিন-ব্যাপী উৎসবের সেটা ছিল সপ্তম দিন। কাগজে-পত্রিকায় প্রচারে ফল হয়েছিল। বাইরে থেকে প্রচুর সাধারণ মানুষ এসে উপস্থিত হয়েছিল সংগঠনের কর্মধারা সম্বন্ধে জানবার কৌতূহল নিয়ে। মানুষে মানুষে ছেয়ে গিয়েছিল চারিদিক—পুরুষ এবং মহিলা উভয়েরই সমাবেশ ঘটেছিল। গঙ্গার ধারে লাইব্রেরীর পাশে একফালি অংশ ছাড়া কোথাও এতটুকু ফাঁকা ছিল না। আমি গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম সেই জনসমুদ্র। মঞ্চে তখন ললিতা মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে শিউলীর পক্ষ থেকে বক্তব্য পেশ করছিল। ওর বক্তব্য শুনতে শুনতে আমার প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, ওর গলার স্বরে এমন একটা কিছু আছে যা মানুষকে কাছে টানে, যা' মানুষের মধ্যে শোনার আগ্রহকে জাগিয়ে তোলে। ওর কথায় যেমন আছে যুক্তির জাল তেমনি আছে সুরের ঝঙ্কার। ওর কথা শুনতে শুনতে কেমন যেন তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম।

ললিতা তখন বলে চলেছিল, 'মানুষ বাঁচতে চায়, কারণ এটাই জীবনের ধর্ম। কিন্তু তবু মাঝে মাঝে ঘটে এই নিয়মের ব্যতিক্রম। এমন এক-একজন মানুষকে দেখা যায় যারা নিজের এই বাঁচার তাগিদকে তুচ্ছ করতে পারে, তুচ্ছ করতে পারে নিজের সাময়িক সুখ-ভোগকে। তারা জীবনের এই স্বাভাবিক ধর্মকে

জয় করতে পারে, কারণ একটা আদর্শের মধ্যে তারা জীবনের অর্থ খুঁজে পায়। সেদিন স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে বিপ্লবী শুভময়ের মত মানুষরাও একটা আদর্শের মধ্যে জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁরা এক নতুন ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁদের চেতনায় ফুটে উঠেছিল, সুখ-সমৃদ্ধিতে পূর্ণ এক স্বপ্নময় ভারতের ছবি, এমন এক ভারত যেখানে একজন মানুষ আর একজন মানুষের রক্ত শোষণ করে না, এমন এক ভারত যেখানে সমাজে বৃহৎ অংশের অস্থি দিয়ে গড়ে ওঠে না মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সুখের প্রাসাদ।

সেই মৃত্যুঞ্জয়ীরা চেয়েছিলেন, বিদেশীর হাতের শোষণ যন্ত্রকে বিকল করে দিতে, তারা শোষণ যন্ত্রের হাত-বদল চাননি, বিদেশী শোষকের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে মুষ্টিমেয় স্বদেশীর হাতে সেটা তুলে দিতে চাননি। তা' যদি তাঁরা চাইতেন তবে জীবনকে তাঁরা এমন করে তুচ্ছ করতে পারতেন না, ভোগের লালসা তাঁদেরও ঘিরে ধরতো। কিন্তু আজ আমরা কি দেখছি? দেখছি সেই মহাপ্রাণদের স্বপ্ন সত্যে রূপ নেয়নি, তাঁরা তাঁদের বুকের রক্ত দিয়ে যে আদর্শকে সঞ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন তা সফল হয়নি। রূপ বদলেছে, কিন্তু শোষণ সমানেই চলেছে।'

ললিতার কথাগুলো শুনতে শুনতে হয়তো একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। হয়তো স্বাধীনতা-আন্দোলনের যুগেই চলে গিয়েছিল মনটা, হয়তো শুভময়ের কথাই ভাবছিলাম, কিম্বা শিউলীর কথা। কেমন আনমনা হয়ে পড়েছিলাম আমি। আর ঠিক সেই সময়েই ক্ষীণ একটা ডাক শুনে মুখ তুলে চাইতেই চমকে উঠেছিলাম। আনন্দ-বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। চেয়ে দেখলাম, সামনে দাঁড়িয়ে দেবজ্যোতি! শরীর অনেক রোগা, মাথার চুল রুক্ষ, মলিন জামা-কাপড়, তবু কেমন যেন উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল ওকে। চোখ জোড়া যেন প্রকাশ করছিল একটা শক্তির উৎসকে। আমার সেই বিহ্বল ভাবটা কেটে যেতেই জড়িয়ে ধরেছিলাম ওকে, বলেছিলাম, 'জ্যোতি তুই!'

দেবজ্যোতির মুখে মিষ্টি একটুকরো হাসি। আস্তে আস্তে বললে, 'ট্রেন থেকে সোজা তোর বাড়ি গিয়েছিলাম। জিনিষপত্র ওখানে রেখে এই আসছি। আজ না এসে আমার উপায় ছিল না, ভেতর থেকে কে যেন আমাকে বার বার ঠেলছিল।' আমার একটা হাত ওর হাতের মধ্যে নিয়ে কথা বলছিল দেবজ্যোতি।

—চল ভেতরে চল।

—হ্যাঁ, চল।

ভেতরে একটা পা দিয়েই কেমন একটু থমকে দাঁড়াল। আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে, 'এ কি এত লোক! এ যে আমি ভাবতেই পারিনি।' আমার দৃষ্টি তখন মঞ্চের দিকে। সভাপতির আসনে বসেছিলেন আর্থার ডবসন। বাইরে থেকে আগত নেতৃস্থানীয়দের অনেকে মঞ্চের ওপরে, আর মাইকের সামনে ললিতা। আমি ওর কানের কাছে মুখ এনে বললাম, 'চল গঙ্গার ফাঁকা জায়গাটায় গিয়ে বসি। গাড়ির ধকলের পর গঙ্গার হাওয়া ভাল লাগবে।' দেবজ্যোতি কিন্তু তন্ময় হোয়ে দেখছিল ললিতাকে, দেখে দেখে যেন আশ মিটছিল না। ললিতাকে যেন এই প্রথম দেখছে সে। তাই আমার কথাটায় হঠাৎ যেন হোঁচট খেয়েছিল, আমার কথাটা যেন ঠিক বুঝতেই পারেনি। আমি একটু হেসে বললাম, 'ভয় নেই গঙ্গার ধারে বসেও ওর বক্তৃতা শোনা যাবে।' আমার কথায় লজ্জা পেল দেবজ্যোতি, লাজুক হেসে বললে, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ তাই চল।'

মুক্ত আকাশে তখন চাঁদের হাট, আর গঙ্গার ধারটায় আলো-আঁধারির খেলা। হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, বাতাসে ফুলের একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। সব মিলিয়ে মন-মাতানো এক পরিবেশ। দেবজ্যোতি একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বসে পড়ল ঘাসের ওপর, সেই সঙ্গে আমিও। যেখানে বসেই ললিতার বক্তৃতা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম আমরা।

ললিতা তখন বলে চলেছিল, 'আমাদের শক্তির বীজ রয়েছে আমাদের চেতনার মধ্যে, আমাদের ঐক্যের মধ্যে। ঐক্যবদ্ধ না হলে আমরা কিছুই করতে পারব না। ঐক্যবদ্ধ হয়ে যদি আমরা রুখে দাঁড়াই তাহলে সমস্ত শোষণ যন্ত্রকে আমরা বিকল করে দিতে পারব, সে-শোষণ যন্ত্র যত শক্তিশালীই হোক না কেন। স্বাধীনতা-যুদ্ধে যে-সব সৈনিক আত্মবলিদান করেছেন তাঁদের স্বপ্ন আমাদের সফল করতেই হবে, তাঁদের আত্মত্যাগ যেন বিফল না হয়ে যায়। তাঁদের সে স্বপ্ন সফল কার উদ্দেশ্যে নিয়েই আজ আমরা আপনাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের চলার পথে আপনাদের আমরা সাথী হিসেবে পাব। নতুন সমাজ গঠন করতে গিয়ে আমাদের যে লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে হবে তাতে আপনাদের আমরা যে সহ যোদ্ধা হিসেবে পাব সে-বিশ্বাসও আমাদের আছে।'

হাততালির মধ্যে শেষ হোল ললিতার বক্তৃতা। ওর বক্তৃতা শেষ হতে আমিও উঠে দাঁড়ালাম, ললিতাকে দেবজ্যোতির আসার খবরটা দিতে হবে। দেবজ্যোতিকে শুধু 'একটু আসছি' বলেই উঠে পড়লাম। লাইব্রেরীর চত্বরটা পেরিয়ে খানিকটা এগিয়েছি এমন সময় দেখি, আলো-আঁধারির পথ ধরে ললিতা

নিজেই এগিয়ে চলেছে গঙ্গার ধারে ফাঁকা জায়গাটার দিকে। এমন অন্যমনস্ক যে আমাকে লক্ষ্যই করল না। ভাবলাম, দেবজ্যোতির আসার খবরটা ও নিশ্চয় ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছে, নতুবা এমন সময় ওর তো এদিকে আসবার কথা নয়। কিন্তু আমার ধারণা যে ভ্রান্ত কিছুক্ষণ পরেই তা বুঝতে পারলাম।

মনে মনে আমি বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলাম। ওদের মিলন-পর্ব দেখবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম আমি, তাই ওর পিছু পিছু এগিয়ে চললাম। খানিকটা গিয়েই একটা গাছের নীচে আরাম করে বসে পড়েছিল ললিতা। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, দেবজ্যোতির কথা ও কিছুই শোনেনি, আসলে ও ক্লান্ত দেহটাকে একটু চাঙ্গা করে তুলবার জন্যেই গঙ্গার ধারে বসতে এসেছিল।

খানিকটা সময় বসার পরেই ও যেন কেমন চমকে উঠল। অদূরে আবছা অন্ধকারে কে যেন বসে রয়েছে! কেমন এক সন্দেহের দোলায় দুরু দুরু করে উঠল ললিতার বুক।

চকিতে উঠে দাঁড়াল সে, কাঁপা কাঁপা গলায় প্রশ্ন করল, 'কে, কে ওখানে?' ললিতার প্রশ্নে চমকে উঠে মুখ ফিরিয়ে চেয়েছিল দেবজ্যোতি। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল দেবজ্যোতির মুখ। ওকে দেখেই থমকে দাঁড়াল ললিতা। কয়েকটা সেকেণ্ডের জন্য দেহের সমস্ত শক্তি যেন হারিয়ে ফেলল সে, কথা ফুটল না মুখে।

বিস্ময়ের ঘোর কাটতে খানিকটা সময় লাগল ললিতার, কিন্তু তার পরেই কেমন একটা বোবা কান্না ঠেলে উঠতে চাইল ওর বুক থেকে, সমস্ত শরীরটা যেন কেঁপে উঠল বারবার।

ললিতার ডাকে খুব আস্তে সাড়া দিয়ে দেবজ্যোতি বলল, 'আমি, ললিতা, আমি।' সেই মুহূর্তে ললিতার মনে হল যেন কত দূর থেকে ভেসে আসছে দেবজ্যোতির কণ্ঠস্বর। সঙ্গে সঙ্গে কোন কথাই জোগায়নি ললিতার মুখে।

আনন্দে অভিমানে সবকিছু ওর কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। মনের গ্রন্থিগুলি যেন শিথিল হোয়ে গিয়েছিল। আজ সারাটা দিনই দেবজ্যোতিকে বড় বেশী করে মনে পড়ছিল ওর, প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, সমস্ত কিছুর মধ্যে কোথায় যেন একটা বড় রকমের ফাঁক থেকে যাচ্ছে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ললিতা আজ বারবার আনমনা হোয়ে পড়ছিল। সভায় ওর বক্তব্য শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম যে কথাটা মনে হয়েছিল তা' এই যে, অন্ততঃ আজ একবার যদি দেবজ্যোতি আসত তবে ললিতা ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিত, সহস্রবার ক্ষমা

চাইত। কথাটা মনে হোতেই ক্লান্তিতে ভরে উঠেছিল ওর সমস্ত দেহ-মন। একটা পালাই পালাই ভাব ওকে ঘিরে ধরেছিল।

তাই সকলের কাছ থেকে পালিয়ে গঙ্গার ধারে এসে একটু জিরিয়ে নিতে চেয়েছিল ললিতা, কিছুক্ষণের জন্য সবার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল। ওর তখনকার সেই টলটলানো মানসিক অবস্থায় আচমকা দেবজ্যোতিকে দেখে সহজ ভাবে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেনি। সংযমের সমস্ত বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল। আনন্দ বেদনায় বাষ্পারুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিল, 'জ্যোতি, তুমি—তুমি এলে?' কটা মাত্র শব্দে ওর সমস্ত বুকভরা কান্না যেন আছড়ে পড়ল সেই মুহূর্তে।

কয়েকটা মুহূর্ত, তারপর একটু একটু করে ললিতা এগিয়ে এল দেবজ্যোতির কাছে। দু'জনে বসলো পাশাপাশি। কারও মুখে কোনো কথা নেই। দু'জনে চেয়ে রইল দু'জনার মুখের দিকে। পলকহীন দৃষ্টি, যেন অনন্তকাল ধরে চেয়ে থাকবে ওরা। আস্তে আস্তে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে আবার চাইল গঙ্গার দিকে। ওদের বুকে তখন আবেগের বন্যা, তাই বুঝি কথার বেগ গেল হারিয়ে। ওদের ঘিরে তবু যেন কি এক না-বলা বাণী চারিদিক ছড়িয়ে পড়ল। দেবজ্যোতির কাঁধের ওপর ললিতা ওর হাত রেখে সেই হাতের ওপর নিজের থুতনীর ভারটা অর্পণ করে যেন নিশ্চিন্ত হোল, কি এক অদ্ভুত নিশ্চিন্ততায় চোখ বুজে এলো ওর। আর দেবজ্যোতি ফিরে পেল ওর হাজার বছরের প্রাণ-প্রাচুর্য, চোখ দুটো ওর উজ্জ্বল হোয়ে উঠল, মুখে স্বস্তির হাসি।

দূর থেকে দাঁড়িয়ে আমি সব দেখলাম। বলতে গেলে চোরের মত চুপি চুপিই দেখলাম, কিন্তু তবু সমস্ত মনটা আমার ভরে গেল। সেই মুহূর্তে মনে হোল, এই পৃথিবীতে না-বলা কথার মূল্যই যেন সবচেয়ে বেশী। সাগরের কোলে যখন সূর্যোদয় হয় তখন তার নবীন আভায় যে বাণীটা প্রকাশ হয়ে পড়ে সে বাণীতো কারও উচ্চারিত নয়। সে বাণী তো না-বলা বাণীই। নীল আকাশের অনেক উঁচুতে একটামাত্র পাখী যখন তার দুই ডানায় ভর করে আপন আনন্দে উড়ে বেড়ায় তখন সেদিকে উদাস দৃষ্টি মেলে যে বাণীটা শুনতে পাই, সে-ও তো না বলা বাণীই। বৃষ্টি-ঝরা রাতে, শিশির-ভেজা সকালে, পাহাড়ের মাথায় রোদের ঝিলিমিলিতে, সাগরের তরঙ্গভঙ্গের মধ্যে প্রতিদিন যে বাণীটা ছড়িয়ে পড়ে সে-ও তো কারও মুখ নিঃসৃত নয়। সেদিন দেবজ্যোতি ললিতার মিলন মুহূর্তে এমনি না-বলা বাণীই শুনতে পেয়েছিলাম, শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম।

মনে মনে নানা কথার জাল বুনতে বুনতে গঙ্গার ধার থেকে নিঃশব্দে ফিরে এলাম আমি। আবার এসে উপস্থিত হলাম সভাস্থলে। সভার কাজ তখনও চলছে। এক কোণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সভার কাজ দেখতে লাগলাম। এক সময় দেখলাম ললিতাও আবার এসে বসেছে মঞ্চের ওপর। ধীরে ধীরে সভার কাজ শেষ হোয়ে এল। ভবসনকাকা সভাপতির ছোট্ট ভাষণে সকলের শুভেচ্ছা কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। ফাঁকা হয়ে গেল সভাস্থল। মঞ্চও ফাঁকা হয়ে গেল। কর্মীদের সবাই নানা কাজে ব্যস্ত। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সভার শূন্য আসনগুলো দেখছিলাম। ভারি বিশ্রী লাগছিল। কেন জানিনা ভাঙ্গা-আষর কোনো দিনই সহ্য করতে পারি না। সভাভঙ্গের পর শূন্য আসনগুলোর দিকে চাইলেই কী এক বিষাদের সুর আমার মনে বাজতে থাকে। কী এক বিয়োগ-ব্যথায় মোচড় দিয়ে ওঠে বুকটা।

সবাই যে-যার কাজে ব্যস্ত; আমি একটু একটু ক'রে গেটের দিকে এগিয়ে চলেছিলাম। দেবজ্যোতি হয়তো তখনও গঙ্গার ধারেই বসে রয়েছে, ললিতাও হয়তো একটু পর যাবে সেখানে; তাই সেদিকে আর পা বাড়ালাম না। দূর থেকে দেখছিলাম, গেটের ওপরটা মাধবীলতায় ছেয়ে আছে, থরে থরে অজস্র ফুল ফুটে আছে সেখানে। হাওয়ায় দুলে দুলে যেন সহস্র হাত মেলে আমায় ডাকছে। বেশ লাগল আমার। মন থেকে বিষাদের সুরটা মুছে গেল। গেটের ঠিক নীচে যেখানটায় মাধবী-লতার ঘন ছায়া এসে পড়েছে সেদিকটায় চোখ পড়তেই একটু যেন অবাক হোলাম। ঐ আবছা আলোতে এক ভদ্র-মহিলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছেন সেখানে। দূর থেকে দেখে মনে হোল, কোনো বিদেশিনী। পরনে গাউন, চোখে চশমা, বাঁ হাতে দুলছে ভ্যানিটী ব্যাগ। তাঁকে দেখেই হঠাৎ বুকটা কেমন দুলে উঠল আমার। একটা অজানা সন্দেহ বুকের ভেতর দানা বেঁধে উঠল। তবে কি—? একটা সন্দেহ উঁকি মারল মনের মধ্যে। কৌতূহল দমন করতে না পেরে এগিয়ে গেলাম তাঁর কাছে। কাছে গিয়ে ইংরেজীতে প্রশ্ন করলাম, 'মাপ করবেন, আপনি কি কাউকে খুঁজছেন?'

কাছ থেকে ভদ্রমহিলাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম এবার। বয়েস হয়েছে, মুখে বার্ধক্যের ছাপ, চুলে পাক ধরেছে, পুরু লেন্সের চশমা, ফর্সা গায়ের রঙে লালের আভা। বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না, এককালে পরমা সুন্দরীই ছিলেন ভদ্রমহিলা, মুখের লাবণ্যে এখনও সে কথা স্পষ্ট লেখা রয়েছে। আমাকে

কাছে পেয়ে খুশিই হোলেন ভদ্রমহিলা। আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পরম স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি বুঝি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত?'

—আজ্ঞে হ্যাঁ। —উত্তর দিলাম আমি।

আমার পাশে আরও ঘন হোয়ে দাঁড়ালেন তিনি, হেসে বললেন, 'বাংলায় বলো, আমি বাংলা বুঝি তবে বোলতে পারিনা।'

—আপনি বাংলা বোঝেন?— এবার বাংলাতেই প্রশ্ন করলাম আমি।

—বাংলা দেশে ছিলাম যে, বাংলা দেশের সাথে আমার আত্মার যোগ রয়েছে।

কেমন ম্লান হাসলেন সেই বিদেশিনী। আমার সন্দেহ তখন আরও গভীর হয়েছে, মনের মধ্যে একটা উত্তেজনার ঢেউ উঠছে নামছে।

—বাংলা দেশে আপনি অনেক দিন ছিলেন বুঝি?—প্রশ্ন করলাম আমি।

—না, অল্পদিন, কিন্তু এই অল্পদিনেই বাংলা দেশ আমায় অনেক কিছু দিয়েছে।

—তেমনি নিয়েছেও অনেক।

হঠাৎ যেন কথাটা মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

কথাটায় একটু চমকে উঠলেন ভদ্রমহিলা। চশমার ফাঁকেও বুঝতে পারলাম চোখ দুটো চকচক করে উঠল একটু। একটুকাল চুপ করে থেকে কতকটা আপন মনেই বললেন, 'হ্যাঁ ঠিকই বলেছো, বাংলা দেশ আবার আমার কাছ থেকে নিয়েছেও অনেক। অনেক দিয়েছি বাংলা দেশকে।'

একটু ইতস্ততঃ করে বললাম, 'আমি বোধ হয় আপনাকে চিনতে পেরেছি।'

—সত্যি?—কেমন ছেলেমানুষের মত উচ্ছ্বসিত হোয়ে উঠলেন তিনি। বললেন, 'কে বলোতো?'

—আপনি, আপনি মিস ডরোথী উইলসন।

চমকে উঠলেন ভদ্রমহিলা। হঠাৎ ভয়ানক করুণ মনে হোল ওর মুখটা। কিছুক্ষণ কোনো উত্তরই দিতে পারলেন না তিনি। আমি চুপ ক'রে তাঁর মুখের পরিবর্তন লক্ষ্য করছিলাম। চশমার আড়ালে চোখ দু'টো তাঁর জলে ভরে এসেছিল। ধীরে ধীরে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ তুমি ঠিকই চিনেছো।' একটু থেমে আমায় প্রশ্ন করলেন, 'এখানে তুমি কি করো?'

—বলতে গেলে কিছুই না। এদের একটা পত্রিকা আছে তাতে মাঝে মধ্যে লিখি।

—গল্প লেখো?

—তা'ও বলতে পারেন।

আমার কথার উত্তর না দিয়ে একটু হাসলেন তিনি। এমনই একটা কিছু আশা করেছিলেন যেন।

আমার মনে কিন্তু তখন প্রবল উত্তেজনা। এতদিন মনে মনে যাঁকে খুঁজছিলাম, শিউলী আশ্রমে আমার সঙ্গেই তাঁর প্রথম পরিচয়। এ-কথাটা ভাবতেই কেমন একটা শিহরণ জাগল। ডরোথীর সেই মুখখানার দিকে চেয়ে কিছুতেই ভাবতে পারছিলাম না, এই সেই মেয়ে, যে একদিন তার মোহময়ী রূপ বিস্তার করে ভোলাতে চেয়েছিল আর্থারকে, এই সেই নারী যে একদিন নারীধর্মকে তুচ্ছ করে জাত্যাভিমানের নেশায় বুঁদ হোয়ে শিউলীর মত মেয়ের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল।

আমার মনের কথা হয়তো তিনি বুঝলেন, তাই আর নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করেননি। আমি প্রশ্ন করেছিলাম, 'এখন বুঝি কলকাতাতেই আছেন?'

—হ্যাঁ দিন কয়েক হোল আমেরিকা থেকে ফিরেছি। বছর দশেক সেখানে ছিলাম।

—আবার ফিরবেন?

—ইতিমধ্যে ফিরেই যেতাম। কিন্তু কাগজে দেখলাম শিউলীর বার্ষিক সম্মেলনের কথা, তাই রয়ে গেলাম ক'টা দিন।

একটু থেমে আবার বললেন, 'ভালো কথা, ঐ যে মেয়েটি বক্তৃতা দিলে ওর সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দেবে? বড় ভালো লাগল মেয়েটিকে।'

-- নিশ্চয়। চলুন আমার সঙ্গে। তা' এতক্ষণ বলেননি কেন?

কথাটা বলেই সামনের দিকে পা বাড়ালাম আমি। ডরোথী আমাকে অনুসরণ করতে করতে বললেন, 'চলেই যাচ্ছিলাম, হঠাৎ মনে হোল, না, মেয়েটির সঙ্গে আলাপ না করে ফিরে যাব না। তাই ফিরে এলাম।'

—সে কি কথা, ডবসন কাকার সঙ্গে দেখা না করেই চলে যাচ্ছিলেন?— সোজা ওঁর চোখের দিকে চেয়ে প্রশ্নটা করলাম।

একটু হাসলেন তিনি, তারপর আস্তে আস্তে বললেন 'তোমরা বুঝি ওঁকে ডবসন কাকা বলে ডাকো?'

—হ্যাঁ, আমরা সবাই।

—খুব ভালো।

তারপর আস্তে কতকটা স্বগতোক্তির মত করে বললেন, 'কী মহৎ প্রাণের অধিকারী ভাবলে অবাক হোতে হয়! অথচ তাঁর আমি—।' কথাটা শেষ

করলেন না, ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মাঝপথে থেমে গেলেন। আমিও উত্তর করলাম না আর।

চুপচাপ খানিকটা পথ হাঁটতেই ললিতার সঙ্গে দেখা। উল্টোদিক থেকে আসছিল সে, হয়তো কোয়ার্টারের দিকেই পা বাড়িয়েছিল, কিম্বা হয়তো দেবজ্যোতির খোঁজেই চলেছিল আবার। আমাদের দেখেই ওর চোখে ফুটে উঠেছিল একটা কৌতূহলের ছায়া। শ্লথ হয়েছিল ওর গতি। আমরা এগিয়ে গিয়েছিলাম ওর সামনে। ডরোথী আর ললিতা দাঁড়িয়েছিল মুখোমুখি, ডরোথীর মুখে এক টুকরো হাসি, ললিতার চোখে যুগপৎ বিস্ময় আর কৌতূহলের ছায়া। আমি ডরোথীর পরিচয় দিতেই ছোট্ট বালিকার মত একেবারে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল ললিতা। ডরোথীর দু'খানা হাত চেপে ধরল নিজের দুটো হাতের মধ্যে, উত্তেজনায় চোখ দুটো চকচক করে উঠল ওর। একটা আবেগে কাঁপা কাঁপা গলায় বললে, 'আণ্ট ডরোথী আপনি!—কতদিন ভেবেছি আপনি আসবেন—আপনি এলেন—শেষ পর্যন্ত আপনি এলেন—আমি জিতে গেলাম, আণ্ট ডরোথী।' ললিতার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

ডরোথীর গালে তখন জলের ধারা, আনন্দের প্রাবল্যে কেঁপে কেঁপে উঠছিল ওঁর দেহ। ললিতাকে একেবারে বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছিলেন তিনি ধীরে ধীরে বললেন, 'আশ্চর্য! পৃথিবীর এক কোণে বসে এই এক বৃদ্ধা অভাগীর কথা তুমি ভাবছো! অথচ কোনো দিন দেখোনি আমায়, কোনো পরিচয় ঘটবার সুযোগ হয়নি, একটা কলঙ্কের কাহিনীকে কেন্দ্র করে হয়তো শুনছো কিছু এলোমেলো কথা। তবু তুমি আমায় ভালাবেসেছো এ কথা ভাবতেই অবাক লাগছে।'

একটু একটু করে ওরা সহজ হয়েছিল, আবার হাঁটতে সুরু করেছিলাম আমরা। ললিতা একসময় শান্ত কণ্ঠে বললে, 'আপনার অভিমান কিন্তু আজও যায়নি, আণ্ট ডরোথী।'

—অভিমান? কার ওপর অভিমান?

—সকলের ওপর, যাদের ওপর আপনার ভালবাসার দাবী তাদের ওপর, সমস্ত মানুষের ওপর।

—কেন? কেন অভিমান করবো?

—খুব স্বাভাবিক কারণে।

এবার দূরে উদাস দৃষ্টি মেলে দিয়েছিল ললিতা। বলেছিল, 'সেই ঘটনার পর আপনি যখন ধিকধিক করে অনুতাপের আগুনে পুড়তে লাগলেন, দিনের

পর দিন জলে যেতে লাগলেন একা একা, তখন কেউ এসে দাঁড়ালো না আপনার পাশে। অথচ সেদিন কিন্তু একান্ত ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যই অতবড় ঝুঁকিটা নেননি আপনি। তারপর একদিন একটু একটু করে সমস্ত পুড়ে ছাই হয়ে গেল, শুধু রইল সমস্ত সত্তা জুড়ে একটি মাত্র নাম আর সেই সঙ্গে কিছু অভিমান।,

—কি করে বুঝলে?

—আপনাকে দেখে।

--দেখে কি এত কথা বোঝা যায়?

—বাকীটা উপলব্ধি।

ললিতা একটু চুপ করে আবার বললে, 'সেই ঘটনা, যাকে একটা এ্যাক্সিডেণ্টও বলা যেতে পারে, তার কথা কতবার ভেবেছি। ভাবতে ভাবতে বারবার একটা জায়গাতেই ফিরে এসেছি, সে জায়গাটা জুড়ে রয়েছে কেবল একটি মানুষ, ডরোথী উইলসন।'

ডরোথী আর আমি দুজনেই তাকিয়েছিলাম ওর দিকে। ললিতা একটুকাল চুপ করে রইল, কি ভাবল একটু। তারপর ধীরে ধীরে বলে যেতে লাগল, কতকটা ডায়েরী লেখার মত করে বলতে লাগল সে, - 'যেমন করেই হোক, সেদিন একটা ত্রিভুজ গড়ে উঠেছিল, তার ফল শুভ হয়নি একটা ভয়ঙ্কর পরিণতি টেনে এনেছিল তিন জনের জীবনেই। প্রথম কৌণিক বিন্দুতে ছিলেন শিউলী। অকালে তাঁর জীবন দীপ নিভে গিয়েছিল সত্যি, কিন্তু সেই মৃত্যু তাঁকে মহীয়সী করেছিল, তাঁকে অমরত্ব দান করেছিল। মৃত্যু তাঁকে শেষ করে দিতে পারেনি। আর দ্বিতীয় বিন্দুটাতে যে মানুষটি ছিলেন তিনি আর্থার—আর্থার ডবসন। সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাটা কি দিয়েছিল তাঁকে? —স্বাভাবিক জীবন থেকে তাঁকে ছুঁড়ে দিয়েছিল প্রচণ্ডবেগে —ঘুরতে ঘুরতে তিনি এসে পৌঁছেছিলেন শিউলীর আদর্শের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুটাতে। আদর্শকে আঁকড়ে ধরেছিলেন তিনি শিউলীর আদর্শকে আঁকড়ে ধরে তিনি তাঁর চিন্ময়ী প্রতিমাকে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন, মৃত্যু তাঁর প্রেমের প্রতিমাকে ছিনিয়ে নিতে পারেনি, তিনি জয়ী হয়েছিলেন। আর তৃতীয় জন? তিনি কি পেলেন?'

মাথা নীচু করে হাঁটছিলাম। ললিতার কথা শুনতে শুনতে একটা ভাবনার গভীরে যেন ডুবে যাচ্ছিলাম ক্রমশঃ। ললিতা থামতেই ওর মুখের দিকে ফিরে চাইলাম।

ললিতা শুরু করল আবার।—'তিনি তো কেবল নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই

এগিয়ে আসেননি। বলতে গেলে তখনকার ভারতী, ইংরেজ সমাজই তাঁকে ঠেলে দিয়েছিল সেই পথে। তিনি ছুটে এসেছিলেন তিস্তার কূলের সেই নেটীভ মেয়েটার কবল থেকে আর্থারকে বাঁচাতে তিনি চেয়েছিলেন কলঙ্কের হাত থেকে ইংরেজ সমাজকে বাঁচাতে, বৃটেনের মান রাখতে। তিনি তাঁর সমাজের আর পাঁচজনের মত করেই ভেবেছিলেন, তাই মানবতার প্রশ্নটা তাঁর চোখে পড়েনি। কিন্তু আঘাত হানতে গিয়ে ফিরে এল প্রত্যাঘাত। আর প্রত্যাঘাত যখন এল, তখন সবিস্ময়ে চারপাশে চেয়ে দেখলেন, কেউ কোথাও নেই—মহা-শূন্যে, অনন্ত অন্ধকারের মাঝখানে তিনি একা দাঁড়িয়ে। মানবতার প্রশ্নটা তখন তিল তিল করে তাঁকে একেবারে গ্রাস করে ফেলেছে। মহাশূন্যে মানবতার সেই বিরাট প্রশ্নটার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি দেখলেন, দুঃস্বপ্নের মত সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাটা একজনকে দিলে মৃত্যুহীন মহিমা, আর একজনকে দিলে বিশাল কর্ম-জগতের মধ্যে অপার আনন্দের সন্ধান। তিনি নিজে পেলেন, কলঙ্কময় জীবন আর নিরবচ্ছিন্ন হাহাকার। কেউ তাঁর দিকে ফিরে চাইল না, সান্ত্বনা দিলে না কেউ, কেউ তাঁকে বুঝতে চাইল না।'

আমি তখন একটা প্রচণ্ড ভাবনার তরঙ্গে দোল খাচ্ছি। ডরোথীর বুকে তখন হয়তো আবেগের বান ডেকেছে। ললিতা নিজের মধ্যে একেবারে মশগুল। আমরা কেউ লক্ষ্য করিনি, কখন প্রায় অফিসের সামনে পৌঁছে গেছি। মুখ তুলে চাইতেই একেবারে ডবসন কাকার মুখোমুখি। কখন তিনি সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন টের পাইনি কেউ। ডরোথীর মুখের দিকে চাইলেন তিনি, এতটুকু চাঞ্চল্য নেই, শান্ত দৃষ্টি। ডরোথীর চোখে কিসের এক প্রতীক্ষা। আমরা রুদ্ধ-শ্বাস—কি বলেন ডবসন কাকা। খুব শান্ত কণ্ঠে বললেন তিনি, 'ডরোথী, এতো দেরী করে এলে? সময় যে ফুরিয়ে এলো।'

—তুমি আমায় আশা করেছিলে আর্থার?

এ কথার উত্তর দেননি ডবসন কাকা, একটু হেসেছিলেন। হাসির অর্থ কারও বুঝতে বাকী ছিলনা।

ললিতার কাঁধের ওপর একটা হাত রেখেছিলেন ডরোথী। ডবসন সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে বলেছিলেন, 'এ-মেয়েকে কোথায় পেলে, আর্থার? এ যে সব কিছু ভুলিয়ে দেয়, এলোমেলো করে দেয় সব ভাবনা-চিন্তাগুলো, পরকে কাছে টেনে আপন করে তোলে!'

—ও আমার মা, ডরোথী—আমার জীবন নৌকোর মাঝি। কেউ ডেকে আনেনি ওকে, ও নিজেই এসেছে, নিজেই তুলে নিয়েছে কাজের দায়।

কেউ কোনো কিছু উত্তর দেবার আগেই সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিল দেবজ্যোতি। তাকে দেখে কেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন ডবসনকাকা। সংযমের বাঁধটা যেন তাঁর শিথিল হয়ে পড়েছিল। ছুটে গিয়ে দেবজ্যোতির দুই কাঁধের ওপর দুটো হাত রেখে বলেছিলেন, 'দেবু, তুই! শেষ পর্যন্ত এলি, তবু বুড়োটাকে এমন করে কষ্ট দিলি কেন বল্? কি লাভ হোল তোর?'

শেষের দিকে গলাটা একটু যেন কেঁপে উঠল ডবসন কাকার। দেবজ্যোতি অস্ফুট স্বরে বলেছিল, 'আমিও কম কষ্ট পাইনি, কষ্ট দিয়ে কষ্টও পেয়েছি।' ওর গলায় অভিমানের সুর।

বৃদ্ধের চোখ দুটো একটু যেন চিক চিক করে উঠল। একটুকাল কোনো কথা বলতে পারলেন না তিনি। তারপর একটু হেসে বললেন, 'বোকা ছেলে!'

আমাদের সকলের দিকে এবার চাইলেন তিনি বললেন, 'আর দেরী নয়, অনেক কাজ বাকী। ললিতা, ডরোথীর থাকবার ব্যবস্থা করে দাও।' কথা-গুলো বলেই তিনি এগিয়ে গেলেন। ডরোথীর বাধা দেবার কথা মনে হলনা একবারও, যেন এখানে থাকবার সিদ্ধান্ত নিয়েই তাঁর আসা।

ধীরে ধীরে যে যার কাজে চলে গেল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম একা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, এ যেন এক মহাসমুদ্র। এই মহাসমুদ্রে এসে মিলে গেল সমস্ত নদী—টেম্স্-তিস্তা, করোতোয়া-ভাগীরথী। দেশের সীমাকে অতিক্রম করে মহাসমুদ্রে এসে একাকার হয়ে গেল সব, বিরাটের মধ্যে নিজের ক্ষুদ্রত্বকে বিলীন করে দিয়ে ধন্য হল ওরা। আর এই মহামিলন দেখার সৌভাগ্য নিয়ে ধন্য হলাম আমি।

কখন সুতপা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল টের পাইনি। আমার কাঁধের ওপর একটা হাত রাখতেই চমকে উঠেছিলাম। প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে খুব আস্তে বলেছিল সে, 'এসো কমরেড, আজ থেকে তোমার যাত্রা সুরু হোক।' একটু থেমে বলেছিল, 'না বলোনা যেন।'

'না' বলবার সাধ্য ছিলনা আমার। কখন ওর অস্তিত্বের সঙ্গে আমার অস্তিত্ব এক হয়ে গেছে বুঝতে পারিনি। আমি তাকিয়েছিলাম ওর দিকে। আনন্দের এক অপূর্ব অভিব্যক্তিতে ভরে উঠেছিল ওর চোখ মুখ। আমার চোখে চোখ রেখেছিল সুতপা। নতুন পথের ইঙ্গিত যেন পেয়েছিলাম ওর চোখের তারায়।

পাঁচ

সেদিন শিউলি জন কল্যাণ আশ্রম থেকে ফিরবার পথে আর্থার ডবসন সাহেবের কথাটাই বার বার মনে পড়ছিল। অথচ স্বাভাবিক ভাবে, সেই মুহূর্তে সুতপার কথাই ভাবা উচিত ছিল। আমার চেতনা জুড়ে সুতপার নিবিড় অস্তিত্বই থাকাটাই হত অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা। কারণ সেদিন আশ্রম থেকে বেরোবার আগের মুহূর্তে আমাকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল সুতপাই। সে যে-ভাবে আমার হাতটা চেপে ধরে আমাকে তার আগামী দিনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গী হতে আহ্বান করেছিল তাতে আমার বিচলিত হওয়াই ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। আমি বিচলিত হয়েও ছিলাম। তার গলার স্বরে ছিল হার্দ্য উত্তাপ। চোখের গভীর দৃষ্টিতে অদ্ভুত এক সম্মোহনের আভাস। তার দুই হাতের কোমল স্পর্শ আমার সমস্ত সত্বাকে গ্রাস করে ফেলেছিল যেন। তাৎক্ষণিক ভাবে তার সাগ্রহ আহ্বানকে অগ্রাহ্য করার সাধ্যও আমার ছিল না।

তবু পথে নেমে দ্রুত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলাম, আমি সুতপার কথা ভাবছি না। ভাবছি আমাদের সকলের প্রিয়, আঙ্কল ডবসনের কথা। হয়তো যেটা আমার কাছে তখন অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল আসলে সেটাই ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। সম্ভবত আমাদের মতো যারা ডবসন সাহেবের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছে তাদের সকলের চেতনাতেই ফল্গু-ধারার মতো ডবসন সাহেবের ভাবনা কোনো না কোনো ভাবে সারাক্ষণ প্রবাহিত হয়। সময়ে অসময়ে বাইরের জগতের ঘাত-প্রতিঘাতে সেই ভাবনার স্রোত অসচেতন স্তর থেকে সচেতন স্তরে উঠে আসে। আর তখনই বিস্ময়ের ঘোর লাগে।

শিউলি আশ্রম থেকে ফিরবার পথে সেদিনও হয়তো তা-ই হয়েছিল। সুতপার উত্তপ্ত আহ্বানে আমার সমগ্র চেতনা এমন ভাবে চঞ্চল হয়েছিল যে আমার সমস্ত চিন্তা-ভাবনা সুতপা দেবজ্যোতি ললিতাকে অতিক্রম করে আবর্তিত হয়েছিল সেই ধুতি পাঞ্জাবী পরিহিত, শুভ্র শ্মশ্রু সুমণ্ডিত, ভারতীয় ঋষিকল্প সৌম্যদর্শন ইংরেজ সন্তান আর্থার ডবসনকে ঘিরে।

আঙ্কল ডবসনকে ভাবনার মুহূর্তে সেদিন তাঁর একটি প্রিয় কবিতার কিছুটা অংশও মনে পড়ছিল। Coleridge-এর কবিতা। তিনি প্রায়ই কবিতার এই অংশটা অস্ফুট স্বরে আওড়াতেন।

All nature seems at work—slugs leave their leave
ther hair —
The bees are stirring—birds are on the wing—
And winter, slumbering in the air,
Wears on his smiling face a dream of spring !
And I the while, the sole unbusy thing
Nor honey make, nor pair, nor build ,nor sing.

কোলেরিজের কবিতার এই অংশটি তিনি অনেককে অনেকবার শুনিয়েছেন। এই প্রসঙ্গ টেনে একদিন আমাকে বলেছিলেন, 'জানো পুঁথিকার, কবিতার এই অংশটা আওড়ালে আমি কাজের ইনস্‌পিরেশন পাই। মনে হয়, প্রকৃতির রাজ্যে সবাই যখন নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত তখন আমি-ই বা চুপচাপ বসে থাকব কেন ? হোয়াই শুড আই রিমেন দ্য সোল আনবিজি থিং' ?' তিনি আরো যোগ করেছিলেন, 'কেবল কাজ করার ইনসপিরেশনই না। কাজ করতে করতে ভবিষ্যতের স্বপ্নও দেখতে পাই। এ ড্রিম অব স্প্রিং।'

সাদা লম্বা দাড়িতে হাতের আলতো স্পর্শ রেখে আরো বলেছিলেন, 'কর্মহীন, স্বপ্ন-শূন্য জীবনের কি কোনো অর্থ আছে পুঁথিকার ?'

কিছুদিন হল ডবসনকাকা আমাকে পুঁথিকার বলে সম্বোধন করতে শুরু করেছিলেন। আমি প্রথম দিন অবিশ্যি বাধা দিয়েছিলাম কিন্তু কোনো ফল হয়নি। বরং তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে হা-হা করে হেসে বলেছিলেন, 'মাই বয়, এই ব্যাপারটা না হয় আমার ওপরই ছেড়ে দিলে। এই সম্বোধনটা একান্ত আমার জন্যই তোলা থাক।'

এরপর আর কোনো কথা থাকতে পারে না। আমি আর কোনো কথাও বলিনি। কেবল নিঃশব্দে সম্মতি জানিয়েছিলাম। ডবসন কাকা কি ভেবে আলতো করে আমার কাঁধের ওপর একটা হাত রেখেছিলেন। কোনো কিছু বলেননি।

সেদিন তাঁর হাতের স্পর্শ অনুভব করতে করতে আমার বার বার মনে হয়েছিল, আশ্চর্য নরম মনের মানুষ এই ইংরেজ ভদ্রলোক। অথচ এই মানুষটিকে কঠোর হতেও দেখেছি। বিশেষ করে শিউলি জনকল্যাণ আশ্রমের যুবক-যুবতীর সামনে দাঁড়িয়ে আঙ্কল ডবসন একদিন বলেছিলেন, 'তোমরা কেবল দেশ দেশ করে চিৎকার কোরো না-তো। জানো না দেশ কথাটার মধ্যে সঙ্কীর্ণতার অবকাশ আছে ? আসল কথা হল—মানুষ। মানুষ মানে কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিবেশের মানুষ না। বিশেষ রঙের মানুষও না। মানুষ

মানে মানুষ। সমগ্র বিশ্বের মানুষ। সাদা কালো সবাই।'

শিউলি জন-কল্যাণ আশ্রমের একটি যুব-শাখা খোলা হয়েছিল কিছুকাল আগে। এই যুব-শাখা খোলার ব্যাপারে সুতপার উৎসাহই ছিল বেশি।

সময়টা ছেষট্টির শেষের দিকে। আমরা ক'জন বসেছিলাম কফি-হাউসের কোণ ঘেঁষে একটা টেবিল ঘিরে। আমরা বলতে ললিতা, দেবজ্যোতি, সুতপা এবং আমি। আলোচনা চলছিল আশ্রমকে কেন্দ্র করে। আশ্রমের কিছু বই কেনার জন্যই সেদিন কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় আমাদের আসা। বই কেনার ফাঁকে কিছুক্ষণের জন্য অবসর বিনোদন চলছিল তখন। কাজেই আমাদের আলোচনার মধ্যে জটিল সমস্যার কোনো বিষয়ে ছিল না। আলোচনার মধ্যে কোনো উত্তাপও ছিল না। কিন্তু উত্তাপ ছিল প্রত্যেকটা টেবিলের প্রায় প্রত্যেকটি ছেলে-মেয়ের কথার মধ্যেই। দিনের এই সময়টা প্রায় প্রত্যেকটি টেবিলই ভর্তি থাকে কলেজের অল্প-বয়সী ছেলেমেয়ে দিয়ে। আর এই সব ছেলেমেয়ের বেশির ভাগই যেমন সমাজ এবং রাজনীতি সচেতন তেমনি আবার অনেকে বেপরোয়াও। ফলে দু'দণ্ড এখানে বসলে বর্তমান প্রজন্মের একটা চিত্র অনায়াসেই পাওয়া যেতে পারে। অন্তত সেদিন সুতপার তা-ই মনে হয়েছিল।

ছেষট্টির খাদ্য আন্দোলনের বারুদের গন্ধ তখনো কলকাতার হাওয়ায়। আসলে ছেষট্টি সালটাই তো ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। এই বছরের শুরুতেই ভারতের রাজনীতির এক মহীরুহের পতন ঘটে। সেই মহীরুহ স্বাধীন ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী। জওহরলাল নেহরুর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব অথবা তাঁর সমতুল্য জনপ্রিয়তা লালবাহাদুর শাস্ত্রীর ছিল না ঠিকই; তবু ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি একজন মহীরুহ সদৃশ ছিলেন। এ-ব্যাপারে কোনো রকম দ্বিমত থাকার কারণ নেই। সেই মহীরুহের পতন ঘটে, কতকটা বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতোই, ছেষট্টির বারোই জানুয়ারী রাশিয়ার তাসখণ্ডে। মহীরুহের পতন ঘটলে মেদিনী কেঁপে ওঠেই। ভারতের রাজনীতিতেও তাই কাঁপন লেগেছিল লাল বাহাদুরের মৃত্যুতে।

সামান্য সময়ের জন্য ভারতীয় রাজনীতিতে একটা শূন্যতা তৈরি হয়েছিল। প্রশ্ন জেগেছিল, অতঃপর কে? এই উদ্ধত প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্যে কয়েকটি মহল অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছিল। এই তৎপরতার ফলশ্রুতি হিসেবে কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের আশীর্বাদ নিয়ে স্বাধীন ভারতের তৃতীয় প্রধানমন্ত্রী হলেন প্রয়াত জওহরলালের কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। দিনটি ছেষট্টির ২৪শে জানুয়ারী।

ইন্দিরা গান্ধীর এই আবির্ভাবকে মোরারজী দেশাই-এর মতো প্রবীণ কংগ্রেসীদের অনেকেই খোলা মনে গ্রহণ করতে পারেন নি। ফলে ভারতীয় রাজনীতিতে এক ঝঞ্ঝাবর্ত তৈরি হয়েছিল। সর্ব ভারতীয় রাজনীতির সেই আবর্ত থেকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিও সরে থাকতে পারেনি।

পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব রাজনৈতিক পটভূমিতেও তখন অনেক পরিবর্তন এসেছে। চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রবাদপুরুষ, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির ক্ষেত্রে স্তম্ভ সদৃশ, ডঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রয়াত। ডঃ রায়ের স্থলাভিষিক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন। তাঁকে তাঁর দলের প্রবীণ অনেক নেতাই তখন ভালো ভাবে গ্রহণ করছে না। যার ফলে শেষ পর্যন্ত বাংলা কংগ্রেসের আবির্ভাব ঘটে।

শাসক দলের রাজনৈতিক চালচিত্র যখন এমনি দোদুল্যমান তখন বাম দল-গুলোও কিন্তু খুব একটা সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল না। বিশেষ করে কমুনিস্ট পার্টি। বাষট্টির চীন-ভারত যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব তখন দ্বিধা-বিভক্ত। কেবল নেতৃত্বই না। আসলে দলই তখন দ্বিখণ্ডিত। অন্যান্য ছোট দলগুলোর মধ্যেও কোনো রকম সমঝোতা নেই। সবাই যেন কেমন ছত্রখান। কেমন শূন্যতা সর্বত্র।

এই রাজনৈতিক শূন্যতা হয়তো ভেতরে ভেতরে অনুভব করছিল সুতপা। সে হয়তো অনুভব করছিল, কিম্বা ভেতরে ভেতরে দারুণ ভাবে চাইছিল, অদূর ভবিষ্যতে দেশের মাটিতে একটা বড় কিছু পরিবর্তন হবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতার পর সাধারণ মানুষ কেবল পড়ে পড়ে মার খাবে না, মাথা তুলে দাঁড়াবার জন্যে একটা কিছু করবে।

বসিরহাটে খাদ্য-আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে বালক নুরুল ইসলামের মৃত্যুর খবর খবরের কাগজে পড়ে সুতপা উত্তেজিত কণ্ঠে বলেছিল, 'কি সাঙ্ঘাতিক। ক্ষুধার্ত মানুষ খেতে চাইলে তাকে গুলি করা। এর পরিমাণ যে ভয়ঙ্কর হতে বাধ্য। সাধারণ মানুষ কখনোই এই অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করতে পারে না। এটা যে রুটির বদলে কেক খেতে বলার চেয়েও নির্মম পরিহাস।'

সুতপা তখন কফি-হাউসে আমাদের সঙ্গে হাল্কা আলোচনায় যুক্ত থাকলেও তার মাথায় হয়তো তখনকার রাজনৈতিক ভাবনাই ঘুরপাক খাচ্ছিল। হয়তো তার মাথায় খাদ্য আন্দোলনের বীভৎস রূপটাও প্রকটভাবে বাসা বেঁধে ছিল। হয়তো তাই তার কানেই প্রথমে প্রবেশ করেছিল অদূরে আলোচনারত কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীর আলোচনার টুকরো টুকরো অংশ। সেই টুকরো অংশ তার কানে যেতেই সুতপা সজাগ হয়ে বলেছিল, শোনো ওরা কি বলছে।

ইটস্ রিয়্যালি ওয়ার্থ লিস্নিং।

সুতপার কথায় আমরা সবাই উৎকর্ণ হয়ে উঠেছিলাম। আগের আলোচনার জের টেনেই একজন ছাত্র তখন উচ্চ কণ্ঠে বলছিল, তাই বলছি, এবারকার জেনারাল ইলেকশানে সাধারণ মানুষ সব রাজনৈতিক হিসেব-নিকেশ ওলট-পালট করে দেবে। আর কিছু না পারুক একটা এক্সপেরিমেণ্ট তারা করবেই। কংগ্রেস যে শাসনের ইজারা নিয়ে বসে নেই তা তারা দেখাবে। তাদের বিরোধী দল জোট বাঁধতে পারুক আর না-ই পারুক তাতে কিছু এসে যায় না। জনসাধারণের প্রচণ্ড বিক্ষোভের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতেও জোট বাঁধতে হবে তাদের। ভোটের পরে হলেও।

ছাত্রটি যেন আশ্চর্য রকমের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎবাণী করে বসল।

অচেনা অজানা ছাত্রটির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ বাণী গভীর প্রভাব ফেলেছিল সুতপার মনের ওপর। হয়তো বা সুতপা মনে মনে প্রস্তুত ছিলই। ছেলেটির মন্তব্য তার মনের স্তূপীকৃত বারুদে অগ্নি সংযোগের কাজ করেছিল মাত্র।

সেদিন সেই মুহূর্তে ছেলেটির কথা শেষ হতে না হতেই সুতপা এক রকম আচমকা বলে উঠেছিল, 'চলো এবার ওঠা যাক। আমাদের এখনো অনেক কাজ বাকি।' শেষের কথাটা কতকটা নিজেকে শুনিয়েই বলেছিল সে।

সুতপা সে তখনই মনে মনে আগামী দিনের কাজের একটা ব্লু প্রিণ্ট তৈরি করে ফেলেছিল সেই মুহূর্তে আমরা কেউই তা বুঝতে পারিনি। বুঝতে পেরেছিলাম সেদিন সন্ধ্যায় ডবসন কাকার সামনে যখন সে আশ্রমের যুব-শাখায় প্রস্তাব তুলেছিল।

গঙ্গার এ দিকটায়, আশ্রমের এই প্রশস্ত ঘরটাতেই সাধারণত আশ্রম সংক্রান্ত সমস্ত আলোচনা হয়ে থাকে। সপ্তাহে অন্তত তিন দিন আলোচনা বসে। ঘরের মধ্যে বিশাল বিশাল সতরঞ্চি পাতা। ষাট থেকে সত্তর জন অনায়াসে বসতে পারে সেখানে। সে দিন আমরা জনা তিরিশেক মানুষ উপস্থিত ছিলাম।

সে বলেছিল, আঙ্কল, আমাদের অনেকের ইচ্ছে শিউলি আশ্রমের একটা যুব-শাখা খোলা হোক।

সুতপার প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছিল ললিতা-দেবজ্যোতি সহ প্রায় সকলেই। বিশেষ করে জোরদার সমর্থন জানিয়েছিল দেবজ্যোতি।

দেবজ্যোতি বাইরে থেকে ফিরে আসার পর থেকে আশ্রমের প্রায় সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে গেছে। আশ্রমই এখন তার জীবন। সে সুতপাকে সমর্থন জানিয়ে বলেছিল, নতুন প্রজন্মকে আকর্ষণ করতেই হবে। নতুন প্রজন্মের সঙ্গে আমাদের

যদি কোনো যোগ সূত্র তৈরি না হয় তাহলে আগামী দিনে এই আশ্রম কাদের নিয়ে চলবে ?

ডবসন কাকা বললেন, আমিও তোমাদের কথা মেনে নিচ্ছি। সর্বান্তঃকরণেই সমর্থন জানাচ্ছি। এই আশ্রমের যুব-শাখা খোলা উচিত। এবং এখনই খোলা উচিত। তবে এই প্রসঙ্গে তোমাদের দু'একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।'

সবার মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'তোমরা তো সবাই জানো, এই আশ্রম কোনো রাজনৈতিক বা ধর্মীয় সংস্থান নয়। মানবতা ভিন্ন অন্য কোনো সাধনাও আমাদের নেই। কাজেই এই দিকটা তোমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে। যুব-শাখা খোলার সময়ও।'

ডবসন কাকা সুতপার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে রইলেন কয়েক সেকেণ্ড। তারপর যোগ করলেন, 'সুতপা, তুমি ব্যাপারটা কিভাবে ভেবেছো সেটা খোলাখুলি ভাবে বলো।'

সুতপার চোখে মুখে একটা আত্মপ্রত্যয়ের ভাব প্রকাশ পেল। তার বলার ভঙ্গি দেখে স্পষ্টই বোঝা গেল সে আগে থেকেই প্রস্তুত হয়েছিল।

সুতপা বলতে শুরু করল, 'যুব-শাখার ব্যাপার মোটামুটি আমি এই ভাবে ভেবেছি। যে সব ছেলে মেয়ে স্কুল থেকে সভ্য পাশ করে বেরিয়েছে অথবা কলেজ ইউনিভারসিটিতে পড়ছে, আমরা তাদের সংগ্রহ করব। অবশ্যই যারা নতুন কিছু করার ব্যাপারে আগ্রহী কেবল তাদেরই আমরা নেব। এই সব ছেলে-মেয়েরা ছুটির দিন সকালে অথবা বিকেলে এখানে এসে বিভিন্ন বিষয়ে অংশ গ্রহণ করবে। সাহিত্য দর্শন-অর্থনীতি ইত্যাদির তাত্ত্বিক আলোচনা। মাঝে মাঝে ডিবেট হবে; সঙ্গে নাটকও থাকবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কারিগরী শিক্ষাও দেওয়া হবে আমাদের এখানে অন্যদের যেমন দেওয়া হয়।

মোট কথা, পারস্পরিক ভালোবাসা এবং বোঝাপড়ার মাধ্যমে একজন মানুষের চরিত্র গঠনে আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করব। যাতে এই সব ছেলে-মেয়ের এক এক জন সামাজিক জীবনে আদর্শ স্থানীয় হয়ে উঠতে পারে।

ঠিক এই সময় উপস্থিত আশ্রম সদস্যদের একজন উঠে দাঁড়াল। বয়েস পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে। ফুল ফাইনালের পর কলেজে লেখাপড়া করার সুযোগ পায়নি। আশ্রমের কারিগরী বিভাগে শিক্ষানবীশী শেষ করার পর এখন প্রোডাকসনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। খুবই কর্মঠ ছেলে। লেখাপড়ার দিকে ঝোঁকও আছে খুব। আশ্রমের লাইব্রেরীর নিয়মিত পাঠক। আঙ্কল ডবসন

তাকে খুবই স্নেহ করেন। ইদানিং ছেলেটি আশ্রমের নানা কাজে দারুণ ভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। সে যেন ধীরে ধীরে আশ্রমের কর্মযজ্ঞের ওপরের স্তরে উঠে আসছিল ক্রমশ। ছেলেটির নাম শৌভিক।

শৌভিক বলল, আচার আচরণে আশ্রমের ছেলেদের আদর্শের ছাপ তো রাখতেই হবে। সেখানে আঙ্কল স্বয়ং আমাদের আদর্শ। এ ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিধা থাকার কথা নয়। কিন্তু আমার দ্বিধা অন্য জায়গায়। আমার প্রশ্ন, আজকের দিনে একজন সামাজিক মানুষ কি রাজনীতির বাইরে থাকতে পারে? বিশেষ করে ছাত্র-যুবকদের পক্ষে? সক্রিয় রাজনীতিতে না থাকলেও ছাত্র-যুবকদের মধ্যে একটা রাজনৈতিক মতবাদ গড়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক। সমাজের গতিশীলতার কথা মনে রেখে বলতে হয়, এই রাজনৈতিক মতবাদ গড়ে ওঠা কাম্য। স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক বাতাবরণের মধ্যে থেকে রাজনীতিকে দূরে রাখা কখনোই সম্ভব না। যুব-শাখা খোলার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটা অবশ্যই মনে রাখা দরকার।. মনে রাখা দরকার রাজনীতি আমাদের নৈতিক অধিকার।

শৌভিক কথাগুলো যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে বলল। কিন্তু কথাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিউলী আশ্রমের ভবিষ্যৎ কর্মধারার ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণও।

সুতপা এবং ললিতা গম্ভীর এবং নিরুত্তর রইল।

ডবসন কাকা হাসিমুখে তাকালেন দেবজ্যোতির দিকে। দেবজ্যোতি ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে বলল, 'যে-কোনো রাজনৈতিক মতবাদ গড়ে থাকতে পারে। অতীত এবং বর্তমান অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সেই মতবাদ গড়ে ওঠে। এই মতবাদ গড়ে তোলার অধিকার নিশ্চয়ই সকলের আছে। গণতান্ত্রিক দেশে সেই মতবাদের অনুশাসনেই তো সে তার অধিকার ভোটের বাকসে প্রয়োগ করে। এখানে তো কোনো দ্বিমত নেই। আশ্রম যে যা চায় তা' হল সম্পূর্ণ খোলা মন। কেউ কোনো ভাবে আবেগ তাড়িত হয়ে চলবে না। আশ্রমেও এর কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটবে না। ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের মানুষের সঙ্গে কোনো বিবাদ থাকবে না, যেমন ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের মানুষের সঙ্গে থাকবে না কোনো বিসম্বাদ। সমস্ত মানুষকে ভালোবাসাই আমাদের মূল কথা।

শৌভিক একই রকম বিনীত ভঙ্গিতে পাল্টা যুক্তি দিলও,' তবু একটা প্রশ্ন থেকে যায়। ধরুন একজন ছাত্র সক্রিয় রাজনীতি করতে ভালোবাসে আবার আশ্রমের কর্মধারা থেকেও বিচ্যুত হতে চায় না, সে ক্ষেত্রে কি হবে? আশ্রম কি তাকে তাড়িয়ে দেবে?'

এর মধ্যে এক সময় আণ্ট ডরোথী এসে একেবারে পেছনের দিকে বসেছিলেন। আজকাল তিনি শিউলি আশ্রমেই থাকেন এবং বেশিরভাগ সময়টা কাটান আশ্রমের লাইব্রেরীতে। তাঁর জীবনের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা নিয়ে একটা বিশাল বই লিখছেন। অবশ্যই তাঁর মাতৃভাষাতে। রাজনীতি অর্থনীতি সবই এসে পড়ছে সেই লেখার মধ্যে। এসে পড়ছে মানুষের চারিত্রিক বিবর্তনের কথাও। চারিত্রিক বিবর্তনের যে ঝোঁক তিনি লক্ষ করছেন সেটা যে হতাশার কারণ তা-ও তিনি খোলাখুলি ভাবে লিখছেন। এই হতাশার জন্য তিনি মূলত দায়ী করেছেন পৃথিবীর প্রায় সব দেশের রাজনীতি বিদদের। ইউরোপ, আমেরিকার যে-সব দেশে তিনি ঘুরেছেন তার সচিত্র বিবরণও থাকছে তাঁর বইএ। তাঁর ম্যানস্ক্রিপ্টের বেশ কিছু অংশ আমায় পড়িয়েছেন।

শৌভিকের কথা শেষ হতেই আণ্ট ডরোথী পেছনে বসেই বললেন,' রাজনীতি এখনো এক একটা আগুনের গোলার মত বাবা। ইটস লাইক আ ফায়ার-বল। হোয়াটএভার ইট টাচেস গেটস বারন্ট। দেখছো না, রাজনীতি থেকে মানবতা বোধ কেমন দূরে সরে যাচ্ছে। রাজনীতির আগুনে মানুষ কেমন পুড়ছে। একমাত্র মানবতা বোধই মানুষকে বাঁচাতে পারে। দেয়ারস নো অলটারনেটিভ। অর্থনৈতিক সাম্য তো চাই-ই। তার জন্য লড়াই-ও আছে। কিন্তু তার সঙ্গে মানবতার কোনো সংঘাত নেই।

সুতপা এবার বলল, সক্রিয় রাজনীতি যারা করবে তারা তো নির্দিষ্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত থাকবে। তাদের স্থান সেখানেই। এখানে তো নয়।

ললিতা বলল মোট কথা, রাজনৈতিক মতবাদ এবং সক্রিয় রাজনীতিকে এক চোখে দেখা চলতে পারে না।

শৌভিক আর কোনো উত্তর করল না। কিন্তু তার চোখ-মুখ দেখে বোঝা গেল, তাদের কথা পুরোপুরি সে মেনেও নিতে পারল না।

আলোচনা ওখানেই শেষ হয়ে গেল। সকলে উঠে যে যার কাজে চলে গেল। সবার শেষে আণ্ট ডরোথী এবং আমি উঠলাম।

আমরা দুজন নিঃশব্দে পাশাপাশি হাঁটছিলাম। আণ্ট ডরোথী এক সময় প্রায় স্বগতোক্তি করলেন। তাঁকে বলতে শুনলাম, 'একটা ঝড়ের ইঙ্গিত কী পাচ্ছি? বড ভয় হয়। এই আশ্রমের ছেলেদের মনেও রাজনীতির ভাবনা ওঠা কেমন করে সম্ভব হল? সমাজ কি এতই বদলে যাচ্ছে? রাজনীতি তাকে জাপটে ধরছে? এ থেকে মুক্তি নেই কারো? এক দিন কি আর্থারের

এই শিউলি আশ্রমেও রাজনীতির ঝড় উঠবে ?'

সেদিন ডরোথী আশ্চর্য রকমের ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। সত্যিই একদিন ঝড় উঠল শিউলি আশ্রমে। এমন দুরন্ত ঝড় যাতে একটা বিশাল মহীরুহেরও পতন ঘটতে পারে। কিন্তু তা পরের ঘটনা।

ছয়

যতটা আশা করা গিয়েছিল ছাত্র-সমাজ থেকে তার চেয়ে বরং বেশিই সাড়া পাওয়া গেল। মাসদুয়েকের মধ্যেই প্রায় চল্লিশ জন ছেলেমেয়ে এসে গেল শিউলি আশ্রমে। খবর পাওয়া গেল, গ্রামের শাখাগুলোতেও মোটামুটি ভালো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

প্রোগ্রাম অনুযায়ী ছক বেঁধে কাজ শুরু হল। প্রথমে বিষয় নির্বাচন করে তার ওপর প্রথমে পড়াশুনো এবং পরে আলোচনা। খেলাধুলো, গান, আবৃত্তি তো রইলই। সেই সঙ্গে যোগ হল, সমাজ সেবা, যাতে সামাজিক কর্তব্য সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রীরা সজাগ হয়ে উঠতে পারে। এই সেবা মূলত কেন্দ্রীভূত রইল অসহায়, বৃদ্ধ, অনাথ, আতুরের সেবার মধ্যে।

অল্পদিনেই গুটিকয়েক ছেলের মধ্যে যুব-শাখার কাজ-কর্মের ব্যাপারে খুব উৎসাহ চোখে পড়ল। বিশেষ করে গ্রামের গরীব অসহায় মানুষের সেবার কাজে তাদের উৎসাহ সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পেল। এইসব ছেলেদের সবাই খুবই মেধাবী এদের মধ্যে দুজন আবার প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। একজনের নাম তুহিন চ্যাটার্জী, অন্য জনের নাম জিতেশ সরকার। সমাজ সেবা, ডিবেট, আবৃত্তি সব ব্যাপারেই এদের অগ্রণী ভূমিকা। ফলে অল্প দিনেই এরা আশ্রমের অত্যন্ত প্রিয় জন হয়ে উঠল।

ডবসন কাকা একদিন তো সকলের সামনে বলেই ফেললেন, তুহিন আর জিতেশের মতো ছেলেরাই আগামী দিনের আশার আলো।

এর মধ্যে সাতষট্টির নির্বাচন শেষ হল। রাজনৈতিক পটও পরিবর্তন হল এই ফলাফলের মাধ্যমে।

নির্বাচনের এই ফলাফলের জন্য কেউই যেন পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল না। না শাসক দল, না বিরোধী পক্ষ। তাদের সকলের কাছেই, নির্বাচনের এই ফল ছিল প্রায় অপ্রত্যাশিত। সম্ভবত কেবল নির্বাচক মণ্ডলীর কাছেই ছিল এই ফল খুবই প্রত্যাশিত। তাই তারা সর্বত্র উত্তেজনায় ফেটে পড়ল। পথে-ঘাটে

মানুষের মধ্যে অভূতপূর্ব উন্মাদনা চোখে পড়ল। ভোটের মাধ্যমে এমন একটা পরিবর্তন আনা যে সম্ভব এই প্রথম তারা টের পেল।

সাধারণ মানুষের এই উত্তেজনা-উন্মাদনার রেশ এসে পড়ল শিউলি আশ্রমেও। নির্বাচনের অভূতপূর্ব ফলাফলের বার্তা নিয়ে সর্বপ্রথম ছুটে এল তুহিন। সে সুতপার কাছে ছুটে গিয়ে বলল, 'সুতপাদি, সাধারণ মানুষ আজ অঘটন ঘটিয়েছে।'

সুতপা কথাটার অর্থ ভালো ভাবে বোঝার আগেই আবার সে বলল, সেদিন আমি কফি-হাউসে বসে বন্ধুদের যা বলেছিলাম আজ তা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল।

সুতপা সামান্য অবাক হয়েই বলল, 'কি বলেছিলে তুমি? কোন কথা মিলে গেল?'

তুহিন দু'হাত নেড়ে উত্তেজিত ভাবেই বলল, 'বলেছিলাম, এবারকার জেনারেল ইলেকশনে সাধারণ মানুষ সব রাজনৈতিক হিসেব-নিকেশ ওলট-পালট করে দেবে। আর কিছু না পারুক, একটা একসপেরিমেন্ট তারা করবেই। দেখুন আমার কথা ফলল কিনা?'

সুতপার কানে তখনো কফি-হাউসের সেই ছেলেটির কথা প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

তুহিনের এ-কথার একটাই অর্থ দাঁড়ায়। ত'হল, সেদিন যে-ছেলেটির কথা শুনে সুতপা মনে মনে যুবশাখা খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, অপরিচিত সেই ছেলেটি আর কেউ নয়, আজকের এই তুহিন। কথাটা মনে হতেই সুতপার মনটা এক অকারণ আনন্দে ভরে উঠল। সে উত্তেজিত ভাবেই বলে উঠল, 'মাই গুডনেস! সেদিন কফি-হাউসে বসে এ-রকম একটা কথা তুই বলেছিলি? এবং তোর কথাতেই—আশ্চর্য, তোকে আমরা কেউ চিনতে পারিনি!'

সেই মুহূর্তে তুহিনকে সুতপার এত আপন মনে হল যে সে সঙ্গে সঙ্গে 'তুমি' থেকে 'তুই'-এ নেমে এল।

তুহিন সহাস্যে বলল, 'আপনারা চিনতে না পারলে কি হবে? আমি আপনাদের ঠিক চিনেছিলাম। দোতলায় বাঁ দিকে কোণ ঘেঁষে বসেছিলেন তো? আপনি, ললিতাদি, দেবুদা?'

সুতপা সামান্য অবাক হয়ে বলল,' স্ট্রেঞ্জ! সেদিন তুই আমাদের দেখেছিলি, অথচ কখনো বলিসনি তো?'

তুহিন সলজ্জ ভঙ্গিতে হাসল কেবল।

পরদিন তুহিন এবং জিতেশ একটা কাণ্ড করে বসল। বেশ কিছু বাজি এবং পটকা নিয়ে এল শিউলি আশ্রমে। তুহিন এবং জিতেশই কেবল না, তাদের সঙ্গে ছিল যুব শাখার বেশ কিছু ছেলেমেয়ে। আর ছিল সৌভিক।

যুব-শাখার প্রধান দায়িত্ব যেহেতু সুতপার, তুহিনরা তাকেই এসে অনুরোধ করল,' সুতপাদি আপনি অনুমতি দিন, আজ আমরা বাজি-পটকা ফাটিয়ে আনন্দ করব।'

'আনন্দ? সে-তো খুব ভালো কথা। কিন্তু হঠাৎ বাজিটাজি ফাটিয়ে আনন্দ করতে যাবে কেন? কারণটা কি?' সুতপা সামান্য অবাক হয়েই প্রশ্ন করল।

বেশ কয়েকজন ছেলেমেয়ে প্রায় একসঙ্গে গলা মিলিয়ে বলল, 'বাইরে আজ সবাই আনন্দে মেতে উঠেছে। বিক্ষুব্ধ মানুষ কেমন সব বদলে দিল দেখুন।'

জিতেশ বলল, 'জনরোষে কালকের রাজাকে আজ কেমন ধুলোয় নেমে আসতে হল। এটা কি কম ব্যাপার?'

তুহিন বলল, 'আরো আছে। আমাদের দেশের মানুষ যে কত সজাগ এবারকার ভোটে তা-ও প্রমাণিত হয়ে গেল। এই সচেতনতার জন্যই আনন্দ।'

সুতপা হাসি মুখে মেনে নিল ওদের কথা।

অতএব যুব-শাখার ছেলেমেয়েরা বাজি পোড়াতে লাগল, পটকা ফাটাতে লাগল। শিউলি জনকল্যাণ আশ্রমে একটা উৎসবের মেজাজ এল।

কিন্তু এই উৎসবে বাধা হয়ে দাঁড়ালেন স্বয়ং ডবসন সাহেব। তিনি সবাইকে ডেকে বললেন, 'ব্যাপারটা কি? তোমাদের এই উৎসবের আয়োজন কিসের জন্য? একটা রাজনৈতিক দল হেরেছে বলে, না, আর একটা রাজনৈতিক দল জিতেছে বলে? কিন্তু তার জন্য কি এ-ভাবে উৎসব করতে হয়? গণতন্ত্রের এটাই তো নিয়ম। সাধারণ মানুষ যাকে অপছন্দ করবে তাকে নিঃশব্দে সরিয়ে দেবে। তা নিয়ে হৈচৈ-উৎসবের তো কোনো মানে নেই। এতে রেশারেশির ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। আর এই রেশারেশির ফল কখনো ভালো হতে পারে না।'

সুতপা তুহিনদের পক্ষ নিয়ে বলল, 'কিন্তু ওরা অন্য যুক্তি দিচ্ছিল।'

ডবসন কাকা হাসি মুখে তাকালেন সুতপার দিকে। আমার দিকেও তাকালেন এক ঝলক।

আমার মনে হল আঙ্কল ডবসনের চোখ দুটো হঠাৎ যেন একটু চিক-চিক করে উঠল।

তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'ওদের মুক্তিটা কি সুতপা?'

সুতপা হাসি মুখে বলল, 'দেশের মানুষ যে কত সজাগ, কত সচেতন এবারকার জেনারেল ইলেকশনে সেটাই প্রমাণিত হয়েছে। দেশের মানুষের এই সচেতনাকে বাহবা দিতেই তারা উৎসব করতে চাইছে।'

সুতপার কথায় হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়লেন ডবসন কাকা। তিনি বললেন, 'তোমরা কেবল দেশ দেশ কোরে চিৎকার কোরো না তো। জানো না দেশ কথাটার মধ্যে সঙ্কীর্ণতার অবকাশ আছে? আসল কথা হল মানুষ।'

তুহিন, জিতেশ এবং অন্যান্যদের মুখের ওপর চোখ বুলোতে গিয়ে লক্ষ করলাম, তুহিনের চোখ দুটো হঠাৎ যেন একবার জ্বলে উঠল। পরক্ষণেই অবিশ্যি আবার আগের মত স্বাভাবিক হয়ে গেল।

ডবসন কাকা কি ভেবে এগিয়ে গেলেন তুহিনের কাছাকাছি। তার কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে বললেন, 'তোমাদের ফিলিং আমি বুঝতে পারছি। তারুণ্যের ধর্মই যে এই, হৈহৈ করে সে আনন্দের প্রকাশ করতে চায়। সামান্যতেই উত্তেজনা আসে। কিন্তু, বাবা, আসল কথাটা ভুললে তো চলবে না। মানুষ মানুষের কথা ভাববে। কোথাও কোনো রেশারেশি থাকবে না, এই বোধ সৃষ্টি করাই তো আমাদের সাধনা। মানুষ মানে কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিবেশের মানুষ না। কোনো বিশেষ রঙের মানুষও না। মানুষ মানে মানুষ। সমগ্র বিশ্বের মানুষ। সাদা কালো সবাইকে আপন করে নিতে হবে।

ডবসন কাকা সুতপার দিকে তাকিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললেন, আই এ্যাম নট এ্যাকিউজিং ইউ। আমি তোমাদের আদেশও দিচ্ছি না। আশ্রম তো তোমাদেরই। আমি কেবল তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি তোমাদের ব্রতের কথা; তোমাদের সাধনার কথা।

সুতপাও শান্ত কণ্ঠে বলল, আমার ভুল হয়েছিল, আঙ্কল। আমি এতটা তলিয়ে ভাবিনি।

সাতষট্টির সেই ঘটনার পর যুব-শাখাকে কেন্দ্র করে শিউলি আশ্রমে আর কোনো ঘটনা ঘটেনি। সুতপা এর মধ্যে যুব-শাখার ছেলে মেয়েদের নিয়ে

কয়েকটা জেলার ব্রাঞ্চ অফিসে ঘুরে এসেছে। জেলায় জেলায় ঘুরে ব্রাঞ্চ অফিসের বিভিন্ন উৎসব আনন্দে যোগ দিয়ে যুব-শাখার ছেলে-মেয়েরাও খুশি।

সবই চলছিল নিয়ম মেনে। সুশৃঙ্খলভাবে।

তবু এই আপাত শৃঙ্খলার আড়ালে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী একটা শক্তি গোপনে গোপনে সক্রিয় হয়ে উঠছিল। সেই গোপন শক্তির কথা অনেকেই জানতে পারেনি। কেবল ললিতা মাঝে মধ্যে বলতো, 'আজকাল মনের মধ্যে কি একটা ভয় ঢুকেছে। মনে হয়, হঠাৎ শিউলি আশ্রমে কিছু একটা ঘটে যেতে পারে। কেন এই ভয় বুঝতে পারি না।'

দেবজ্যোতিও ললিতার কথার প্রতিধ্বনি করে এক দিন বলল, 'ললিতার ভয়টা অমূলক না-ও হতে পারে। কারণ, আজকাল প্রায়ই এমন সব ছোটখাট ঘটনা চোখে পড়ে, আশ্রমের মধ্যে আগে যা কখনো চোখে পড়ত না।'

একটু থেমে যোগ করল, 'প্রায়ই দেখি, শৌভিক, তুহিন, জিতেশ এবং আরো কয়েকজন আশ্রমের আনাচে কানাচে জড়ো হয়ে কি সব আলোচনা করে। আমাদের কাউকে দেখলেই এদিক ওদিক সরে যায়। প্রশ্ন করলে উত্তর এড়িয়ে যায়। কখনো বাইরের দু'এক জন ছেলেও ওদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দেয়। তাছাড়া সন্ধ্যের অন্ধকারে যে সব ঝোপে ঝাড়ে জোনাকি জ্বলে, আজকাল প্রায়ই সেই সব ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে জোনাকির সঙ্গে বেশ কিছু সিগারেটও পুড়তে দেখা যায়। এসব কিসের ইঙ্গিত কে জানে!

সাত

এদিকে রাজনীতির গঙ্গা দিয়ে ততদিনে অনেক জল বয়ে গেছে। সাতষট্টির একুশে নভেম্বর যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটেছে। তারপর এক জগাখিচুড়ি সরকার এসেছে আবার দ্রুত চলেও গেছে, শুরু হয়েছে রাজ্যপালের শাসন। এবং শেষে উনসত্তরের ফেব্রুয়ারীতে ঘটেছে যুক্তফ্রন্টের প্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তন।

যুক্তফ্রন্ট সরকারের দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তনে আবার দেখা গেছে রাস্তায় রাস্তায় উদ্বেল জনতার ভিড়। কিন্তু বাইরে উত্তেজনা থাকলেও শিউলি আশ্রমের কোথাও কোনো রকম উত্তেজনা চোখে পড়েনি। তুহিনদেরও আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি আর।

শিউলি আশ্রমে শান্তি বজায় থাকলেও দেশের অন্যত্র কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিল। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে বেশ কিছু ছাত্র-যুবক, শ্রমিক-কৃষক দেশেরআর্থ-সামাজিক কাঠামো দ্রুত বদলাবার জন্য মরীয়া হয়ে

উঠল। কিন্তু কেন্দ্র বা রাজ্য কেউই এই মরীয়া ভাবকে আমল দিতে চাইল না। এর অবশ্যম্ভাবী ফল দাঁড়াল সঙ্ঘর্ষ। অসম সঙ্ঘর্ষ।

এই রকম রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যেই সুতপা-ললিতা দেবজ্যোতি যুব-শাখার ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটা নাটক মঞ্চস্থ করার পরিকল্পনা করল। প্রথমে কথা ছিল 'টেমপেস্ট' নাটক মঞ্চস্থ করা হবে। এবং প্রসপারোর ভূমিকায় অভিনয় করবেন স্বয়ং আর্থার ডবসন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই পরিকল্পনা বাতিল হল। ঠিক হল, রবীন্দ্রনাথের "রাজা" মঞ্চস্থ করা হবে। ঠাকুর্দার ভূমিকায় ডবসন কাকা!

এক রবিবার এই নাটকের ফুল রিহার্সাল চলছিল। রিহার্সালে আমিও উপস্থিত ছিলাম, যদিও অভিনয়ে আমার কোনো অংশ ছিল না। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ না করলেও তুহিন, জিতেশ এবং শৌভিকও সেখানে উপস্থিত ছিল।

নাটক প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন। একটা পথের দৃশ্য অভিনীত হচ্ছে। দৃশ্যটা এই রকম।

রাজার খোঁজে কাঞ্চীরাজ পথে বেরিয়েছেন। পথে বেরিয়েছেন ঠাকুরদাও। পথে কাঞ্চীরাজ এবং ঠাকুরদার মধ্যে কথাবার্তা চলছে।

ঠাকুরদা। তা হোক, যে যত বড়ো রাজাই হোক, হার-মানার কাছে তাকে হার মানতেই হবে। কিন্তু রাজন্, রাত্রে বেরিয়েছ যে?

কাঞ্চী। ঐ লজ্জাটুকু এখনো ছাড়তে পারিনি। কাঞ্চীর রাজা থালায় মুকুট সাজিয়ে তোমার রাজার মন্দির খুঁজে বেড়াচ্ছে এই যদি দিনের আলোয় লোকে দেখে তা হলে সে তারা হাসবে।

ঠাকুরদা। লোকের এই দশা বটে। যা দেখে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যায়, তাই দেখেই বাঁদররা হাসে।

কাঞ্চী। কিন্তু ঠাকুরদা, তোমার এ কী কাণ্ড! সেই উৎসবের ছেলেদের এখানেও জুটিয়ে এনেছ? কিন্তু সেখানে যারা তোমার পিছে পিছে ঘুরত তাদের দেখছিনে বড়ো।

ঠাকুরদা। আমার শম্ভু-সুধনের দল? তারা এবার লড়াই-এ মরেছে।

কাঞ্চী। মরেছে?

ঠাকুরদা। হাঁ, তারা আমাকে বললে, ঠাকুরদা, পণ্ডিতরা যা বলে আমরা কিছুই বুঝতে পারিনে, তুমি যে গান গাও তার সঙ্গেও গলা মেলাতে পারিনে, কিন্তু একটা কাজ আমরা করতে পারি - আমরা মরতে পারি! আমাদের যুদ্ধে নিয়ে যাও জীবনটা সার্থক করে আসি।

তা, যেমন কথা তেমন কাজ। সকলের আগে গিয়ে তারা দাঁড়াল,
সকলের আগেই তারা প্রাণ দিয়ে বসে আছে।

কাঞ্চী। সিধে রাস্তা ধরে সব বুদ্ধিমানদের চেয়ে এগিয়ে গেল আর কি।…

ঠিক এই মুহূর্তে বাইরে থেকে দুটি ছেলে প্রায় দৌড়ে এসে তুহিন এবং জিতেশের কানে কানে কি যেন বলল। ছেলে দুটির কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তুহিন এবং জিতেশের চোখে মুখে আতঙ্কের চিহ্ন ফুটে ওঠে। অন্য কারো হয়তো ব্যাপারটা ঠিক চোখে পড়ল না। আমি কিন্তু রিহার্সালে আর মন দিতে পারলাম না। ওদের ওপরই আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ রইল।

তুহিনরা কোনো দিকে তাকাল না আর। ছেলে দুটির কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। কোনো দিকে না তাকিয়ে কাউকে কিছু না বলে ওরা চারজন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কেবল যাবার সময় সৌভিককে চোখের ইশারা করল। ওরা বেরিয়ে যেতেই সৌভিকও অনুসরণ করল ওদের।

আমি জানালা দিয়ে লক্ষ্য করলাম, তুহিনরা বাইরে বেরিয়েই গঙ্গার দিকে দৌড়তে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাছপালা-ঝোপঝাড়ের আড়ালে হারিয়ে গেল ওরা।

তুহিনরা দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যাবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই আর একটা ঘটনা ঘটল, যে ঘটনার জন্য আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না।

পুলিশের একটা জীপ সোজা চলে এল শিউলি আশ্রমের ভেতরে। তিন জন পুলিশ অফিসার গাড়ি থেকে নেমে সোজা চলে এল রিহার্সাল রুমে।

তাদের চলাফেরা দেখে স্পষ্টই বোঝা গেল, আশ্রমের অভ্যন্তর সম্বন্ধে তারা খুবই ওয়াকিবহাল। এবং কখন কে কোথায় থাকতে পারে সেটাও তাদের ভালো করেই জানা। অর্থাৎ তারা সব কিছু ভালোভাবে জেনেই এই সময়টা বেছে নিয়েছে।

অফিসার-ইন-চার্জ ঘরে প্রবেশ করে মৃদু হেসে বলল, 'উই আর সরি টু ডিসটার্ব ইউ স্যার। উই জাস্ট সিক ইওর কো-অপারেশন।'

ডবসন কাকার চোখ মুখ দেখে বোঝা গেল হঠাৎ পুলিশের আবির্ভাবে তিনি খুবই অবাক হয়েছেন। অফিসারের কথার উত্তরে তিনি বললেন, 'বলুন কি ব্যাপার।'

অফিসারটি বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'আপনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। আপনাদের আশ্রমেরও যথেষ্ট সুনাম। তবু আমরা এখানে এসে আপনাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হচ্ছি। সত্যিই আমাদের কোনো উপায় ছিল না।'

ডবসন কাকা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

অফিসারটি নিজেই আবার বললেন, 'আমাদের কাছে খবর আছে, এমন কিছু ছেলে আপনাদের এই আশ্রমে থাকে, অথবা রেগুলার এখানে যাতায়াত করে, যারা উগ্র রাজনীতির সমর্থক। ইন্ ফ্যাক্ট এই ছেলেরা খুনোখুনির রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। ওদের এগেনস্টে ডেফিনিট চার্জ আছে। আমাদের কাছে খবর আছে, ওরা এই মুহূর্তে এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে। ওদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আপনাদের কো-অপারেশন চাইছি।'

একটু থেমে অফিসারটি ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর বলল, 'আশাকরি এই সব ছেলেদের এখানে থাকতে দিয়ে আপনারা আপনাদের আশ্রমের পবিত্রতা নষ্ট করবেন না।'

ডবসন কাকা শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'আপনারা যাদের খুঁজছেন তারা যে এই আশ্রমেরই ছেলে তা কি করে জানলেন ?'

'জানি বৈকি স্যার। আমাদের সব খবরই রাখতে হয়। তাছাড়া আপনার মতো মানুষকে অকারণে হ্যারাস করতে যাব কেন ?' ভদ্রলোক কথা বলতে বলতে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে সামনে মেলে ধরে বললেন, 'এখানে নয় জনের নাম আছে। এর মধ্যে তিন জন আপনার আশ্রমের। উই হ্যাভ পজিটিভ প্রুফ।'

অফিসারটি আশ্রমের যে-তিনজনের নাম বলল তারা হল ওই তুহিন, জিতেশ এবং সৌভিক।

নামগুলো পড়া হলে উপস্থিত সকলে নিঃশব্দে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। কিন্তু কেউ কোনো কথা বলল না।

ডবসন কাকা গম্ভীর মুখে কি একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, 'আপনারা তাদের চেনেন নিশ্চয়ই ?'

—চিনি বৈকি!

—এখানে কি তাদের দেখতে পাচ্ছেন ?

অফিসারটি এবার অসহিষ্ণুভাবে বললেন, 'না দেখতে পাচ্ছি না। তবে এখানে দেখতে পাচ্ছি না বলেই প্রমাণ হয় না যে, ওরা আশ্রমের কোথাও লুকিয়ে নেই।

ডবসন কাকা এবার থমথমে গলায় বললেন, 'আমরা বলছি, তারা এখানে নেই, এটাই কি সাফিসিয়েণ্ট প্রুফ নয় যে, সত্যিই তারা এখানে নেই ?'

অফিসারটি এবার মৃদু হেসে বলল, 'স্যার, আপনি সকলের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন,

কাজেই আপনার কথা অমান্য করতে পারছি না, অন্তত এই মুহূর্তে। এখনকার মতো ফিরেই যাচ্ছি, তবে সেই সঙ্গে সাবধান করছি, এই সব বিপজ্জনক ছেলেদের কোনো রকম প্রশ্রয় দেবেন না। এতে আপনার আদর্শ তো ক্ষুণ্ন হবেই, আপনার এতদিনের আশ্রমেরও অকল্যাণ হবে। এই মুহূর্তে আমাদের আর কিছু বলার নেই। ডিসিশন ইজ ইওরস।

পুলিশের দলটি চলে গেল, কিন্তু পেছনে ফেলে গেল বিষণ্ণতার ছায়া।

এরপর রিহার্সাল আর জমল না। সবারই মন ভেঙে গিয়েছিল। সবাই যে-যার কাজে চলে গেল। যুব-শাখার ছেলেমেয়েরাও এক এক করে আশ্রম ছেড়ে চলে গেল। কেবল ঘরের মধ্যে রয়ে গেলাম আমরা ক'জন। ললিতা, দেবজ্যোতি, সুতপা, ডবসন কাকা এবং আমি। আমরা সবাই নিঃশব্দে বসে রইলাম অনেকক্ষণ।

সেদিন আর বাড়ি ফেরা হল না। আশ্রমেই রয়ে গেলাম। আশ্রমে থাকলে ডবসন কাকার পাশের ঘরটিতেই আমার থাকার জায়গা হয়। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না।

দেবজ্যোতি মাঝে মধ্যে যে-কথা ভেবে আতঙ্কিত হত, ললিতার মনের মধ্যে যার জন্য এক ধরণের আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। সেই আতঙ্ক, সেই আশঙ্কার মূলে সত্যিই যে জোরালো কারণ ছিল তা' টের পাওয়া গেল সেই রাত্রেই।

তুহিন, জিতেশ এবং শৌভিকের সঙ্গে একটি রাজনৈতিক দলের গভীর যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল। এই দলের একাংশ চেয়েছিল, সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের আমূল বদল ঘটাতে। তুহিনরা সেই মতাদর্শেই বিশ্বাসী ছিল। তারা ভেতরে ভেতরে প্রস্তুত হচ্ছিল তাই। আর এই প্রস্তুতিপর্বে প্রয়োজন ছিল অস্ত্রের। সেই জন্য তারা অস্ত্রও সংগ্রহ করতে শুরু করেছিল। স্বাভাবিক নিয়মেই সেই অস্ত্র আসছিল বে-আইনি পথে। কিন্তু অস্ত্র কেবল সংগ্রহ করলেই তো হয়না। সেই অস্ত্র গোপন এবং নিরাপদ জায়গায় মজুত করে রাখারও প্রয়োজন থাকে। তুহিনদের দলের লোকজন শিউলি আশ্রমকেই সেই গোপন এবং নিরাপদ জায়গা হিসেবে বেছে নিয়েছিল। শৌভিকের ঘরটাই হয়ে উঠছিল তাদের গোপন অস্ত্রাগার। সাইড ব্যাগে অথবা এ্যাটাচির মধ্যে চলে আসত সেই সব অস্ত্র। কেউ কখনো ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করেনি। কেবল পুলিশের আকস্মিক আবির্ভাবেই সেই সন্দেহ দেখা দিল। বিশেষ করে ডবসন কাকার মনের মধ্যে। তবে ডবসন কাকার মনের মধ্যে এই রকম একটা উঁকি দিয়েছিল তা' সেই মুহূর্তেই বোঝা যায়নি। বোঝা গিয়েছিল অনেক পরে।

অনেক রাত পর্যন্ত সবাই অপেক্ষা করল, কিন্তু শৌভিক ফিরল না।

রাত্রে এক এক করে সবাই যখন শুয়ে পড়ল তখনো একা জেগে রইলেন ডবসন কাকা।

আমার ঘুম আসছিল না। এক সময় বাইরে বেরিয়ে দেখি, ডবসন কাকা বারান্দায় পায়চারি করছেন। আমাকে বেরিয়ে আসতে দেখেও একইভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। তাঁর চোখ মুখ দেখে বুঝতে পারছিলাম একটা প্রচণ্ড ঝড় তাঁকে ভীষণভাবে নাড়া দিচ্ছে। অনেক চেষ্টা করেও সে ঝড়টাকে তিনি কিছুতেই শান্ত করতে পারছেন না।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ঝঞ্ঝা-তাড়িত এক মহীরুহকে লক্ষ করতে লাগলাম আমি।

পায়চারি করতে করতে এক সময় আমার কাছাকাছি এসে দাঁড়ালেন তিনি। তাঁর চোখে মুখে প্রকাশ পাচ্ছিল কোনো স্নেহাস্পদকে হারাবার ভয়। অনুচ্চ কণ্ঠে প্রায় নিজেকে শোনাবার মতো করে বললেন, 'আমরা কিসের ওপর দাঁড়িয়ে আছি? ভবিষ্যৎ সমাজ কিসের ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে? আমার ছেলেরা এমন করে অবিশ্বাসী হয়ে গেল? ওরা একটা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে গভীর ভাবে যোগাযোগ রেখে চলছে, অথচ আমাকে কিছুই বুঝতে দেয়নি। আমাকে ফাঁকি দিয়ে ওরা প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনীতি করছে।'

একটু থেমে যোগ করলেন, 'ওদের কি আমি তেমন করে ভালোবাসতে পারিনি? আমার চিন্তায় ভাবনায় আদর্শে কি কোনো ফাঁকি আছে? নইলে ওরা আমাকে দূরে ছুঁড়ে দিতে পারল কি করে?'

এই রকম পরিস্থিতিতে কিছু একটা বলা উচিত ভেবেই আমি বললাম, 'আপনার আদর্শে ফাঁকি থাকবে কেন? আরো সবাই তো আছে। আসলে ওরা ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম সব সময়ই থাকতে পারে। তাছাড়া আরো একটা কথা। হয়তো সেটাই বড় কথা। ওরাও তো দেশের জন্য দশের জন্য কিছু একটা করতে চাইছে। ওদের কাজের মধ্যে হয়তো কিছুটা আবেগ আছে, তবু ওদের প্রচেষ্টা যে সৎ সেটা তো মানতেই হবে।'

ডবসন কাকা একটু যেন উত্তেজিত হলেন। বললেন, 'ওদের প্রচেষ্টা অসৎ তা-তো বলছি না। বলতে চাইছি, এমন কোন্ বৃহত্তর আদর্শ ওদের টানল যা' আমার আদর্শকেও ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তুমি বলছো, আবেগ। ভয় তো সেখানেই। বেশি আবেগ তো অনেক সময় মানুষকে আদর্শভ্রষ্ট করে তোলে। ওরা বল প্রয়োগ করে দেশের অন্যায় দূর করতে চাইছে। কিন্তু কার ওপর বলপ্রয়োগ করতে চাইছে? কেবল শাসক-গোষ্ঠির ওপর বল প্রয়োগ করলেই

কি সব অন্যায় দূর হয়ে যাবে? তা' কি যায়? তাছাড়া পশু-শক্তির ওপর নির্ভর করতে থাকলে একদিন পশু-শক্তিও যে মানুষকে গ্রাস করে ফেলে। সেটাও তো ভাবনার বিষয়।

সামান্য সময় পায়চারি করে আবার বললেন, 'তুহিন জিতেশ, শৌভিকের মতো ছেলেরাও যদি পশু-শক্তিকে সহায় হিসেবে গ্রহণ করে তাহলে ভবিষ্যৎ সমাজ কিসের ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে?'

এই প্রসঙ্গে আর কি বলা যেতে পারে ভেবে পেলাম না। তাই বললাম, 'পুলিশ হয়তো ভুল খবর পেয়েছে। ওরা সত্যিই হয়তো খুনোখুনির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নয়।'

ডবসন কাকা বিষণ্ণ হাসি হাসলেন। সামান্য সময় চুপ থেকে বললেন, 'তুমি এবার শুতে যাও।'

বুঝলাম তিনি একা থাকতে চাইছেন। এলাম তাই।

চোখে ঘুমের ছিটেফোঁটা ছিল না। তাই ঘুমের বৃথা চেষ্টা না করে জানালার বাইরে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে বসে রইলাম। এখান থেকে আশ্রমের অনেকখানি দেখা যায়।

আশ্রমটা এখন নিঝুম। সারা দিনের কর্মচাঞ্চল্যের পর এখন সবাই ঘুমে অচেতন। কোথাও কোনো সাড়া নেই তাই। কৃষ্ণপক্ষের রাত বলে চারদিকটা ভালো দেখাও যায় না। অনুভবে বুঝে নিতে হয় অনেকখানি।

আশ্রমের চার দিকে চোখ বুলোতে বুলোতে একটা জায়গায় চোখ আটকে গেল। মনে হল অন্ধকার যেন সেখানে আরো বেশি জমাট বেঁধে আছে। পরক্ষণেই মনে হল, না অন্ধকার না, কয়েকটা ছায়ামূর্তি। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অথচ দ্রুত বেগে হাঁটছে তারা। ওই ছায়া-মূর্তিগুলোকে দেখে আমার বুকটা হঠাৎ কেঁপে উঠল। ললিতা দেবজ্যোতির আশঙ্কার কথা মনে পড়ে গেল।

এবার আরো একটা ছায়ামূর্তি চোখে পড়ল। ডবসন কাকার বারান্দার দিক থেকে অত্যন্ত দ্রুত বেগে এগিয়ে চলল সেই ছায়া-মূর্তি যে আসলে ডবসন কাকা আমার তা বুঝতে অসুবিধে হল না। কিন্তু তিনি কোথায় চলেছেন? তিনি কি দেখেছেন অন্য ছায়া-মূর্তিগুলোকে। তিনি কি বুঝতে পেরেছেন ওরা কারা?

আমি আর কিছু না ভেবে বেরিয়ে পড়লাম ঘর থেকে। নিঃশব্দে ডবসন কাকাকে অনুসরণ করতে লাগলাম। সামান্য এগোতেই মনে হল, আরো একজন কাকার পেছনে। একটু ঠাহর করতেই বুঝতে পারলাম রে সুতপা। আমি আমি অবিশ্যি সাড়া দিলাম না।

আরো কিছুটা অগ্রসর হতেই ছায়া-মূর্তিগুলোর ভেতর থেকে একটা চাপা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। চাপা গলায় কেউ বলে উঠল, 'আঙ্কল, প্লিজ, আর এগোবেন না।' গলার স্বর পরিচিত মনে হল না।

উত্তরে ডবসন কাকাও চাপা গলায় বললেন, তোমরা কারা? কি চাও এখানে?'

এবার একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সেই কণ্ঠস্বর তুহিনের। সে চাপা গলায় বলল, 'আঙ্কল, প্লিজ ফিরে যান। পুলিশের দল গোটা আশ্রমকে ঘিরে রেখেছে। আমাদের মতো কাজ করতে দিন।'

তুহিনের কথা শেষ হতেই সুতপার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সে বলল, 'আঙ্কল, সম্ভবত ওদের সঙ্গে বোমা টোমা আছে। ফিরে চলুন। চুপ করে দেখা ছাড়া এখন আমাদের আর কিছু করার নেই। ঘটনাই তার নিজের গতি-পথ ঠিক করে নেবে।

ডবসন কাকা দৃঢ় গলায় বললেন, 'আমার ছেলেরা ভুল করে বিপদের ঝুঁকি নেবে, আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা' দেখব, এ-জিনিষ হতে পারে না।'

ডবসন কাকার কথা শেষ হতে না হতেই আশ্রমের বাইরে বোমার শব্দ শোনা গেল, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশের বাঁশি ও বন্দুকের গুলির শব্দ।

তুহিনদের দল আর কথা বাড়াল না। আরো দ্রুত পায়ে গঙ্গার দিকে এগোতে লাগল। ডবসন কাকা তাদের অনুসরণ করতে করতেই বললেন, 'কেন তোমরা অকারণ ঝুঁকি নিচ্ছ? ফিরে এসো। আমি তোমাদের হয়ে লড়ব।'

তুহিনরা সাড়া দিল না। যেমন হাঁটছিল তেমনি হাঁটতে লাগল।

হঠাৎ আশ্রমের মধ্যে পুলিশের বুটের শব্দ শোনা গেল। এক সঙ্গে অনেকের। স্পষ্ট বোঝা গেল, যেকোনো উপায়েই হোক পুলিশের দল আশ্রমের ভেতর প্রবেশ করেছে।

সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য বুঝতে পেরে আরো অগ্রসর হওয়া অনুচিত মনে করলাম আমি। চাপা গলায় বললাম, 'আর এগিও না। ওরা তোমাদের কথা শুনবে না।'

আমিও যে অনুসরণ করছি সুতপা এতক্ষণ তা টের পায়নি। আমার ডাকে তাই অবাক হয়ে ঘুরে দাঁড়াল। বলল, 'তুমিও বাইরে বেরিয়েছ?

ঠিক এই সময় পেছন থেকে একজন পুলিশ অফিসার গম্ভীর গলায় ঘোষণা করল, 'তুহিন, শৌভিক, তোমরা পালাতে চেষ্টা কোরো না। পালাতে চেষ্টা করলেই আমরা তোমাদের গুলি করব।'

তুহিনরা পুলিশের সে-কথায় কর্ণপাত করল না। গঙ্গার ধারের গাছ-গাছালির আড়াল লক্ষ করে দ্রুত দৌড়তে লাগল। পুলিশের তরফ থেকে কোনো রকম বাধা আসার আগেই একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। তুহিনদের দলের একজন হুমড়ি খেয়ে সামনে পড়ে গেল। এবং স্পষ্ট করে কিছু বোঝার আগেই একটা বিকট শব্দে গোটা শিউলি আশ্রম থরথর করে কেঁপে উঠল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন ডবসন কাকা।

আমি এবং সুতপা ডবসন কাকার দিকে ছুটে যাবার মুহূর্তে পুলিশের অনেকগুলো টর্চ প্রায় এক সঙ্গে জ্বলে উঠল। আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখলাম, ডবসন কাকার রক্তাক্ত, নিস্পন্দ দেহটা মাটিতে পড়ে আছে। অদূরে বোমার আঘাতে তুহিনের ছিন্নভিন্ন দেহ।

তুহিনের অন্যান্য সঙ্গীদের কাছাকাছি কোথাও দেখা গেল না। বোঝা গেল না। বোঝা গেল, তুহিনের সঙ্গীরা, হয় অনাহত অবস্থায়, কিম্বা আহত হয়েও, পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছে।

ইতিমধ্যে আশ্রমের সবাই জেগে গেছে। বোমার শব্দে হৈ হৈ চৈচৈ শুরু হয়েছে চার দিক। অনেকেই ছুটে এসেছে ঘটনাস্থলে। দেবজ্যোতি ললিতা এবং অন্যান্যরা। এসেছেন ডরোথীও।

ঘটনার আকস্মিকতায় আশ্রমবাসীদের সঙ্গে পুলিশ দলও বিভ্রান্ত। তাদের একজন দেবজ্যোতিকে বলল, 'হাতে বোমা ছিল। পড়ে গিয়ে ফেটে গেছে। ওর অনেক দিন থেকেই এই আশ্রমটাকে ওদের একটা ঘাঁটি তৈরি করার চেষ্টা করছিল। শৌভিক ইজ দ্য মেইন এজেন্ট। সে পালিয়ে গেছে। এনিওয়ে ধরা সে পড়বেই। তবে এই দুর্ঘটনার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। এই বেদনাদায়ক ঘটনার জন্য আমরা একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না।'

এসব কথা শুনবার মতো মনের অবস্থা তখন কারো নয়। হাতে সময়ও নেই। সেই মুহূর্তে ডবসন কাকাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

অবিশ্যি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে পুলিশই সব রকম সাহায্য করল।

তিন দিন ধরে ইনটেনসিভ কেয়ারে অনেক রকম চেষ্টা করা হল, কিন্তু কিছুতেই হল না। ডবসন কাকার জ্ঞান আর ফিরল না।

ডবসন কাকা মারা গেলেন।

আশ্চর্য, কত সহজে কথাটা বলা গেল! তবু কথাটা কেউ যেন বিশ্বাসই করতে পারছিল না। শিউলী আশ্রম আছে, আমরা সবাই আছি, অথচ ডবসন কাকা নেই, এটা যেন ভাবাই যায় না। কিন্তু মানুষ যা ভাবতে পারে না, কিন্তু তা-ও তো ঘটে। এখনো তা-ই ঘটল। ডবসন কাকা রইলেন না।

হাসপাতাল থেকে লরীতে করে তাঁর মর-দেহটা আনা হল শিউলি আশ্রমে। তাঁর প্রিয় বকুলতলায় দেহটি শুইয়ে রাখা হল। এমনভাবে রাখা হল, যাতে সবাই তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারে।

ডবসন কাকার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি অবাক না হয়ে পারলাম না। ভূমিশয্যায় শায়িত হয়েও ডবসন কাকাব মুখে অদ্ভুত এক মসৃণ হাসি লেগে রয়েছে। হওতো এই হাসিই স্বর্গীয় হাসি।

দেবজ্যোতি—ললিতা—সুতপা কারো মুখে কোনো কথা ছিল না। চোখে জলও না। শোকের প্রচণ্ডতায় তাদের অনুভূতিগুলো কেমন যেন ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল। যন্ত্রের মতো সমস্ত কাজ করছিল কেবল।

আশ্রমের অন্যান্যরা হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগল। পিতৃশোকে অনাথ বালক-বালিকারা যেমন করে কাঁদে।

এক মাত্র ডরোথী ছিলেন অত্যন্ত স্বাভাবিক। তিনি স্বাভাবিক ভাবেই এক সময় বললেন, 'যে অশুভ শক্তি এক দিন শিউলিকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। সেই অশুভ শক্তিরই ভিন্ন আর এক রূপ আর্থারকে ছিনিয়ে নিয়েছে। অথচ এরই বিরুদ্ধে এতদিন লড়াই করেছে সে।'

একটু থেমে যোগ করলেন, 'অশুভ শক্তিকে কি অত সহজে নির্মূল করা যায়? যায় না। বহু মানুষের অনেক সাধনা, অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার প্রয়োজন হয়। আরো কত আর্থারের প্রয়োজন আছে কে জানে! আর্থারের ভাব-শিষ্য তোমরা। তোমরা তো রইলে!'

আমার কেমন সন্দেহ হয়, সত্যিই কি সবাই রইল, তেমন করে রইলাম আমার বুকের ভেতরটা ভাবনায় আন্দোলিত হতে থাকে।

যে মানুষটি স্নেহ—মমতায়—ভালোবাসায় সমগ্র বিশ্বের মানুষকে এক সূত্রে বাঁধতে চেয়েছিলেন, বলতে চেয়েছিলেন, আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের আপন জন কাছের মানুষ; যিনি জাতি-ধর্ম-ভাষার সীমা অতিক্রম করে এক অখণ্ড মানব-সত্বাকে আলিঙ্গন করতে চেয়েছিলেন, তিনি আজ এক

পশু শক্তির পরোক্ষ প্রভাবে অকস্মাৎ অস্তমিত।

পরক্ষণেই মনে হল, কে জানে, হয়তো এর প্রয়োজন ছিল। হয়তো তাঁর এই আকস্মিক ভূমিশয্যাই এক দিন বিশ্বের মানুষকে আঙুল দেখিয়ে বলবে, ওই ভূমিশয্যাই যখন সব মানুষের শেষ পরিণতি, তখন সবাই সমান হয়ে বেঁচে থাকায় অসুবিধে কোথায়? মানুষে-মানুষে কেন এই বিভেদের প্রাচীর?

এই চূড়ান্ত সত্যকে উপলব্ধি করতে আরো কত যুগ যাবে কে জানে!

———